জগৎবল্লভপুর জনপদকথা

শিবেন্দু মান্না

২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
জন্মাষ্টমী, ১৪০৭ সাল
২২ আগস্ট, ২০০০

প্রকাশক
অনুপকুমার মাহিন্দার
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ
সোমনাথ ঘোষ

প্রচ্ছদ চিত্র
দেবী সিংহবাহিনী
নিভাবালিয়া

অক্ষর বিন্যাস
ওয়ার্ড ওয়ার্কস
৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক
দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

উৎসর্গ

মাতাঠাকুরাণী ৺বিভাবতী দেবী

ও

পিতৃদেব ৺কানাইলাল মান্না

—যাঁরা একদা

দেশের মাটি আর মানুষজনকে

ভালোবাসতে শিখিয়েছিলেন।

লেখকের অন্য বই :

Mother Goddess Candī : Its Socio-Ritual Impact on Folk life

আভ্যুদয়িক

একদা রবীন্দ্রনাথ স্বদেশবাসীর উদ্দেশে আহ্বান জানিয়ে লিখেছিলেন, গ্রাম-বাংলার নানাস্থানে ছড়িয়ে থাকা ছড়া-প্রবাদ ও কিংবদন্তী, নানান জাতিগোষ্ঠী, ঘরবাড়ি, মন্দির-মসজিদ, আমোদ-প্রমোদ, গ্রামীণ শিল্পকলা প্রভৃতির বিবরণ সন্ধান ও সংগ্রহ করার কথা এবং সেসব বিবরণ সংগৃহীত হলেই বাংলা তথা বাঙ্গালীর যথার্থ ইতিহাস রচনা করা সম্ভব হবে। রবীন্দ্রনাথের এ উক্তির পর অর্ধশতাব্দীর অধিককাল অতিবাহিত হয়েছে, এর মধ্যে গ্রাম-গ্রামান্তরের দ্রুত পরিবর্তন ঘটে গেছে, ইতিমধ্যে বহু পুরাতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক তথ্যাদিও কালস্রোতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, কিন্তু গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা উল্লিখিত ঐসব বিবরণ সংগ্রহের জন্য তেমন উদ্যোগ দেখা যায়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, ইতিহাস অনুসন্ধানীরা মূলতঃ তাদের সংগৃহীত অতীত বিবরণ তথ্যনিষ্ঠ করার জন্য লিখিত বিবরণযুক্ত তথ্যসূত্রের উপরেই নির্ভর করে থাকেন, কিন্তু গ্রাম-বাংলার আশপাশে ছড়িয়ে থাকা নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক এসব বিবরণ বা তথ্যাদি সংগ্রহে তেমন মনোনিবেশ করার দিকে দৃষ্টি ফেরাননি। ইতিহাস বা প্রত্নতত্ত্বের মধ্যে নিহিত তথ্যাদির বিবরণ সুস্পষ্ট হতে পাবে, যদি সরজমিনে সংগৃহীত এইসব গ্রামীণ জীবনধাবায় পুষ্ট লোকসংস্কৃতির বিবরণ সংযোগ করা হয়।

'জগৎবল্লভপুর জনপদকথা' গ্রন্থের রচয়িতা শিবেন্দু মান্না তার এই গ্রন্থটি রচনাকালে শুধুমাত্র প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাসের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করেন নি, তিনি উল্লিখিত থানা এলাকায় সরজমিনে পরিভ্রমণ করে যেসব অজানিত তথ্য সংগ্রহ করে এই আঞ্চলিক ইতিহাসটি রচনা করেছেন, তা পড়ে একান্তই চমৎকৃত হতে হয়। একটা থানা এলাকার মধ্যে কত কি প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে, তা গ্রন্থটি পাঠ করলে সবিশেষ অবগত হওয়া যায় এবং সে হিসেবে বলা যেতে পারে এ গ্রন্থটি আঞ্চলিক ইতিবৃত্ত হিসাবে সার্থক হয়ে উঠেছে। তাই দীর্ঘদিনের পরিশ্রমে রচিত এ গ্রন্থটির জন্য তিনি একান্তই সাধুবাদের যোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারেন।

পশ্চিমবঙ্গের এই ক্ষুদ্র জেলা হাওড়ায় কোন গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস বা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন নেই বলেই অনেকের ধারণা। কিন্তু এ অপবাদ দূরীকরণে শুধুমাত্র জেলার অন্তর্গত একটি থানা এলাকার যাবতীয় প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস ও সংস্কৃতির যে আলেখ্যটি শ্রীমান্না তাঁর এই গ্রন্থে তুলে ধরেছেন, তা থেকেই বোঝা যাবে হাওড়া জেলার প্রাচীন গৌরবের পরিচয়। এছাড়া, তিনি তাঁর গ্রন্থে যেসব উল্লেখযোগ্য বিষয়ের অবতারণা করেছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, জগৎবল্লভপুর থানা এলাকায় চৌদ্দটি গ্রাম-পঞ্চায়েতের অন্তর্গত গ্রামভিত্তিক জাতিগত সম্প্রদায়ের যে তালিকা তুলে ধরা হয়েছে, তার মধ্যে আমরা দেখতে পাই, উচ্চবর্ণ বহির্ভূত জাতিগোষ্ঠীর পরিচয় এবং সেইসঙ্গে তাঁদের ধর্মকর্ম, পুজো-পার্বণ, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি নিয়ে যে লোক-সংস্কৃতি গড়ে

উঠেছিল, সে সংস্কৃতির লৌকিক উৎসের আভাষ ও পরিচয়।

শ্রীমান্না, যোগাযোগ ব্যবস্থা অধ্যায়ে জগৎবল্লভপুর থানা এলাকার মধ্যে যে সব অজ্ঞাত প্রাচীন পথের কথা নথিবদ্ধ করেছেন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণ হিসেবে, গৌড়েশ্বরের জাঙ্গাল, মুলুকচাঁদের জাঙ্গাল বা আটজাঙ্গালী বাঁধের পরিচয় জনমানসে আজ বিস্মৃত হলেও সে পথগুলি সম্পর্কে তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করায়, সে বিষয়ে ভবিষ্যতে বিস্তারিত গবেষণার সুযোগ করে দিয়েছেন। কিন্তু কে এই গৌড়েশ্বর বা মুলুকচাঁদ? গৌড়েশ্বরের কথা বাদ দিলে মুলুকচাঁদ সম্পর্কে কি বলা যেতে পারে, তিনি ছিলেন বড়বাজারের দেওয়ান কাশীনাথ ট্যাণ্ডনের পিতা মুলুকচাঁদ, যিনি একসময়ে তার শ্বশুরের সুন্দরবন থেকে আনা কুচিলা, হরতুকী, মধু, মোম ও কাঠকুঠোর ব্যবসা পরিচালনা করে বিত্তবান হয়েছিলেন? তা যদি হয়, তবে কি সতের শতকের মুলুকচাঁদই এই পথটি সেকালে স্থানীয় রেশম ব্যবসায়ীদের সুবিধার্থে নির্মাণ করে দিয়েছিলেন?

শ্রীমান্নার রচিত এই গ্রন্থে জগৎবল্লভপুর এলাকার প্রাচীন ও নবীন কুটিরশিল্প, বিস্মৃতপ্রায় স্থানীয় কবি ও সাহিত্যসাধকদের পরিচয়, বিদ্যালয় ও গ্রন্থাগারের কর্মবৃত্তান্ত, মন্দির-মসজিদ বিষয়ক পুরাকীর্তি, স্বাধীনতা সংগ্রাম ও কৃষক আন্দোলনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ এবং বিশেষ করে আঞ্চলিক বাদাইগান, ঘেঁটুগান, হাত-নাচনা পুতুলের গান ও সাপ খেলানোর গান এবং লোকউৎসব প্রভৃতি বিষয়গুলি, যা বিভিন্ন অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে, তা থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় বাংলার প্রবহমান জীবনচর্যার সঙ্গে এসব আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলি কত ঘনিষ্ঠভাবেই না যুক্ত।

ইতিপূর্বে শ্রীমান্না রচিত 'মাদার গডেস চণ্ডী' নামের গবেষণা গ্রন্থটি অনুসন্ধিৎসু মহলে বেশ প্রশংসিত হয়েছে। আলোচ্য এ গ্রন্থেও সযত্ন অনুরাগ নিয়ে তিনি গ্রামজীবনের নানা অভিব্যক্তিকে অনুসরণ করেছেন এবং গ্রাম-সমাজের অন্তস্থলে প্রবেশ করে সমাজজীবনের বহু বিলুপ্ত প্রথা ও সামাজিক ক্রিয়াচারের বিবরণ সংগ্রহ করে প্রকৃত আঞ্চলিক ইতিহাস উদ্ধারে ব্রতী হয়েছেন। তাঁর এই আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে জেলার অন্যান্য থানা এলাকার ইতিহাস ও সংস্কৃতি অনুসন্ধানে আগ্রহীরা যদি উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করেন, তার ফলে সমগ্র হাওড়া জেলা তথা পশ্চিমবঙ্গের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার পথ প্রশস্ত হতে পারে। সেদিক থেকে আলোচ্য এই গ্রন্থটি রচনার জন্য যথার্থ আঞ্চলিক ইতিহাসবেত্তা হিসেবে শ্রীমান্নাকে আখ্যাত করতে কোন দ্বিধা নেই। ভবিষ্যতেও তিনি যেন পর্যায়ক্রমে এই ধরনের আরও রচনা পরিবেশন করে আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনে সাহায্য করেন—এই কামনা করি।

নবাসন, বাগনান, হাওড়া। — তারাপদ সাঁতরা

১৫.৮.২০০০।।

আত্মপক্ষ

কথায় বলে, 'গাঁয়ে মায়ে সমান কথা' অর্থাৎ জন্মভূমিও জননীর সমতুল্য। কিন্তু আজকের চোখ ধাঁধানো আকাশচুম্বী অট্টালিকায় ইণ্টারনেট পরিবৃত, দূরদর্শন উপাসিত, উপগ্রহধর্মী জীবনযাপনের হাতছানিতে মুগ্ধ বাঙালী সন্তানের দল গ্রাম জীবনকে "দূর" করে দেবার সাধনায় মত্ত। একদিকে মরু বালিরাশির মত শহরের অনুর্বর আচার-আচরণের পরিধি ক্রমবর্ধমান, অপরদিকে একদা ছন্দোময় গ্রামের ইতিহাস ও সংস্কৃতির পরম্পরা আমূল পরিবর্তনের মুখোমুখি, কোথাও বা দ্রুত অবলুপ্তির পথে আগুয়ান। অথচ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, গ্রামে গাঁথা এই বঙ্গভূমিতে বৈচিত্র্যময় ইতিহাস, ঐতিহ্যময় সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল, বর্ণময় লোক-উৎসব, সুপ্রাচীন গ্রাম দেবতা, মন্দির মসজিদ এখনও বর্তমান আছে। কিন্তু যেটি নেই, সেটি হল সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি। একদা কবি ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছিলেন :

জান না কি জীব তুমি, জননী জন্মভূমি,
যে তোমারে হৃদয়ে রেখেছে।
থাকিয়া মায়ের কোলে, সন্তানে জননী ভোলে,
কে, কোথায় এমন দেখেছে? [স্বদেশ]

বর্তমানে অতি দ্রুত পরিবর্তনশীল আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিবেশে গ্রাম বাঙলায় অহরহ যে রূপান্তর ঘটে চলেছে, তার কাহিনী যেমন অনুধাবনযোগ্য, তেমনি অতীতকালের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটও অনুসন্ধানযোগ্য। আসলে, ইতিহাস তো মানুষের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের সাথী ও সাক্ষী, মানুষের পরম্পরা সঞ্চিত অভিজ্ঞতার সমাহার, অতীত থেকে ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত চিন্তা ও চেতনার দিক নির্দেশক। কিন্তু এ দেশের জনসাধারণ কিংবা শিক্ষিত মানস আবহমান কাল ধরেই ইতিহাস সম্পৃক্ত ঘটনাবলী সম্পর্কে সচেতন নন। ফলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চল বিশেষেরও ভৌগোলিক পরিবেশের রূপান্তরের কাহিনী তৎসহ অধিবাসীদের জীবনযাত্রার পরিবর্তন, প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু পরিবার সমূহের কুলজীনামা, খ্যাতকীর্তি ব্যক্তিবর্গের কর্মোদ্যোগের বিবরণ, প্রাচীন দলিল দস্তাবেজ, নথি, পুঁথি, স্মৃতিকথা ইত্যাদি আদৌ সহজলভ্য হয়ে ওঠে না। আলোচ্যক্ষেত্রে নিমাবালিয়া-র 'মণ্ডল' ; গড়বালিয়ার 'মান্না' ; নিজবালিয়া-র 'মুখোপাধ্যায়' [দেবী সিংহবাহিনীর পূজক] ; 'মাইতি', 'ঘোষ' ; পাঁতিহালের 'দেব মজুমদার' ; 'দে বিশ্বাস' ; বাঁকুলের 'গুপ্ত' [আয়ুর্বেদ চর্চা, গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা] ; শিবানন্দবাটী ও রামপুরের 'দে' ; খড়দা ব্রাহ্মণপাড়ার 'কুণ্ডু' ; ভুরশুট ব্রাহ্মণপাড়ার 'সর্বাধিকারী', 'সরকার' ; নবাসনের 'নন্দী' ; মাজুর 'বসু', ঘোষাল', 'মজুমদার' ; জগৎবল্লভপুরের 'বর্মণ' ; গোলপোতার 'খাঁ' ; হাফেজপুরের 'সৈয়দ' ; জালালসীর 'সেখ', 'মল্লিক' বংশের বংশধরদের কাছে রক্ষিত প্রাচীন নথি, দলিল ইত্যাদি জগৎবল্লভপুর জনপদের আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত মূল্যবান উপাদান। ক্ষেত্রবিশেষে ঐ ধরণের তথ্যাদি ব্যবহার করা গেলেও প্রধানতঃ সচেতনতা ও

সহযোগিতার অভাব এবং তদুপরি পারিবারিক মন্ত্রগুপ্তির কারণবশতঃ ঐ প্রকারের 'নথি' অন্ধকারেই প্রায়শঃ রয়ে' গেছে। তথাপি যা উদ্ধার করা গেছে, তার ভিত্তিতেই বলি :

"আছে ইতিহাস আছে কুলমান
আছে মহত্ত্বের খনি।
পিতৃ পিতামহ গেয়েছে যে গান
শোন তার প্রতিধ্বনি।"

সংস্কৃত শাস্ত্রে যে কথা বলছে, তা এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য—

যো ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য, অধ্রুবাণি নিষেবতে।
ধ্রুবাণি তস্য নশ্যন্তি, অধ্রুবম্ নষ্টমেব চ।।

—যা পাওয়া যেতে পারে কিংবা পাওয়া না যেতেও পারে, সে জন্য চেষ্টা করতে গিয়ে যা পাওয়া গেল—তার প্রতি যাঁরা অবহেলা, অশ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ করে থাকেন, তাঁরা সবটাই শেষ পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেন, নষ্ট করে ফেলেন।।

এই শাস্ত্রীয় মন্তব্যের আলোকে বলি, আলোচ্য গ্রন্থখানির মাধ্যমে জগৎবল্লভপুর জনপদের সুদূর অতীত থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বিস্তৃত বৈচিত্র্যময় ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক পরম্পরা সম্পর্কে অন্ততঃ কিছু জানার জন্য কিছু মানুষ আগ্রহ প্রকাশ করবেন—'এইমাত্র পুরস্কার মনে মনে গণি'।

* * * * *

প্রকৃত 'বন্ধু' তিনিই, যিনি আমাকে কোন মৌলিক রচনাকর্মে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম—তাই যেখানেই "বন্ধু" পাই, সেখানেই "নবজন্ম" ঘটে। সুখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ ও পরিব্রাজক, অগ্রজপ্রতিম "বন্ধু" শ্রী তারাপদ সাঁতরার আন্তরিক উৎসাহদান ও সহায়তার ফলেই আলোচ্য গ্রন্থখানি রচনা করা সম্ভব হল। শ্রী সাঁতরা-র সাহচর্য আমার জীবনে এক আনন্দ-উজ্জ্বল অধ্যায়।

আর্থিক ব্যয় বাহুল্যের দরুণ বহু বিষয় সংক্ষেপ করতে হল ; আবার বহু তথ্য সংযোজন করা গেল না—এ ত্রুটি মার্জনীয়।

পুস্তক বিপণির স্বত্বাধিকারী শ্রী অনুপকুমার মাহিন্দারের সহায়তায় মুদ্রণ কার্য সম্পন্ন হল। অনুজপ্রতিম অনুপ এজন্য ধন্যবাদার্হ।

পরিশেষে, মদীয় গৃহিণী-সচিব-সখা শ্রীময়ী চৈতালী, কন্যাত্রয় শর্মিষ্ঠা (দাস), সোহিনী ও শ্রাবন্তী এবং জ্যেষ্ঠ জামাতা কমলকুমার ও মাতৃপ্রতিম অণিমা দেবী প্রমুখের সাগ্রহ সহযোগিতা, আমার কাছে আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা।

"জননী"
১১৬/৫, বৃন্দাবন মল্লিক লেন,
কদমতলা, হাওড়া - ৭১১ ১০১।।
জন্মাষ্টমী। মঙ্গলবার।
৫ ভাদ্র, ১৪০৭ সাল। শিবেন্দু মান্না

অনুক্রম

* * *

চিত্রমালা

মানচিত্র

বাল্যাৎ প্রভৃত্যহরহর্যদুপাসিতাসি বাগ্‌দেবতে
তদধুনা ফলতু প্রসীদ ॥

--হে বাগ্‌দেবী, বাল্যকাল হইতে তুমি প্রত্যহ উপাসিতা হইয়াছ,
সেই উপাসনা এখন ফলবতী হউক ॥
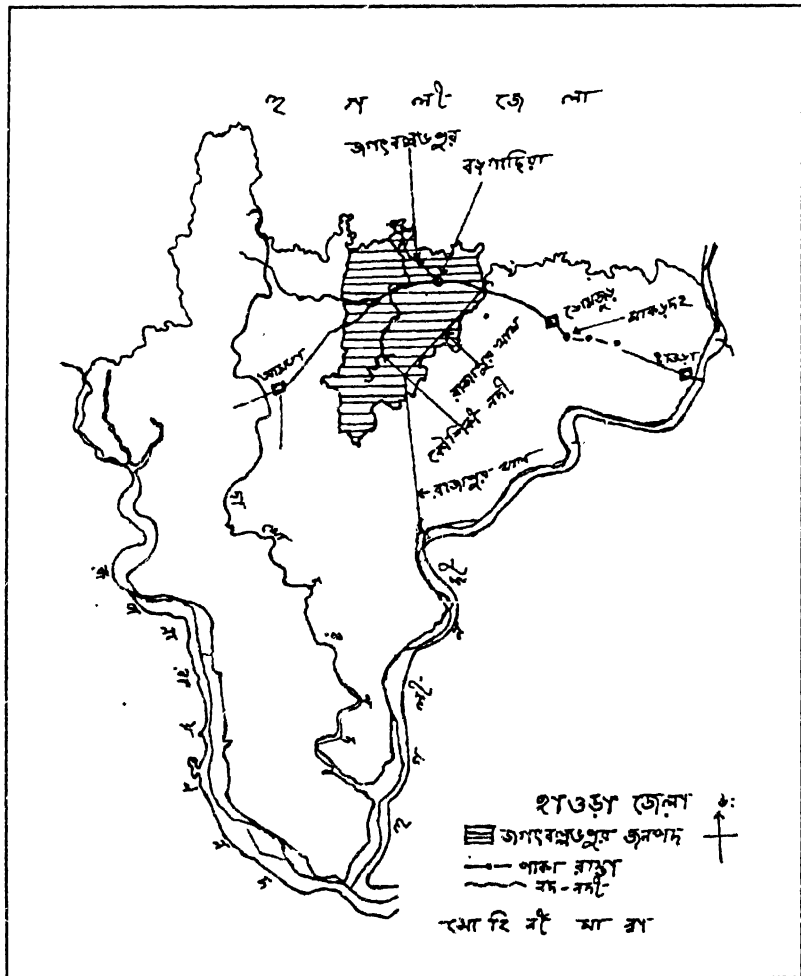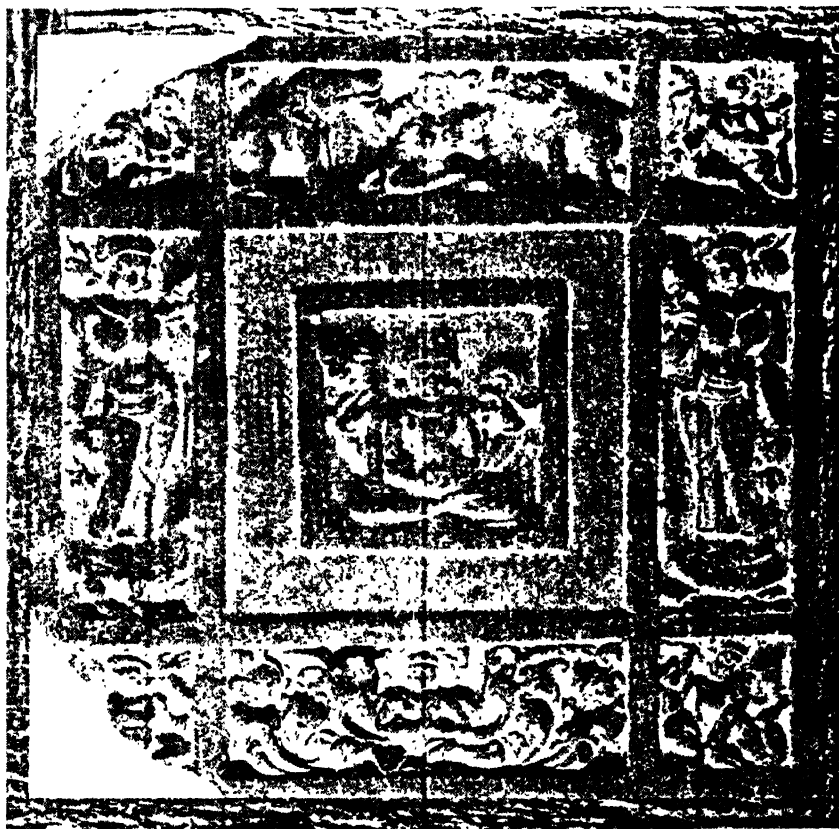
বিষ্ণুপট্ট : খ্রিঃ ১১ শতক (সামনের দিক) তেলিহাটি।

চিত্র : ১ পৃ

বিপরীত দিকে
দশাবতার চিত্র শোভিত
বিষ্ণুপট্ট : খ্রিঃ ১১ শতক তেলিহাটি।

চিত্র : ২ পৃ :
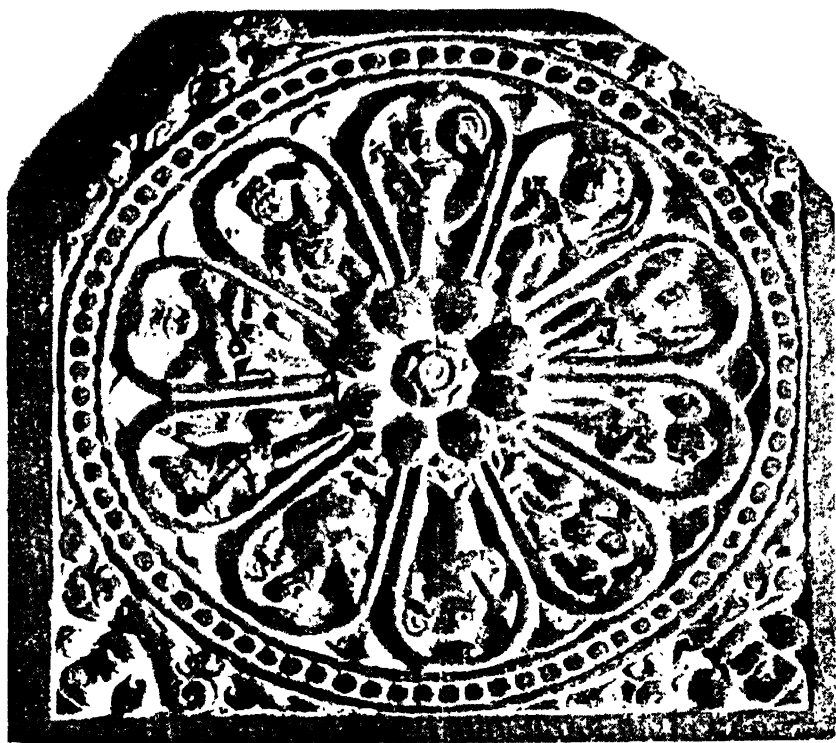
পোড়ামাটির 'বাবা' মুণ্ড : খ্রিঃ ১১ শতক — তেলিহাটি

বিষ্ণুমূর্তি : খ্রিঃ ১২ শতক — চাঁদুল।

চিত্র : ৩ পৃ :

ত্রিবিক্রম বিষ্ণুমূর্তি : খ্রিঃ ১১ শতক -- নিজবালিয়া।

চিত্র : ৪ পৃ

কবির হস্তলিপি
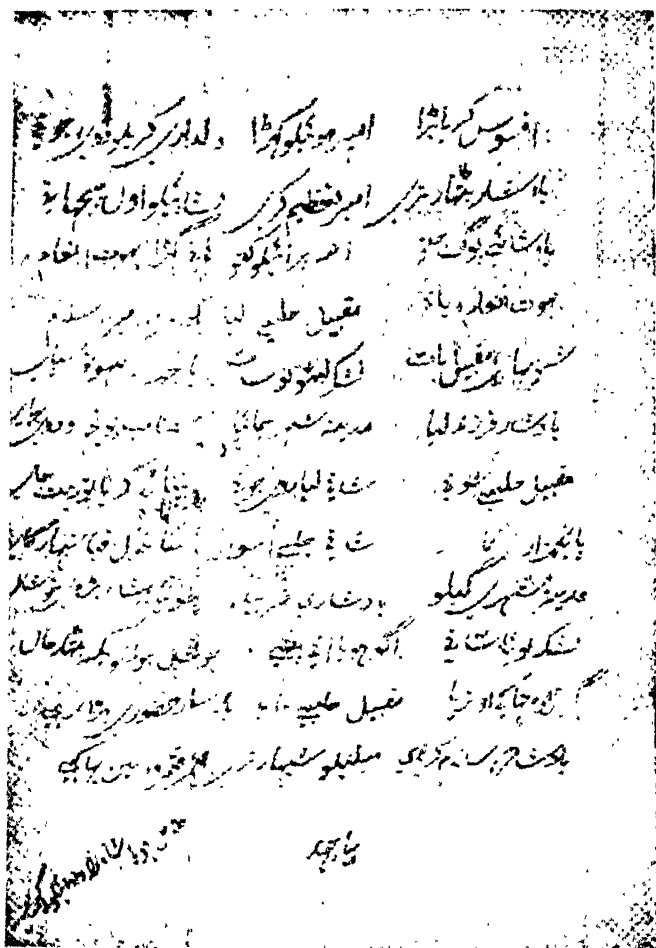
সৈয়দ গোলাম সরওয়ারের সৌজন্যে প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি—'আমীর হামজা' (১ম খণ্ড)—থেকে গৃহীত আলোকচিত্র। তৎকালীন রীতি অনুযায়ী গ্রন্থের ভাষা বাংলা, কিন্তু লিপি ফারসী।

কবি শাহ গরীবুল্লাহ-র হস্তাক্ষরযুক্ত "আমীর হামজা" কাব্যের পৃষ্ঠা। ১৮ শতক। হাফেজপুর।

চিত্র : ৫ পৃ :

কাশীপ্রসাদ ঘোষ : কবি ও সাংবাদিক।

ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার : বিজ্ঞান সাধক।

চিত্র : ৭ পৃ

রাসমঞ্চ :
খ্রিঃ ১৯ শতক—শেষভাগ। গড়বালিয়া।
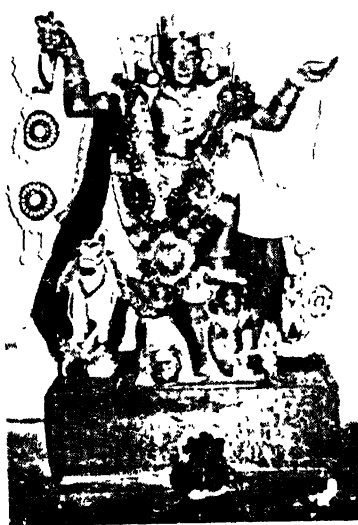
বিশালাক্ষী : খ্রিঃ ১৯ শতক -- ধসা
(দারুমূর্তি)

বিশালাক্ষী :
খ্রিঃ ১৮ শতক -- নাইকুলি।
ন্মুর্তি)
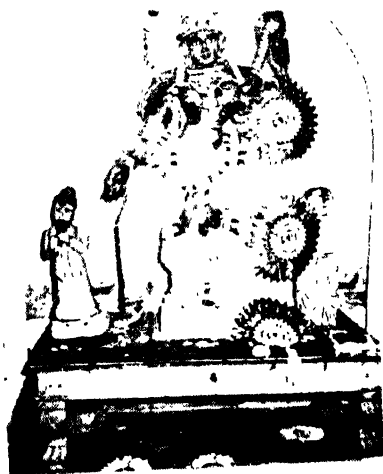
মনসা :
খ্রিঃ ১৯ শতক -- খড়দা ব্রাহ্মণপাড়া।
(দারুমুর্তি)

চিত্র : ৮ পৃ :

জগৎবল্লভপুর জনপদকথা

অয়মারম্ভ—

"জাতীয় গর্বের কারণ লৌকিক ইতিহাসের সৃষ্টি বা উন্নতি ; ইতিহাস সামাজিক বিজ্ঞানের এবং সামাজিক উচ্চাশয়ের একটি মূল। ইতিহাস বিহীন জাতির দুঃখ অসীম।"

—বঙ্কিমচন্দ্র

ইতিহাস এক অর্থে জাতীয় উন্নতির পরিমাপক, জাতীয় উন্নতির সোপান। ঐ সোপানের প্রথম ধাপটি হল অঞ্চল বিশেষের ইতিহাস বা লৌকিক ইতিহাস। আঞ্চলিক ইতিহাসের গুরুত্ব অনুধাবন করে একদা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মন্তব্য করেছিলেন, "...যদি প্রত্যেক জেলার গ্রামগুলির কাহিনী সংগৃহীত হয়, তাহা হইলে একদিন বাঙ্গলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হইতে পারে।" সুখের বিষয়, প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বেই বাঙলার বিভিন্ন জনপদের ইতিহাস রচনার সূত্রপাত ঘটে, স্বাধীনতা-উত্তর কালেও তার গতি স্তিমিত হয়নি। তথাপি বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-হরপ্রসাদ প্রমুখের প্রত্যাশা পূরণ হবার মত পরিবেশ এখনও সৃষ্ট হয়নি। বহু জনপদ কালগর্ভে নিমজ্জিত, তার ইতিহাসও বিস্মৃত ; অপরপক্ষে বহু জনপদের ইতিহাস ভাঙাগড়ার স্রোতে বিস্মৃতির মুখোমুখি। তদুপরি, এ দেশের ক্ষয়প্রবণ আবহাওয়া, আপন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি স্বাভাবিক অনীহাবোধ বশতঃ বহু তথ্য, নথি ও পুঁথি ধ্বংস হয়ে গেছে এবং যাচ্ছেও। এই অবস্থায় পর্যটকের অনুসন্ধিৎসু মন ও দৃষ্টি নিয়ে গ্রাম-গ্রামান্তরে কষ্টসাধ্য পরিক্রমা। কবির ভাষায় বলা চলে—

> "ইব্‌নে বতুতা নই আমি নই বার্নিয়ের,
> তবুও পর্যটক আমি এক আমারই স্বদেশে।"*

আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হল কালানুক্রমিক গতিপথ অনুসরণ। ভূরি পরিমাণ 'পাথুরে প্রমাণ', নথি, পুঁথি, স্মৃতিকথা ইত্যাদির অভাব। জনপদ জগৎবল্লভপুর, একদা অঞ্চল বিশেষের ইতিহাসের কেন্দ্রে অবস্থিত ছিল। এর অনেকানেক 'ভূমিপুত্র' বাঙলার শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি জগত মায় চিকিৎসাবিদ্যা ও বিজ্ঞান গবেষণার জগতেও স্ব-সৃষ্ট অবদান রেখে খ্যাতিকীর্তি হয়েছেন। কিন্তু এ সকল তথ্য এ যাবৎ একত্র সন্নিবদ্ধ হয়নি। এই প্রকারের এক বিচিত্র বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে ক্ষুদ্র জনপদ জগৎবল্লভপুরের ইতিহাস রচনার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র জেনেও বলি—

> "দেখি দেখি কালার্ণবে হইয়া মগন,
> অন্বেষিয়া পাই যদি বিলুপ্ত রতন,
> কিছু যদি পাই তার ভগ্ন অবশেষ,
> আর কিছু পরে যার না রহিবে লেশ।"**

---

* স্বদেশে পরিব্রাজক : হাসান হাফিজুর রহমান।

** ডিরোজিও লিখিত 'ইণ্ডিয়া—টু মাই নেটিভ ল্যাণ্ড' কবিতার দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত অনুবাদ থেকে।

ভৌগোলিক পরিচয়

নগর কলকাতার পশ্চিমদিকে, প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত জগৎবল্লভপুর থানা [অঞ্চল, সমষ্টি উন্নয়ন ব্লক], হাওড়া জেলার সদর মহকুমাধীন একটি সম্পূর্ণরূপে গ্রামীন এলাকা। প্রাচীন "কৌশিকী" নদী [যার হাল নাম কানা দামোদর!] অববাহিকায় ১২৬.৫৯ বর্গকিলোমিটার [৪৯.৫৫ বর্গমাইল] এলাকা নিয়ে গঠিত হয়েছে আলোচ্য জনপদ জগৎবল্লভপুর। এই জনপদটি গঠনের ক্ষেত্রে অবদান রয়েছে মোট ৭৭টি মৌজার, যা একুনে ৯১টি গ্রাম সমবায়ে গ্রথিত। এলাকাটির অবস্থান মোটামুটিভাবে ২২°৩২´ থেকে ২২°৪৩´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°৩২´ থেকে ৮৮°১১´ পূর্ব দ্রাঘিমা। বর্তমানকালের চৌহদ্দী হচ্ছে ঃ উত্তরদিকে হুগলী জেলা ; পূর্বদিকে থানা ডোমজুড় ও থানা পাঁচলা ; দক্ষিণদিকে থানা পাঁচলা ও থানা আমতার মিলনস্থল ; পশ্চিমদিকে থানা আমতা। বলাবাহুল্য, পূর্বোক্ত থানা-অঞ্চলসমূহ জেলা হাওড়ার অধীন।

আলোচ্য অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি সমতল হলেও উত্তর থেকে দক্ষিণে ঢালু হবার কারণে নদীর জলধারা স্বাভাবিকভাবে দক্ষিণমুখী হয়ে হুগলী-ভাগীরথীর জলপ্রবাহের সাথে সংযোগ গড়ে তুলেছে।

জগৎবল্লভপুর অঞ্চলের উত্তর সীমানাবর্তী ঝিংরা ও তেলিহাটি মৌজার সীমানা নির্দেশ করে, প্রাচীন কৌশিকীর [অধুনা কানা দামোদর] জলধারা দক্ষিণে অগ্রসর হবার কালে প্রায় ত্রিশটি মৌজার সীমানা স্পর্শ করেছে। প্রকৃতপক্ষে, নদী প্রবাহটি উক্ত থানা-অঞ্চলের প্রায় মাঝ বরাবর অবস্থিত। দক্ষিণদিকে প্রায় থানা সীমান্তে পৌঁছানোর পর এ নদী বর্তমানে উলুবেড়িয়া থানার বাসুদেবপুরের কাছে সিজবেড়ে খাল পথে হুগলী-ভাগীরথীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। ভরা বর্ষা ব্যতিরেকে এ নদী আদৌ স্রোতবহ নয়। নদীর মাঝে মাঝেই যে ধরণেব চড়া পড়ে সুউচ্চ ভূমিরূপ ধারণ করেছে, তাতে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় এ নদী বর্তমানে জরাগ্রস্ত, মৃত্যুপথযাত্রী। অথচ ১৭ শতক এবং ১৮ শতকের নৌ-চার্টেও এ নদীকে দেখা গেছে যথেষ্ট প্রশস্ত জলপথ রূপেই। বলা বাহুল্য. এক সময়কার "জাঁ পার্দো" রূপে চিহ্নিত অর্থাৎ জাহাজ চলাচলের উপযোগী জলপ্রবাহ কৌশিকীর স্রোত আজ নিশ্চিহ্ন কিংবা অবলুপ্তির পথে আগুয়ান!

জগৎবল্লভপুর থানাঞ্চলের পশ্চিমপ্রান্ত সন্নিহিত এলাকা থেকে পূর্বপ্রান্তে বড়গাছিয়া এলাকার দিকে অর্থাৎ পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে উন্মুক্ত কৃষিক্ষেত্রের উপর দিয়ে হেঁটে গেলে অনেকগুলি সুতি-খাল, জলনালা ও প্রাকৃতিক জলাশয়ের চিহ্ন নজরে পড়বে। অনুমান করা যায়, অতীতে কোন এক [অথবা একাধিক শাখাযুক্ত] স্রোতবহা নদী ছিল এই অঞ্চলে। ঐ নাম-না-জানা অধুনা অবলুপ্ত নদীপথের বাঁধের চিহ্ন রয়ে গেছে কোথাও কোথাও। তার প্রমাণ স্বরূপে বলা চলে, মৌজা কমলাপুর. পার্বতীপুর, মানসিংহপুর, অনন্তবাটী, হাঁটাল, বোহারিয়া প্রভৃতি ঐ অবলুপ্ত নদীটির বাঁধের উপর অবস্থিত। বলা বাহুল্য, বর্তমানকালেও পূর্ব-কথিত মৌজাগুলি উত্তরদিকে থেকে দক্ষিণ দিকে কতকটা ছিন্ন মালার ন্যায় অবস্থিত। এছাড়া, বোহারিয়া মৌজা সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র

জলপ্রবাহ 'গৌরীগঙ্গা' নামে আজও পরিচিত। তদুপরি, নিজবালিয়া, গড়বালিয়া, ইছাপুর প্রভৃতি গ্রামাঞ্চল থেকে খোলা মাঠের ওপর দিয়ে পূর্বদিকে হাঁটাল-বোহারিয়া অভিমুখে হেঁটে যাওয়ার কালেও পরিস্কারভাবে একটি লুপ্ত "ধানসিঁড়ি নদী"-র কঙ্কাল রেখার সন্ধান পেয়েছিলাম খ্রিঃ উনিশ শো সালের সত্তরের দশকে!

মূলতঃ পলিমাটি দিয়ে গঠিত এ অঞ্চলে বেলে-দোআঁশ এবং এঁটেল-দোআঁশ মাটিরই প্রাধান্য। [কয়েকটি গ্রামের নামকরণের মধ্যেও বোধহয় বেলে-দোআঁশ মাটির প্রাধান্য সূচিত হয়ে থাকবে। যথা—নিজবালিয়া, গড়বালিয়া যমুনাবালিয়া, বাদেবালিয়া, নিমাবালিয়া ইত্যাদি]। পলিমাটির গভীরতা আনুমানিক ১,০০০ ফুট।

জলবায়ু প্রধানতঃ ক্রান্তীয় মৌসুমী। গ্রীষ্মকালে গড় উত্তাপ ২০°সে—৩০°সে। শীতকালে ১৫° সে. কদাচিৎ ১০° সে। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ১৫০ মি.মি.

এলাকামধ্যে কোন বনভূমি নেই। পতিত জমি ও রাস্তার দু'ধারে সামাজিক বনসৃজন প্রকল্পে সুবাবুল জাতীয় বৃক্ষাদি রোপণ করা হচ্ছে। তবে তুলনামূলকভাবে মাজু, প্রতাপপুর, বড়গাছিয়া, মুন্সিরহাট প্রভৃতি এলাকায় অবস্থিত করাতকলের খোরাক জোগাচ্ছে স্থানীয় এলাকার বৃক্ষগুলিই। গ্রাম মধ্যে দেখা মিলবে বাঁশঝাড়, আম, তেঁতুল, কাঁঠাল, নিম, বট, অশ্বত্থ, চালতা, আমড়া, শিরীষ, শিমূল, কদম, পলতে-মাদার, তাল, নারকেল প্রভৃতি বৃক্ষাদির।

গৃহপালিত গবাদি পশু, ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগ-ছাগী ছাড়া অন্যান্য বুনো জন্তুর মধ্যে ভাম, কটাশ, বন-বেড়াল, শিয়াল, খ্যাঁক-শিয়াল ইত্যাদির আধিক্য একদা থাকলেও আজ আর নজরে পড়ে না। অপরদিকে 'হনুমান'-এর অত্যাচার মাত্রাছাড়া। ফল, ফসল নষ্ট করতে এদের জুড়ি মেলা ভার হলেও বন্য জন্তু সংরক্ষণ আইন মোতাবেক এরা 'সুরক্ষিত' হবার কারণে অবাধে বংশবৃদ্ধি হচ্ছে।

পাখ-পাখালির মধ্যে গোলা পায়রা, শালিখ, দোয়েল, বুলবুলি, ফিঙ্গে, টিয়া, ঘুঘু, কোঁচ বক, হাঁস, মুরগী, শ্যামা, হরিয়াল, ডাহুক, জলপিপি, পানকৌড়ী এবং শীতকালে পরিযায়ী বালি হাঁস ইত্যাদি যথেষ্ট রকমের।

জলসেচন ও জলনিকাশী ব্যবস্থা

কৃষিজমিতে জলসেচনের উৎস হচ্ছে, (১) স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত ; (২) নদীপ্রবাহ, খাল, ন্যাচা, দহ, দীঘি ও পুষ্করিণী ইত্যাদি ; (৩) পাম্পের সাহায্যে ভূ-গর্ভস্থ জল উত্তোলন ; (৪) রিভার লিফট ইরিগেশন—পাম্পের সাহায্যে নদীর জল উত্তোলন। বে-সরকারী ও সরকারী পর্যায়ে অগণিত শ্যালো এবং ২৮টি ডিপ-টিউবওয়েলের সাহায্যে এলাকার বিস্তীর্ণ কৃষি জমিতে ভূ-গর্ভস্থ জল যে ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, তাতে গ্রীষ্মকালে সাধারণ টিউবওয়েলগুলিতে পানীয় জল উত্তোলন অসম্ভব হয়ে পড়ে।

জলনিকাশী খালের মাধ্যমে ডি.ভি.সি.-র জল ইদানীং পাওয়া যাচ্ছে।

এলাকার প্রধানতম খাল হচ্ছে রাজাপুর ক্যানাল। রাজাপুর ক্যানাল প্রকৃতপক্ষে জগৎবল্লভপুর, পাঁচলা ও ডোমজুড় থানার সীমানা নির্ধারণ করে উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত।

রাজাপুর খাল খনন করা হয়েছিল উনিশ শতকের শেষ পর্বে, ব্রিটিশ শাসকদের উদ্যোগে। বর্ষাকালে হুগলী ও হাওড়া জেলার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জলনিকাশী কাজের জন্য তো বটেই, এলাকার জনস্বাস্থ্যের কারণেও রাজাপুর খালের গুরুত্ব সমধিক। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ভয়াবহ ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রকোপে ঘরে ঘরে মৃত্যুর হাতছানি। সেই সময় কারণ অনুসন্ধানে জানা যায় যে, স্বাভাবিক জলনিকাশী পথ না থাকায় জনস্বাস্থ্যের ঐ প্রকার অবনতি। অবশেষে ১৮৬৯ খ্রিঃ-তে মিঃ সি. ই. অ্যাডলির সুপারিশ অনুযায়ী ডানকুনি [হুগলী জেলা] এবং রাজাপুর [হুগলী ও হাওড়া জেলা] ড্রেনেজ স্কীম গৃহীত হয়। ১৮৭৩ খ্রিঃ-তে বাঙলার তদানীন্তন মুখ্য বাস্তুকার কর্নেল হেগ জরীপ কাজ সমাধা করলে, ১৮৮৪-৮৫ খ্রিঃ নাগাদ রাজাপুর ড্রেনেজ ক্যানাল তৈরীর কাজ শুরু ; শেষ হয়েছিল ১৮৯৪-৯৫ খ্রিঃ-তে। খরচ পড়েছিল ১৪½ লক্ষ টাকা। রাজাপুর খালের দ্বারা হুগলী ও হাওড়া জেলার ২৬৯.৮৫ বর্গমাইল এলাকার জলনিকাশ হয়ে থাকে। রাজাপুর খালের মূল প্রবাহ পথ ১৬ মাইল লম্বা।

উলুবেড়িয়া থানার সিজবেড়িয়া, বাসুদেবপুর, ফুলেশ্বর প্রভৃতি অঞ্চল থেকে উত্তর দিকে অবস্থিত জগৎবল্লভপুর থানার সিদ্ধেশ্বর এলাকা অতিক্রম করে ক্রমশঃ আরও উত্তরদিকে এগিয়ে গেলে দেখা যাবে ডোমজুড় এবং জগৎবল্লভপুর থানাধীন এলাকার সীমা নির্দেশ করে রাজাপুর খালের জলধারা প্রবাহিত হচ্ছে, দক্ষিণে হুগলী-ভাগীরথী অভিমুখে। রাজাপুর খালের দুপারেই বিস্তৃত ধান্যক্ষেত্র থাকায় বোরো ও আমন চাষ যথেষ্ট সুবিধা পেয়ে থাকে জলসেচের, বর্ষাকালে অতিরিক্ত জল নিকাশের। অবশেষে উলুবেড়িয়া থানার ফুলেশ্বরে এই জলপ্রবাহ হুগলী-ভাগীরথীর সাথে মিলিত হয়েছে। ফুলেশ্বরে ভাগীরথী সঙ্গমে রয়েছে কুড়ি কপাটের নিয়ন্ত্রক, যার সাহায্যে জলধারা নিকাশ করা হয় ; আবার প্রয়োজনে হুগলী-ভাগীরথীর জল প্রবল জোয়ারের সময় আটক করে বোরো চাষের কাজে লাগানো হয়।

জনস্বাস্থ্য, জলনিকাশ ও জলসেচনের কাজে রাজাপুর খালের অবদান সম্পর্কে ১৮৯৭-৯৮ খ্রিঃ-তে হাওড়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর প্রশাসনিক প্রতিবেদনে মন্তব্য করেছিলেন—জলাভূমির উন্নয়নের স্বার্থে গৃহীত এই প্রকার নিকাশী প্রকল্প সফল হওয়ায় জলাভূমি ও কৃষিজমির উন্নতি তো ঘটলই, তদুপরি প্রখর গ্রীষ্মে, স্বল্প বর্ষা ও অনাবৃষ্টির কালে জলকষ্ট নিবারণ করাও সম্ভব, হুগলী নদীতে বহমান পরিস্কার জলের প্রবাহের সাহায্য গ্রহণ করে। [দ্র. হাওড়া জেলা গেজেটিয়ার, ১৯৭২ খ্রিঃ, পৃঃ ৪১]।

কৌশিকী বা কানা দামোদরের উৎপত্তি বর্ধমান জেলার সেলিমাবাদের নিকট, তারপর হুগলী জেলার বিভিন্ন জনপদ অতিক্রম করে জগৎবল্লভপুর থানায় প্রবেশের কালে ঝিংরা ও তেলিহাটি মৌজা দুটির সীমানা নির্দেশ করে কখনও পূর্বমুখী, কখনও দক্ষিণমুখী, কখনও বা পশ্চিমমুখী প্রবাহ পথে হুগলী-ভাগীরথী মুখীন হয়েছে। নদীপ্রবাহ

জগৎবল্লভপুরের যে সকল মৌজা অতিক্রম করেছে, সেগুলি হলো ঝিংরা, তেলিহাটি, গোলপোতা, জগৎবল্লভপুর, চাঁদুল, বাঁকুল, যদুপুর, হাফেজপুর, নাইকুলি, শিবানন্দবাটী, শঙ্করহাটি, রমানাথবাটী, ঘনশ্যামবাটী, পাইকপাড়া, খড়দা বামুনপাড়া, প্রতাপপুর-কৃষ্ণবাটী, ভূরশিট ব্রাহ্মণপাড়া, চোঙঘুরালী, উত্তর মাজু, মধ্য মাজু, দক্ষিণ মাজু, গোবিন্দপুর, গৌরীপুর ইত্যাদি। এরপর থানা-সীমানা অতিক্রম করে গেছে।

বছর পঞ্চাশ পূর্বেও মাজু পর্যন্ত ছোট-বড় শালতি বা নৌ-চলাচল করত বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে--কিন্তু আজ তা ধূসর স্মৃতিমাত্র। খ্রিঃ ১৯৯৯, মে-জুন মাসে নদীবক্ষে শ্যালো টিউবওয়েল বসিয়েও বোরো চাষের জন্য জল মেলেনি। একাধিক মৌজায় যদিবা জল মিলেছে তার বর্ণ হয়েছে চিনে সিঁদুরের মত লাল বর্ণ! বর্ষার জলপ্রবাহ শীতকালের শেষেই নিঃশেষিত প্রায়। পড়ে থাকে নদীর কঙ্কাল, কোথাও-বা বদ্ধ জলাশয়ের রূপে। এই হচ্ছে, একদা "জাঁ পার্দো" কৌশিকীর বর্তমান অবস্থা। এ নদীকে বাঁচাতে গেলে চাই "জন আন্দোলন"। প্রশ্ন হচ্ছে, বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? কারা "কৌশিকী বাঁচাও" আন্দোলন গড়ে তুলবে?

জলনিকাশী অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খালগুলি হচ্ছে দই-আষাঢ়ী বা দয়েষাড়ী খাল (বড়গাছিয়া থেকে সন্তোষপুর), গৌরীগাঙ্গ (বড়গাছিয়া থেকে বোহারিয়া), বোহারিয়া হানা, গুমাডিঙি খাল, রায়ের ঘাট খাল ও পাড়ুইপাড়ার হানা (শিয়ালডাঙা), যমুনাবালিয়া হানা, ভাগাড়ে - উখড়ো, ছাঁদভাঙী-হাতীর বিল - বালিপোতা - খাঁদার ঘাট ও নজরে হানা (৭টি), পাঁতিহাল দেব খাল, ফিঙ্গাগাছি ও গুড়ের খাল ইত্যাদি, যা রাজাপুর ক্যানালের সাথে যুক্ত।

পূর্বোক্ত খালগুলির মধ্যে ফিঙাগাছি, গুমাডিঙি, গুড়ের খাল, দয়েষাড়ী সহ রায়ের ঘাট খাল পুনঃ খনন ও সংস্কার করার ফলে ২৫০০ একর পরিমিত কৃষি জমির উন্নতি হয়েছে, বোরো ধান চাষের এলাকা বেড়েছে, অপরাপর কৃষিজ ফসলেরও সহায়ক হয়েছে। এছাড়া, আলোচ্য জনপদে ছোট-বড় জলাশয়ের সংখ্যা হচ্ছে ২,২০০টি।

মৎস্য চাষের ক্ষেত্রে এলাকার জলাশয়গুলির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। মোটামুটিভাবে ৩৯৩ হেক্টর পরিমিত জলাশয়ে রুই, কাতলা, মৃগেল, বাটা, সিলভার কার্প জাতীয় মাছ চাষ হয়। এছাড়াও বর্ষাকালে বিভিন্ন ধরণের জাওলা মাছ, ছোট ছোট চিংড়ী, পুঁটি, মৌরালা জাতীয় মাছেরও স্বাভাবিক প্রজনন ঘটে।

আলোচ্য এলাকায় কৃষিক্ষেত্রের পরিমাণ ৮,১৭০ হেক্টর, যার মধ্যে দো-ফসলী জমির পরিমাণ ৪,৩৩০ হেক্টর।

কৃষিজাত ফসলের মধ্যে প্রধান হচ্ছে, আমন ও বোরো ধান এবং আলু। এরপরেই হচ্ছে গম ও পাটচাষ। তৈলবীজ তিল ও সরিষা অল্পবিস্তর। সবজী চাষ আছে স্থানীয়ভাবে।

বিগত ১৯৯৬-৯৭ সালের হিসাব সূত্রে জানা যাচ্ছে, আমন ১০৮ মেঃটন, বোরো ১৪৪ মেঃটন, আলু ১২৬ মেঃটন, তিল ২.৪ মেঃ টন, সরিষা ১.১ মেঃটন, পাট ৮.৯ মেঃ টন উৎপন্ন হয়েছে।

একটি সংবাদে প্রকাশ, ধান উৎপাদনে হাওড়া সদর মহকুমায় শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার লাভের অধিকারী হয়েছে জগৎবল্লভপুর ব্লকের পাঁতিহাল গ্রাম পঞ্চায়েত। হাওড়ার সদর মহকুমা কৃষি আধিকারিক জানিয়েছেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের এই যৌথ উদ্যোগে নিবিড় ধান চাষ প্রকল্পে শ্রেষ্ঠ নির্বাচিত হওয়ায় ওই গ্রাম পঞ্চায়েতকে চার হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। —[উৎস : আনন্দবাজার পত্রিকা। ১৭-১২-১৯৯৭, পৃঃ ৮]

জনগোষ্ঠী পরিচয়

জগৎবল্লভপুর থানা অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত। যথা—হিন্দু, মুসলমান ও আদিবাসী গোষ্ঠী। এছাড়াও, একটি অতি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব রয়েছে, যারা আধা-হিন্দু, ও আধা-মুসলিম অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলিম ধর্মাচরণ, সামাজিক আচরণ করে থাকে। অবশ্য এই গোষ্ঠীর সাম্প্রতিক ঝোঁক মুসলিমদের সাথেই "আইডেনটিফিকেশন"-এর। এই ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীও আবার দু'ভাগে বিভক্ত যথা—সাপুড়িয়া [সাপুড়ে] মাল এবং বকমারা মাল। গোষ্ঠী দুটির নামকরণ থেকেই তাদের পেশা বা জীবিকার সন্ধান মেলে।

হিন্দু সমাজের গঠন অতি বিচিত্র, জটীল এবং আপাত বৈপরীত্যে ভরা ধ্যান-ধারণার দ্বারায় পুষ্ট। হিন্দুদের মধ্যে বর্ণভেদ প্রথার প্রচলন স্মরণাতীত কালের ঘটনা। বর্ণহিন্দু অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ যেমন আছে তেমনি আছে নবশাখ গোষ্ঠী। নবশাখ সম্প্রদায় নয়টি জাতি-গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত। এ সম্পর্কে শাস্ত্র-বাক্য হচ্ছে ঃ

"গোপো মালী তথা তৈলী তন্ত্রী মোদক বারুজী।
কুলালঃ কর্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কা।।"

অর্থাৎ সদ্‌গোপ, মালাকার, তিলি, তাঁতী, ময়রা, বারুই, কুম্ভকার, কর্মকার এবং নাপিত—এই নয়টি শ্রেণীভুক্ত জাতি-গোষ্ঠী নবশাখ বা নবশাক নামে সুপরিচিত।

জগৎবল্লভপুর জনপদে সর্বত্রই বর্ণহিন্দু এবং নবশাখ জাতি-গোষ্ঠীর বসবাস আছে।

আলোচ্য জনপদে হিন্দুদের মধ্যে 'মাহিষ্য' জাতি-গোষ্ঠীই সংখ্যাগুরু।। ১৮৯০-৯১ খ্রিস্টাব্দের জনগণনার সময়েও "মাহিষ্য" নামধারী গোষ্ঠীর উল্লেখের হদিশ পাওয়া যায় না। তবে ১৮৯০-৯১ সালের জনগণনার রিপোর্টে চাষী-কৈবর্ত [পরবর্তীকালে "মাহিষ্য"], কায়স্থ, সুবর্ণ বণিক প্রভৃতি গোষ্ঠীর "সামাজিক মর্যাদা" যথাযথভাবে রক্ষিত না হবার ফলে জোরদার আন্দোলন হয়। অবশেষে ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের জনগণনার সময়ে চাষী-কৈবর্তদের "মাহিষ্য" নামকরণ প্রচলন ঘটে। বিভিন্ন পুরাণশাস্ত্র ও সংহিতায় কৈবর্ত ও মাহিষ্যদের জন্মগত সম-মর্যাদা থাকার কারণেই চাষী-কৈবর্তরা "মাহিষ্য" জাতি-নাম গ্রহণ করে।

আলোচ্য জগৎবল্লভপুর জনপদে "মাহিষ্য" জাতি-গোষ্ঠীর প্রভাব-প্রতিপত্তি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য বলা চলে।

উপরোক্ত, জাতি-গোষ্ঠী ব্যতিরেকে অপরাপর জাতি, গোষ্ঠী হল--ব্যগ্রক্ষত্রিয় বা বাগ্‌দী, বাউরী, দুলে, কাপালি, যোগী-নাথ, ধোবা, হাঁড়ি, ভুইএ্যা, রুইদাস বা মুচি, ডোম, শুঁড়ি, বৈষ্ণব, জেলে-কৈবর্ত, মড়িপোড়া ব্রাহ্মণ, তাম্বুলী বা তাম্‌লী তিয়র, রাজবংশী, মেথর, মালো, ক্যাওরা, মাল-সাপুড়িয়া, বকমারা-মাল (শিকারী) ইত্যাদি।

সুদূর অতীতে সমাজব্যবস্থাকে গতিশীল রাখার কারণেই বংশানুক্রমিক পেশাগত দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল এবং তদনুসারে সমাজপতিদের বিধানে জাতি-গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছিল শাস্ত্র-বাক্যের খোল-নলচের আড়াল দিয়ে।

আলোচ্য জনপদে এখনও জাতি-গোষ্ঠীগত কিংবা দীর্ঘকালাগত বংশানুক্রমিক জীবিকা / পেশা / বৃত্তি অনুসরণ করে চলেছেন মালাকার, কুম্ভকার, নাপিত প্রভৃতি সম্প্রদায়। অবশ্য আধুনিক যুগোপযোগী শিক্ষা গ্রহণ, মেধার বিকাশ অনুসারে জাতিগত পেশা পরিত্যাগ করে সব গোষ্ঠীতেই "হোয়াইট কালার জব" গ্রহণ চলছে অবাধে। প্রকৃতপক্ষে অতীতের হিন্দু সমাজ রক্ষণশীলতা বশতঃ যাদের একদিন শূদ্র জনতা রূপে দুয়ারের বাহিরে রেখেছিল, আজ যুগাবসানে তারাই একপ্রকার সমাজের চালিকা-শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে গেছেন, একথাও স্বীকার্য।

এতদ্‌ঞ্চলে মুসলিম জনগোষ্ঠীর আগমন কিংবা বসবাসের সূচনা হয় সম্ভবতঃ ষোড়শ শতকে। শেখ, সৈয়দ প্রমুখ অভিজাত মুসলিম জনসম্প্রদায় আছেন আলোচ্য এলাকার কয়েকটি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু মৌজায়। [সৈয়দ = হজরত মোহাম্মদের দৌহিত্র ইমাম হুসেনের বংশীয়গণ ; শেখ = খলিফা আবুবকর-এর বংশধরগণ]। "সৈয়দ" গণের বসবাস হাফেজপুর মৌজায় ; "সেখ" গণের বসবাস জালালসী মৌজায়। এছাড়া, "খান্" গোষ্ঠীর মুসলিমগণের বসবাস রয়েছে নিমাবালিয়ায় [খাঁদারঘাট এলাকা।] অপরাপর মুসলিম জনগোষ্টী, একদা ধর্মান্তরিত হিন্দু জনতারই অংশবিশেষ বলে মনে হয়। ইদানীংকালে শিক্ষাদীক্ষাসূত্রে, ব্যবসায় ও চাকরী এবং কৃষিজমি সূত্রে অনেকেই অর্থবান ও প্রতিপত্তিশালী। এলাকায় শিক্ষাপ্রসারের ক্ষেত্রেও মুসলিম জনগোষ্ঠীর অবদান বিশেষভাবে স্বীকৃত।

হিন্দু ও মুসলিম জনগোষ্ঠীর ধর্মাচরণ ভিন্ন ভিন্ন রকম হলেও, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্মরণকালের মধ্যে ক্ষুণ্ণ হয়নি। এ ঘটনা সমগ্র দেশের পরিপ্রেক্ষিতে সবিশেষ উল্লেখ্য।

জগৎবল্লভপুর জনপদে বসবাসকারী আদিবাসীদের আগমন ঘটেছিল মোটামুটি সোয়াশো থেকে দেড়শো বছর পূর্বে রাঁচী ও ছোটনাগপুর অঞ্চল [বিহার রাজ্য] থেকে, মূলতঃ কৃষি শ্রমিকরূপে। আলোচ্য এলাকায় আদিবাসীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গোষ্ঠী হল—সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাওঁ, খাড়িয়া শবর প্রমুখ। এছাড়াও আছে কিসান, চিক বড়াইক, রাভা, বেদিয়া, লোহারা প্রমুখের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল। সাঁওতাল জনগোষ্ঠীই সংখ্যাগুরু।

এবার পরিসংখ্যানগত হিসাব নেয়া যাক্। জগৎবল্লভপুর জনপদে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার—

১৯০১ খ্রিঃ	১৯৩১ খ্রিঃ	১৯৬১ খ্রিঃ	১৯৭১ খ্রিঃ
৪০,৭২৯ জন	৬২,৭৭৫ জন	১,০৫,৪১৭ জন	১,২৪,৩২৪ জন
১৯৮১ খ্রিঃ	**১৯৯১ খ্রিঃ**	**২০০১ খ্রিঃ**	
১,৫৯,৫৬৪ জন	১,৯৭,৪২৫ জন	[??]	

পূর্বোক্ত তথ্যসূত্রে দেখা যাচ্ছে, ১৯৭১ খ্রিঃ থেকে ১৯৮১ খ্রিঃ এবং ১৯৮১ খ্রিঃ থেকে ১৯৯১ খ্রিঃ পর্যন্ত সময় সীমায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ২৮.৩৫% এবং ২৩.৭৩%। [পূর্বোক্ত কালসীমায় সমগ্র হাওড়া জেলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ২২.৭৪% এবং ২৫.৭১%।] ১৯৮১ খ্রিঃ তে প্রতি বর্গকিমিতে জনসংখ্যা ছিল ১,২৬০ জন। ১৯৯১ খ্রিঃ-তে প্রতি বর্গকিমিতে জনসংখ্যা হয়েছে ১,৫৬০ জন।

১৯৯১ খ্রিঃ জনগণনা সূত্রে জানা যাচ্ছে, আলোচ্য জনপদে--

তপশীলভুক্ত জাতির পুরুষ ২২,৬৪৭ এবং নারী ২১,৭৮৯ জন [মোট ৪৪,৪৩৬ জন] ; তপশীলভুক্ত উপজাতির পুরুষ ৯৮৯ জন এবং নারী ৯২৩ জন [মোট ১,৯১২ জন] ; [১৯৮১ খ্রিঃ তপশীলভুক্ত জাতির লোকসংখ্যা ছিল ৩৩,৫০৭ (পুরুষ ১৭,১৯৯, নারী ১৬,৩০৮) এবং তপশীলভুক্ত উপজাতির লোকসংখ্যা ছিল ১,৩৩৩ (পুং ৬৭৪, নারী ৬৫৯)]। সমগ্র জনসংখ্যার মধ্যে পুরুষ ১,০১, ৯৪১ এবং নারী ৯৫,৪৮৪।

এর পাশাপাশি দেখা যাক হিন্দু ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যাটি।

১৯৮১ খ্রিঃ ও ১৯৯১ খ্রিঃ-তে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১,২৩,৮৯৯ এবং ১,৪৭,১৩৬ [মোট জনসংখ্যার ৭৭.৬৫% ও ৭৪.৫৩%]। অপরপক্ষে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা ১৯৮১ খ্রিঃ--৩৫,৬৫৪ এবং ১৯৯১ খ্রিঃ--৫০,১৮৮ [মোট জনসংখ্যার ২২.৩৪% এবং ২৫.৪৩%]।

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী স্বল্পসংখ্যক নরনারীর বসবাস আছে আলোচ্য এলাকায় [১৯৯১ খ্রিঃ ৪৬ জন ; ০.০২% মোট লোকসংখ্যার অনুপাতে]।

জগৎবল্লভপুর অঞ্চলে মোট ১৪টি গ্রাম পঞ্চায়েত। প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বর্তমানকালে কোন্ কোন্ সম্প্রদায় / জাতিগোষ্ঠীর বসবাস তার একটি তালিকা দেয়া গেল—

গ্রাম পঞ্চায়েত	মৌজা বা গ্রামের নাম	বসবাসকারী সম্প্রদায় বা জাতির নাম
(১) জগৎবল্লভপুর - ১নং	ইছানগরী, ঝিংরা গোলপোতা, চকসাদত, বোড়ো ও আয়মাচক	বাগ্দী, মুচি, জেলে কৈবর্ত, দুলে, নবশাখ, মাহিষ্য, গোপ-গয়লা, ব্রাহ্মণ। আদিবাসী--সাঁওতাল, মুণ্ডা। মুসলিম জনগোষ্ঠী।

(২) জগৎবল্লভপুর - ২নং	তেলিহাটি, জগৎবল্লভপুর, সাদিপাড়া, বাঁকুল	বাগ্‌দী, দুলে, বাউরী, মাহিষ্য, ভুইয়্যা, মুচি, ধোপা, হাড়ি মেথর, জেলে কৈবর্ত, ক্যাওরা, সাপুড়ে মাল, বকমারা মাল, শুড়ি, রাজবংশী, কাউর, কোরোঙ্গা, নমঃশূদ্র, আদিবাসী, ও মুসলিম।
(৩) শঙ্করহাটি - ১নং	বল্লভবাটী, ঘনশ্যামবাটী, ভূরশুট ব্রাহ্মণপাড়া, ধসা, পাইকপাড়া, গুমাডাঙ্গী, স্যাকরাহাটি (শঙ্করহাটি)।	নবশাখ, মাহিষ্য, ব্রাহ্মণ, মড়িপোড়া ব্রাহ্মণ, যুগী [নাথ পদবী], তামলী, মুচি, ক্যাওরা, বাগদী, ডোম, ধোপা, জেলে কৈবর্ত, ভুইয়্যা, হাড়ি, নমঃশূদ্র (পূর্ববঙ্গাগত), আদিবাসী মুণ্ডা।
(৪) শঙ্করহাটি - ২নং	শ্যামপুর, নরেন্দ্রপুর, কৃষ্ণনন্দপুর, নবাসন ভূপতিপুর, খড়দা ব্রাহ্মণ পাড়া	বাগ্‌দী, ডোম, ক্যাওরা, দুলে, জেলে কৈবর্ত, শুড়ি, ধোপা, গোপ-গয়লা, নবশাখ, মাহিষ্য আদিবাসী—সাঁওতাল, মুণ্ডা, ভূমিজ।
(৫) মাজু	দক্ষিণ মাজু, মধ্য মাজু, উত্তর মাজু, যাদববাটী, সন্তোষবাটী, মৌলগাছি, চোঙঘুরালি, হরিনারায়ণপুর, ফিঙ্গাগাছি, মাড়ঘুরালি।	বাগ্‌দী, ক্যাওরা, দুলে, কায়স্থ, ধোপা (রজক), মুচি, শুঁড়ি, নবশাখ, মাহিষ্য, ব্রাহ্মণ।
(৬) পোলগুস্তিয়া	নলদা, গৌরীপুর, দ্বীপা, পোলগুস্তিয়া, মাখালহাটি, কাউগাছি	নবশাখ, মাহিষ্য, বাগ্‌দী, মড়িপোড়া ব্রাহ্মণ, দুলে, কুম্ভকার, মুচি, ধোপা। মুসলিম জনগোষ্ঠী।।
(৭) গোবিন্দপুর	বাটান, গোবিন্দপুর	মাহিষ্য, নবশাখ, মুসলমান।
(৮) ইসলামপুর	মাজুক্ষেত্র, ইসলামপুর, জালালসী, মল্লিকপুর	বাগ্‌দী, তিওর, নবশাখ, মাহিষ্য, ব্রাহ্মণ, স্বর্ণকার। মুসলিম জনগোষ্ঠী।
(৯) লস্করপুর	একব্বরপুর, সিদ্ধেশ্বর ফটিকগাছি, নস্করপুর	বাগ্‌দী, তিয়র, নবশাখ, ধোপা, মুচি [রুইদাস],

		ডোম, ক্যাওরা, নবশাখ মাহিষ্য, "মুসলিম জনগোষ্ঠী"।
(১০) শিয়ালডাঙ্গা	শিয়ালডাঙ্গা (উত্তর ভাগ ও দক্ষিণ ভাগ), ভূরশুট রণমহল, কুমারপুর, নিমাবালিয়া, ইছাপুর, ত্রিপুরাপুর, যমুনাবালিয়া।	বাগ্‌দী, ক্যাওরা, ধোপা, হাঁড়ি, কপালী, ডোম, মাহিষ্য, নবশাখ, ব্রাহ্মণ, সদগোপ।
(১১) হাঁটাল-অনন্তবাটী	হাঁটাল, বোহারিয়া [বৈরে]	বাগ্‌দী, তিয়র (রাজবংশী), ধোপা, নবশাখ, মাহিষ্য, ব্রাহ্মণ।
(১২) বড়গাছিয়া - ১নং	পার্বতীপুর, কমলাপুর, উত্তর সন্তোষপুর, মধ্য সন্তোষপুর	বাগ্‌দী, মুচি, ক্যাওরা, নমঃশূদ্র, যুগী [দেবনাথ পদবী], নবশাখ, মাহিষ্য, ব্রাহ্মণ, আদিবাসী-মুরমু সাঁওতাল। মুসলিম জনগোষ্ঠী।
(১৩) বড়গাছিয়া - ২নং	বড়গাছিয়া মানসিংহপুর, দক্ষিণ সন্তোষপুর, সাদতপুর	মুচি, ক্যাওরা, দুলে, বাগ্‌দী, যুগী [পণ্ডিত, নাথ পদবীযুক্ত], নবশাখ, মাহিষ্য, আদিবাসী—সাঁওতাল, মুণ্ডা, ও মুসলিম জনগোষ্ঠী।
(১৪) পাঁতিহাল	পাঁতিহাল, বাদেবালিয়া নিজবালিয়া (গ্রাম গড়বালিয়া সহ), রামপুর, প্রতাপপুর-কৃষ্ণবাটী, রমানাথবাটী, যদুপুর, শিবানন্দবাটী, হাফেজপুর	বাগ্‌দী, ক্যাওরা, ডোম, মুচি, হাড়ি, দুলে, তেলী, জেলে কৈবর্ত্ত, ধোপা, গোপ, গয়লা, শুঁড়ি, মাহিষ্য, কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, নবশাখ, কলু, আদিবাসী-মুণ্ডা। আধা-হিন্দু ও আধা-মুসলমান —সাপুড়ে মাল [মাল সাপুড়িয়া]। মুসলমান।

শিকড়ের সন্ধান

কোথাওই আকস্মিকভাবে কোন জনপদ বা গ্রাম গড়ে উঠে না। এর পিছনে থাকে কয়েকটি নিশ্চিত কারণ ও দীর্ঘ প্রস্তুতি। তারপব ঐ জনপদ ধীরে ধীরে হয়ে উঠে ইতিহাসের আওতাভুক্ত।

কথায় বলি, 'সাত পুরুষের ভিটে' কিন্তু যাযাবর পাখিদের মতোই মানুষেরাও পরিযায়ী। তাই প্রথম প্রজন্মে শিকড় ছড়াতে থাকে, দ্বিতীয় প্রজন্মে মহীরূহ আকার ধাবণের চেষ্টার পরেই তৃতীয় প্রজন্মেই দেখা যায় স্থান পরিবর্তনের পালা। এইভাবে অবিরাম পরিবর্তন, ভাঙ্গাগড়া নিয়েই এক একটা জনপদের পরম্পরা, ইতিহাস গড়ে উঠে। জগৎবল্লভপুর অঞ্চল কোন ব্যতিক্রম নয়।

প্রাচীনকালের ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক বিবরণ সূত্রে জানা যাচ্ছে যে, দক্ষিণ বাহিনী পুণ্যতোয়া গঙ্গা-ভাগীরথীর পশ্চিমদিকে অবস্থিত এক বিশাল এলাকা লাঢ় কিংবা রাঢ়, সুহ্ম, তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি আঞ্চলিক সীমায় বিভক্ত ছিল।

প্রাচীন গ্রন্থাদিতে উল্লিখিত স্থান-নাম এবং বিবিধ সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে নীহাররঞ্জন রায় তাঁর "বাঙ্গালীর ইতিহাস" গ্রন্থে মন্তব্য কবেছেন যে, "গঙ্গা-ভাগীবথীর পশ্চিম তীববর্তী দক্ষিণতম ভূখণ্ড, অর্থাৎ বর্তমান বর্ধমানের দক্ষিণাংশ, হুগলীর বেশ কিছু এলাকা এবং হাওড়া জেলাই প্রাচীন সুহ্ম, যা পববর্তীকালে মোটামুটিভাবে দক্ষিণ রাঢ় নামে চিহ্নিত হয়েছে।" [দে'জ সংস্করণ, ১৪০২ সাল, পৃঃ ১১৭]

প্রায় একই ধরণের মন্তব্য করেছেন প্রবোধচন্দ্র সেন, শশিভূষণ চৌধুরী প্রমুখেরা। প্রবোধচন্দ্র সেনের বক্তব্য হচ্ছে, হাওড়া জেলার বৃহৎ অংশ প্রাচীনকালের সুহ্মভূমি। শশিভূষণ চৌধুরীর মতে, বর্তমানকালের হাওড়া এবং মেদিনীপুর জেলা নিয়েই গঠিত ছিল প্রাচীনকালের সুহ্ম এলাকা, যা সম্ভবতঃ রাঢ়ের দক্ষিণ অংশ।

অপরদিকে রাজেন্দ্র চোল-এর বিজয়গাথা সমন্বিত এগারো শতকের তিরুমালাই শিলালিপি সূত্রে জানা যাচ্ছে, প্রাচীনকালের দণ্ডভূক্তি [বর্তমান দাঁতন এলাকা, মেদিনীপুর এবং বঙ্গের [পূর্ববঙ্গ বাংলাদেশ] মধ্যবর্তী এলাকা হচ্ছে দক্ষিণ রাঢ় বা তক্কন-লাঢ়ম।

এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "বাগেশ্বরী অধ্যাপক" [অধুনা প্রয়াত] ডঃ কল্যাণ কুমার গাঙ্গুলী তাঁর "হাওড়া ইন পারসপেকটিভ" গ্রন্থে। ডঃ গাঙ্গুলীর অভিমত সংক্ষেপে হচ্ছে—মহাভারতের কালেই সুহ্মভূমি এবং রাঢ় বা লাঢ়ভূমির ভৌগোলিক ধারণার সূচনা হয়েছে। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ ও বলেছেন। এছাড়া, খ্রিঃ পূর্ব ৪র্থ শতকে জৈন ধর্মগ্রন্থ আচারাঙ্গ সূত্র গ্রন্থে লাঢ় অর্থাৎ রাঢ়দেশের দুটি বিভাগ বজ্জভূমি ও সুব্বভূমির উল্লেখ পাওয়া যায়। বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া সহ বর্দ্ধমান, হুগলী ও হাওড়া জেলা সুবিস্তীর্ণ রাঢ়ভূমির অন্তর্গত।

প্রাচীনকালে তাম্রলিপ্তি বন্দর, দণ্ডভুক্তি ও দক্ষিণ রাঢ়ভূমি এবং ত্রিবেণী (হুগলী)-র কিছু উত্তরদিকে দামোদর-ভাগীরথীর সঙ্গমস্থল, উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়ভূমির সীমা নির্দেশক বলে বিবেচিত হত।

রাজা রাজেন্দ্র চোলের আক্রমণের সময় তক্কণ লাঢ়ম বা দক্ষিণ রাঢ় শাসিত হত শূরবংশীয় রাজা রণশূর কর্তৃক। এই শূরবংশীয় কন্যা বিলাসদেবী ছিলেন সেনরাজ বিজয় সেনের রাজ্ঞী ও বল্লাল সেনের জননী। [উৎস : তিরুমালাই লিপি।]

যাহোক, ষষ্ঠশতকে অধুনাকালের বর্দ্ধমান জেলার কিয়দংশ, হুগলী ও হাওড়া জেলার সমবায়ে গঠিত অঞ্চল পরিচিত ছিল "বর্দ্ধমানভুক্তি" নামে। রাজা গোপচন্দ্রের মল্লসারুল লিপি, রাজা লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর লিপি সমূহে যথাক্রমে সুহ্ম বা দক্ষিণরাঢ় এবং বর্দ্ধমানভুক্তি, সরস্বতী নদী তীরবর্ত্তী প্রাচীন নৌ-বন্দর বেতড্ড চতুরক [আধুনিক বেতড়] ইত্যাদির নামোল্লেখ রয়েছে।

খ্রিঃ প্রথম, দ্বিতীয় শতকে যথাক্রমে প্লিনি ও টলেমি তাম্রলিপ্ত বন্দরের ["তালুক্তি"-প্লিনি, "তমালিতেস"--টলেমি] নামোল্লেখ করেছেন। আবার খ্রিঃ সপ্তম শতকে হিউয়েন সাঙ একটি স্বতন্ত্র রাজ্যরূপে তাম্রলিপ্ত [তান-মো-লি-তি]-এর উল্লেখ্য বর্ণনা দিয়েছেন। অনুমান করা হচ্ছে, তাম্রলিপ্ত রাজ্যের বিস্তার ঘটেছিল রূপনারায়ণ ও ভাগীরথী-হুগলী নদীর তীরবর্তী অধুনাকালের হাওড়া ও ২৪-পরগণা জেলার বিস্তীর্ণ অংশেও।

সুতরাং ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পারিপার্শ্বিকতা বিচার করলে নিশ্চিত বোঝা যায় যে, আলোচ্য জগৎবল্লভপুর অঞ্চল সুহ্ম বা দক্ষিণ রাঢ় এলাকাধীন ছিল সুপ্রাচীনকালে।

একদা দক্ষিণ রাঢ়ের খ্যাতনামা এলাকা ছিল ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্য। [বর্তমানকালের ভূরশুট এলাকা]। "ন্যায়কন্দলী" গ্রন্থের রচয়িতা ভট্ট শ্রীধরাচার্য আত্মপরিচয় দানকারী ভণিতায় লিখেছেন--

আসীদ্দক্ষিণরাঢ়ায়াং দ্বিজানাং ভূরিকর্মাণাং।
ভূরিসৃষ্টিরিতি গ্রামো ভূরিশ্রেষ্ঠি জনাশ্রয়ঃ।। [৯৯১-৯৯২]।

খ্রিঃ দশম শতকে ভূরিশ্রেষ্ঠ-র ব্রাহ্মণদের কৌলীন্য ও বিদ্যাবত্তার খ্যাতি একপ্রকার প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। এই ঘটনার প্রমাণ রয়ে গেছে একাদশ শতাব্দীতে কৃষ্ণমিশ্র রচিত "প্রবোধচন্দ্রোদয়" নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে "অহঙ্কার" নামীয় কুশীলবের উক্তির মধ্যে :—

"শ্রূয়তাং তাবৎ--
গৌড়ং রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়া ততো
ভূরিশ্রেষ্ঠিকনামধাম পরমং তত্রোত্তমো নঃ পিতা।"

—শ্রেষ্ঠ রাজ্য গৌড়দেশ, তার মধ্যে নিরুপম প্রদেশ রাঢ়াপুরীর ভূরিশ্রেষ্ঠ...ইত্যাদি।

প্রাচীনকালের ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের অধীনস্থ ছিল একালের জগৎবল্লভপুর। সেকালে এই রাজ্য আধুনিককালের বর্ধমান, হুগলী, হাওড়া এবং মেদিনীপুর জেলার কতক অংশ নিয়ে সংগঠিত ছিল বলে অনুমান। ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্য, মোঘল সম্রাট আকবর কর্তৃক বঙ্গ দেশ বিজিত হবার ফলে, পরগণায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। সমগ্র জগৎবল্লভপুর এলাকা "বালিয়া পরগণা"র অধীনস্থ হয়েছে আকবরের রাজত্বকালেই। ভূরশুট ও বালিয়া পরগণা পরস্পর সন্নিবদ্ধ এলাকা।

সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে পণ্ডিত জগমোহন কর্তৃক রচিত "দেশাবলী বিবৃতি" নামীয় গ্রন্থে দক্ষিণ রাঢ়ের ভৌগোলিক সীমা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

"কংসাবত্যাহি সরিতঃ শিলাবত্যা হি ভূমিপ।
উভয়োর্মধ্যবর্ত্তী চ ভানকো বিশ্রুতো ভুবি।।
বকদ্বীপাৎ পূর্বভাগে মণ্ডলঘাটস্য পশ্চিমে।
ত্রয়োদশ যোজানৈশ্চ মিতো হিঃ ভানদেশকঃ।।"

--কংসাবতী, শিলাবতী, বকদ্বীপ ও মণ্ডলঘাট--এই চতুঃসীমাবর্তী দেশটির নাম হচ্ছে 'ভানদেশ'। ভানদেশের প্রধান তিনটি এলাকার নাম হচ্ছে চন্দ্রকোণা, ভূরিশ্রেষ্ঠ এবং বালিয়া।

শিলালিপি, সাহিত্যিক নিদর্শন এবং কোন প্রকার সরকারী নির্দেশনামা ছাড়াও আর যে উপায়ে একটি এলাকার প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির ধাবাকে জানতে পারা যায়, সেটি হলো ঐ এলাকামধ্যে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তু সমূহেব বিচার-বিশ্লেষণের ফলাফল।

জগৎবল্লভপুর অঞ্চল এদিক থেকে বলা চলে, আশপাশের এলাকার তুলনায় যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ নজির দাখিল করতে সক্ষম।

১লা জুন, ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ, আনন্দবাজার পত্রিকায় জগৎবল্লভপুর সম্পর্কে একটি চমকপ্রদ খবব প্রকাশিত হয়েছিল এইভাবে--"হাওড়া জেলাব জগৎবল্লভপুর থানাব অন্তর্গত তেলিহাটি গ্রামে কানা দামোদরের পরিত্যক্ত অববাহিকার মাটির তলা থেকে পালযুগের সমসাময়িক কালেব কিছু নিদর্শন পাওয়া গিযাছে। নিদর্শনগুলির মধ্যে কষ্টিপাথরের একটি ব্রহ্মশিলা, একটি ভগ্ন ত্রিবিক্রম বিষ্ণুমূর্ত্তি এবং একটি কেটলির মত পাত্র আছে...এখানকার ত্রিবিক্রম বিষ্ণুমূর্তিটির সঙ্গে কিছুদিন আগে মুরশিদাবাদের সাগরদীঘিতে আবিষ্কৃত একটি বিষ্ণুমূর্ত্তির সাদৃশ্য আছে। ...তেলিহাটিতে পাওয়া উমা-মহেশ্বর মূর্তিটিতেও পালযুগের মূর্ত্তির সাদৃশ্য আছে...।"

এই সংবাদ পরিবেশিত হবার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখপত্র "ওয়েস্ট বেঙ্গল" পত্রিকায় ৩০শে নভেম্বর ১৯৬৮ [ভল্যুম ১৪ ; নং ১০] তারিখে হাওড়া সদর মহকুমার তদানীন্তন এস. ডি. ও. শ্রী হিরন্ময় চক্রবর্তী লিখিত একটি সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়; যাতে বলা হয়েছিল—

জগৎবল্লভপুরের তেলিহাটি মৌজায় মজা কানা দামোদরের বুকে বালিখাত খননের সময় কতকগুলি পুরাবস্তু বা প্রত্নদ্রব্য আকস্মিক ভাবেই পাওয়া গেছে এবং সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকের আধিকারিকবৃন্দ ও স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতায় ঐগুলি উদ্ধার করাও গেছে। প্রাপ্ত প্রত্নদ্রব্যাদির মধ্যে আছে--(১) দুটি প্রস্তর মূর্তি, (২) একটি পাথরের তৈরী বিষ্ণুপট্ট, (৩) বেশ কিছু সংখ্যক ভগ্ন মৃৎপাত্রাদি (৪) একটি নলযুক্ত পাত্র (৫) অর্ধ-ফসিলকৃত প্রাণীর চোয়ালের হাড় এবং (৬) অর্ধ-গলিত নৌকার ভগ্নাংশ ইত্যাদি।

(১) প্রস্তর মূর্তি দুটির মধ্যে একটি হচ্ছে সাধারণ রাজমহল-পাথরে তৈরী বিষ্ণু মূর্তির ভগ্ন অংশ [মাপ ১২´´ × ১/২´´ × ৩´´]। দেহকাণ্ড ভগ্ন হলেও চারহাতে চারটি

আয়ুধ যথা শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম এবং কপালে তৃতীয় নয়ন পরিস্কার বোঝা যায়। "বরাভয়মুদ্রা" অঙ্কিত। অতীব সূক্ষ্ম পরিধেয় বসন। গঠন ভঙ্গিমা ও অলঙ্করণ সূত্রে বিচার করলে এটি পালযুগের মূর্তি বলে গণ্য করা যায়।

অপর প্রস্তর মূর্তিটি হলো উমা-মহেশ্বর মূর্তি [উমালিঙ্গন], পদতলে তাদের নিজ নিজ বাহন। এটিও রাজমহলের কালো কষ্টিপাথরে প্রস্তুত। চালচিত্রে অঙ্কিত পদ্ম, যেন দেব-দেবীর মূর্ত্তির মাহাত্ম্য বাড়িয়ে দিয়েছে। এটির মাপ হচ্ছে ৬১/২´´ × ৩১/১´´ × ১৩/৪´´।

(২) সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো একটি বিষ্ণুপট্ট। দুষ্প্রাপ্য ধরণের শিলায় প্রস্তুত। এটি চতুষ্কোণাকৃতি। অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও মনোহারী ভাস্কর্য। কেন্দ্রে আছে ক্ষুদ্রাকার বিষ্ণু মূর্তি—উপবেশনরত, অতীব শান্ত ও সমাহিত ভঙ্গিমা। পদতলে বাহন গরুড়—এমনি ভঙ্গিমা যেন প্রভুর ক্ষণমাত্র ইঙ্গিতেই আকাশে পাখা মেলে দিতে পারে। গরুড়ের পাখনার আশপাশে উড়ন্ত মেঘের দল! বিষ্ণু মূর্তিটিব বামপাশে যমুনা এবং ডানপাশে গঙ্গা—উভয়েই দণ্ডায়মান ভঙ্গিমায়, এদের পদতলে বাহন যথাক্রমে কূর্ম ও মকর।

এছাড়া, আশপাশে গন্ধর্বাদির মূর্তি ক্ষোদিত আছে। [চিত্র : ১]।

বিষ্ণুপট্টটির বিপরীত দিকে রয়েছে দশ পাপড়িযুক্ত পদ্ম [গোলাকৃতি] ; পদ্মের আকৃতি সুদর্শন চক্রের অনুরূপ ব্যঞ্জনা-বাহিত।

বিষ্ণুপট্টটির বেধ হচ্ছে মাত্র ৩/৪´´ অর্থাৎ পৌনে এক ইঞ্চি। উভয়দিকে খোদাই করা হয়েছে ১/৪´´ অর্থাৎ সিকি ইঞ্চি হিসাবে এবং মাঝখানে রয়েছে ১/৪´´ অর্থাৎ সিকি ইঞ্চি স্থূলত্ব! অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের প্রস্তর ভাস্কর্যের নিদর্শন।

প্রস্ফুটিত পদ্মের দশটি পাপড়ির মধ্যে বিষ্ণুর দশটি অবতার-রূপ খোদাই করা আছে। [আলোচ্য ক্ষেত্রে বিষ্ণুর দশাবতার রূপটি স্মরণযোগ্য :

"মৎস্য কূর্ম বরাহ নৃসিংহ বামনশ্চ।
রাম রাম রামশ্চ বুদ্ধ কল্কি তে তথা।।"—গ্রন্থকার]

আলোচ্য বিষ্ণুপট্টটিতে বুদ্ধমূর্তি খোদিত থাকার কারণে এটিকে পালযুগের ভাস্কর্য নিদর্শনরূপে গণ্য করা হয়েছে। [চিত্র : ২]।

(৩) ভগ্ন মৃৎপাত্রাদিগুলিকে পাল-পূর্ব যুগের বলে অনুমান করা হয়েছে, অন্ততঃপক্ষে ৮ম শতকের পরবর্তী কালের নয়।

আরও কিছু ভগ্ন মৃৎপাত্রের অবশেষ পাওয়া গেছে, যেগুলিকে গুপ্ত-পববর্তী কিন্তু প্রাক্-সেন যুগের বলে মনে করা হচ্ছে।

(৪) অর্ধ-ফসিলকৃত প্রাণীর চোয়ালের হাড়টিকে হস্তীজাতীয় কোন বৃহৎ প্রাণীর হতে পারে বলে অনুমান।

(৫) নৌকার অর্ধ-গলিত খণ্ডাংশ প্রমাণ দিচ্ছে জলপথের, নৌ-বাণিজ্যের।

বলা বাহুল্য, এ প্রতিবেদন মূল্যবান হলেও সম্পূর্ণরূপে বিশেষজ্ঞের মূল্যায়ন নয়। জগৎবল্লভপুরের তেলিহাটি-তে প্রাপ্ত প্রত্নদ্রব্যাদির ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশ্লেষণ করেছেন অভিজ্ঞ প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রী তারাপদ সাঁতরা।

শ্রী সাঁতরা সরেজমিন অনুসন্ধান করেছিলেন ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত ও সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রামীণ প্রদর্শশালা "আনন্দ নিকেতন কীর্তিশালা" [নবাসন, বাগনান, হাওড়া]-র কিউরেটর রূপে, এবং তাঁর অনুসন্ধানের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছিল : "আর্কিওলজিক্যাল এক্সপ্লোরেশন অ্যাট দ্য ভ্যালি অফ্ কানা দামোদর" শিরোনামে, "হিউম্যান ইভেন্টস্" পত্রিকায় [ভল্যুম ৩, নং ৬, জুন, ১৯৬৯ খৃঃ]।

উক্ত প্রবন্ধের ভিত্তিতে, তেলিহাটিতে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তু সমূহের তালিকাটি নিম্নরূপ—

(১) পোড়ামাটির দুটি "বারা" মুণ্ড জাতীয় মূর্তি,

(২) প্রত্ন-বঙ্গাক্ষর লিপি যুক্ত পোড়ামাটির সিলমোহর,

(৩) কালো কষ্ঠি পাথরের উমা-মহেশ্বর (উমালিঙ্গন) মূর্তি,

(৪) কালো কষ্ঠি পাথরের বিষ্ণুপট্ট,

(৫) 'স্থানক' ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান কালো কষ্ঠি পাথরের বিষ্ণুমূর্ত্তির উর্ধাংশ,

(৬) পোড়ামাটির ফলকাদি ও তার ভগ্নাংশ ইত্যাদি।

তেলিহাটিতে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তু সমূহ সম্পর্কে শ্রী সাঁতরার লিখিত বর্ণনা এবং বিচার-বিশ্লেষণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়—(১) পোড়ামাটির 'বারা' মুণ্ড দুটিতে মানুষের মুখের আদল সুস্পষ্ট, এর মধ্যে একটিকে নারীমূর্তি রূপে সনাক্ত করা চলে সাজসজ্জার বিচারে। উক্ত মূর্তি দুটির মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত সুস্পষ্ট কিন্তু পায়ের দিকটা গোলাকার। পাখির ঠোঁটের মতো বাঁকানো নাক, কান জোড়া বেশ বড়। এই মূর্ত্তিগুলির সাথে প্রাগৈতিহাসিক যুগের পোড়ামাটির মূর্তি-আদির বেশ মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ২৪-পরগণা জেলার ডায়মণ্ডহারবারের নিকটবর্তী নদীতীরস্থ হরিনারায়ণপুর কিম্বা বাগনান থানার অধীন হরিনারায়ণপুর গ্রামেও এ ধরণের পোড়ামাটির মূর্তি কিছু কিছু পাওয়া গেছে। কি উদ্দেশ্যে এগুলি ব্যবহার করা হতো তা সঠিক জানা যায় না। অনুমান করা হচ্ছে, ফসল-উৎপাদন বা কৃষি-প্রজননের সঙ্গে এগুলির যোগ থাকতে পারে। [চিত্র : ৩]। (আলোকচিত্র · শ্রী তারাপদ সাঁতরা)।

(২) তেলিহাটিতে প্রাপ্ত পোড়ামাটির সিলমোহরটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এটিতে প্রত্নবাঙলা হরফ খোদাই করা আছে। হরফের আদল দেখে মনে হচ্ছে, এটির নির্মাণকাল খ্রিঃ একাদশ শতক।

প্রথমোক্ত পোড়ামাটির মূর্তিগুলি এবং আলোচ্য সিলমোহরটি একই স্তরে একই সাথে পাওয়া গেছে বলে অনুমিত হয় যে, ঐ সকল প্রত্নবস্তুর নির্মাণকাল খ্রিঃ একাদশ শতক।

(৩) কালো কষ্টিপাথরে নির্মিত উমা-মহেশ্বর [উমালিঙ্গন] মূর্তিটির উচ্চতা মাত্র ছয় ইঞ্চি। মূর্তিটিকে সহজেই চেনা যাচ্ছে, পদতলে বৃষ ও সিংহ লাঞ্ছন থাকার কারণে। শিবের মূর্তিটি কিছুটা ক্ষয়প্রাপ্ত ; একটি পদ্মের উপর সমাসীন শিবের বাম উরুর ওপর উপবিষ্টা "উমা-পার্বতী"। ভাস্কর্যশৈলীর নিরিখে আলোচ্য উমা-মহেশ্বর মূর্তিটি খ্রিঃ দ্বাদশ শতকে নির্মিত বলেই ধারণা হয়।

(৪) কালো কষ্টিপাথরের তৈরী বিষ্ণুপট্টটির মাপ হলো ৫ ১/২´´ × ৫ ১/২´´ × ৩/৪´´। বিষ্ণুপট্টটির উভয়দিকে নতোন্নত পদ্ধতিতে ক্ষুদ্রাকার মূর্তিসমূহ খোদাই করা আছে।

বিষ্ণুপট্টটির সামনের দিকে তিনটি সারিতে নয়টি ভাগ আছে। তারমধ্যে বাঁদিকের উপর ও নীচের অংশ সম্পূর্ণরূপে ক্ষয়ে গেছে।

বিষ্ণুপট্টটির সামনের দিকের সজ্জাটি নিম্নরূপ :

- ভগ্ন ও ক্ষয়িত অংশ
- শ্রী-র মূর্তি
  দুদিকে দণ্ডায়মান দুটি হস্তী, শ্রী মূর্ত্তিটির ওপর জলধারা বর্ষণ করছে।
- খেচর বিদ্যাধর
- মকর-এর ওপর দণ্ডায়মানা দেবীমূর্তি।
- উপবিষ্ট বিষ্ণু মূর্তি
  চারিহাতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম।
- কূর্ম-এর উপর দণ্ডায়মানা দেবীমূর্তি।
- ভগ্ন ও ক্ষয়প্রাপ্ত
- হাঁটুমুড়ে উপবিষ্ট গরুড় মূর্তি।
- হাঁটুমুড়ে উপবিষ্ট মনুষ্য মূর্তি।

আলোচ্য বিষ্ণুপট্টটির বিপরীত দিকে খোদিত আছে গোলাকৃতি প্রস্ফুটিত পদ্ম, যার প্রতিটি পাপড়িতে খোদাই করা আছে ভগবান বিষ্ণুর দশ অবতারের মূর্তি সমূহ।

বিষ্ণুপট্টটির একটি বৈশিষ্ট্য বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সাধারণভাবে বিষ্ণুমূর্তির ডান ও বাম পাশে থাকে যথাক্রমে শ্রী ও সৌভাগ্যের দেবী লক্ষ্মী এবং বিদ্যাদেবী সরস্বতী। এটাই প্রচলিত রীতি। আলোচ্য ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম আছে, যা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ অনুসারে বিষ্ণুর পার্শ্বদেবী হচ্ছেন গঙ্গা। আর অগ্নিপুরাণ মতে, যমুনা ও পৃথিবী দেবীর বাহন হচ্ছে কূর্ম। নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মতে, কূর্মোপরি স্থাপিতা দেবীমূর্তি হলো ভগবান বিষ্ণুর ঘরণী পৃথিবী দেবীর মূর্তি। আলোচ্য ক্ষেত্রে দেবী পৃথিবী হলেন শ্রী, সৌভাগ্য ও সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী। ভাস্কর্য-শৈলীর বিচারে বিষ্ণুপট্টটি খ্রিঃ একাদশ শতকে নির্মিত বলেই সিদ্ধান্ত করা চলে।

(৫) অবশিষ্ট প্রস্তর মূর্তিটির কেবলমাত্র উর্ধাংশটুকু পাওয়া গেছে। তাহলেও বোঝা যায় যে, এটি হলো 'স্থানক' ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান বিষ্ণুমূর্তি। পশ্চিমবঙ্গে এ ধরনের বিষ্ণুমূর্তি অজস্র পাওয়া গেছে।

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুসরণকারী দুটি শক্তিশালী রাজবংশ, যথা বর্মণ এবং সেন রাজবংশ, একদা বঙ্গভূমিতে প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করত। বাঙ্গলার পূর্বভাগে বর্মণ এবং অন্যত্র সেন রাজবংশের আধিপত্য ছিল অনস্বীকার্য। [বর্মণ ও সেন বংশের রাজারা ছিলেন পরম বিষ্ণুভক্ত, একথাও স্মরণযোগ্য]

পশ্চিম বাংলায় এ যাবৎ যে সকল বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গেছে, সেগুলি দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে নির্মিত। ভাস্কর্যশৈলীর নিরিখে তেলিহাটিতে প্রাপ্ত ভগ্ন বিষ্ণুমূর্তিটি খ্রিঃ একাদশ শতকে নির্মিত বলেই ধারণা হয়।

(৬) পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্যস্থানে প্রাপ্ত অনুরূপ পোড়ামাটির প্রত্নদ্রব্যগুলির সাথে মিলিয়ে দেখলে স্বাভাবিকভাবেই ধারণা জন্মায় যে, তেলিহাটিতে প্রাপ্ত পোড়ামাটির পুরাবস্তুগুলিও খ্রিঃ একাদশ-দ্বাদশ শতকে নির্মিত।

পরিশেষে বলা চলে যে, কানা দামোদর নদের তীরে অবস্থিত বর্তমানের তেলিহাটি এলাকায় একটি বিষ্ণুমন্দির ছিল, যাকে কেন্দ্র করে খ্রিঃ একাদশ শতকে একটি জনপদ গড়ে উঠেছিল। ঐ জনপদ পরবর্তীকালে কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে ধ্বংস হয়ে যায়, জনশূন্য হয়ে যায়। এছাড়াও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিচার করে একটা ধারণা জন্মায় যে, একদা ঐ স্থানে একটি গঞ্জ বা ব্যবসায় কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল এবং উক্ত কানা দামোদর নদের জলপথযোগে বেতোড় বন্দর, এমনকি সরস্বতী তীরবর্তী সাতগাঁও বন্দর ও রূপনারায়ণ তীরবর্তী তাম্রলিপ্ত বন্দরের সাথেও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল তেলিহাটি এলাকায় অবস্থিত গঞ্জ ও ব্যবসায় কেন্দ্রটির।

সুতরাং জগৎবল্লভপুর এলাকা আজ থেকে প্রায় হাজার কিম্বা ন'শো বছর পূর্বে নির্মিত [অথচ বর্তমানে অবলুপ্ত] বিষ্ণু মন্দির, ব্যবসায় কেন্দ্র প্রভৃতির স্মৃতি বহন করে চলেছে পূর্বোক্ত প্রত্নবস্তুগুলি। প্রকৃতপক্ষে ব্যাপক প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলাফলের দ্বারাই একথা প্রমাণিত হতে পারে।

আজ দুর্ভাগ্যবশতঃ বহু মূল্যবান প্রত্ন-নিদর্শন অবহেলা ও অজ্ঞতার কারণেই চিরতরে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এবং প্রাচীন ইতিহাসের সূত্রাদিও হারিয়ে যাচ্ছে চিরতরে। দেশের 'সরকার' সব কিছুর দায়িত্ব নিতে পারে না, অপরপক্ষে দেশের ধনী মানুষেরাও এ সব রক্ষার জন্য আদৌ আগ্রহী নয়। সুতরাং জনসাধারণকেই এগিয়ে আসতে হবে, নিজেদের ঐতিহ্য রক্ষার জন্য নিজেদেরই সচেষ্ট হতে হবে।

বলা বাহুল্য শ্রী সাঁতরা-র বক্তব্য অনুসরণ করলে জগৎবল্লভপুর তেলিহাটি এলাকায় প্রাচীনকালের বিষ্ণুমন্দিরের অবস্থান সম্পর্কে সম্ভবতঃ নিঃসন্দেহ হওয়া যায় একটি কারণে। তেলিহাটি মৌজার অদূরে দক্ষিণদিকে অবস্থিত চাঁদূল মৌজায় কানা দামোদরের বুকে বালি খাদ খননের সময় আকস্মিকভাবে একটি বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া যায় [কুমোরডাঙ্গা নামক স্থানে], ১৯৭৪-৭৫ খ্রিষ্টাব্দে।

বিষ্ণুমূর্তিটি উদ্ধারের পরবর্তী ঘটনাও সমভাবে উল্লেখযোগ্য। পূর্ব-কথিত বিষ্ণুমূর্তিটি উত্তোলনের সাথে সাথে চতুর্দিকে লোকমুখে রব ওঠে "ঠাকুর উঠেছে, ঠাকুর উঠেছে।" প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ধর্মপ্রাণ নরনারীর দল ঐ স্থানেই অস্থায়ী চালাঘরে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের দ্বারায় পূজাদি করতে থাকে। যতদূর স্মরণ হয়, ঐ বালিখাদের মালিক বা ইজারদার ছিলেন জনৈক মুসলিম ভদ্রলোক। সুতরাং তিনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার খাতিরে এ বিষয়ে কোন আপত্তি করেন নি। কিন্তু আশ্চর্যজনক ভূমিকা ছিল ব্লক ডেভেলাপমেন্ট অফিসার এবং জগৎবল্লভপুর থানার ভারপ্রাপ্ত ও.সি. মহোদয়গণের। সরকারী পুরাতত্ত্ব আইন মোতাবেক, ঐ বিষ্ণু মূর্তিটি রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধিকারে রক্ষিত হওয়ার কথা। তা না হওয়ার ফলে, বিষ্ণুমূর্তিটি অল্পকাল মধ্যে কোন এক অজ্ঞাতস্থানে পাচার হয়ে যায়।

চাঁদুলে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্তিটির মাপ ছিল ৩০´´ × ১৪½´´ × ৩½´´ [৭৬ সে. মি × ৩৭ সে. মি × ৯ সে. মি]। হস্তধৃত আয়ুধ সমূহের সজ্জাক্রম ছিল ডানদিকে যথাক্রমে উপর-নীচ, গদা ও পদ্ম; বামদিকে উপর-নীচ, শঙ্খ ও চক্র। পার্শ্বদেবীদ্বয় ডানে লক্ষ্মী, বামে সরস্বতী। অনুমান, পাল যুগে নির্মিত। [চিত্র : ৪]।

সুতরাং তারাপদ বাবুর বিশ্লেষণ বোধহয় ভিত্তিহীন নয়, "চান্স ফাইণ্ডিংস" মাধ্যমে প্রাপ্ত চাঁদুলের বিষ্ণুমূর্ত্তিটি তার প্রমাণ।

এছাড়া চোঙঘুরালি মৌজায় প্রাপ্ত মস্তকবিহীন সূর্যমূর্তি, ঐ গ্রামের দোলতলায় বাসুদেবজ্ঞানে পূজিত ক্লোরাইট পাথরে নির্মিত পালযুগের বিষ্ণুমূর্তি, নিজবালিয়া সিংহবাহিনী মন্দিরে নিত্যপূজিত কষ্ঠি পাথরে নির্মিত পাল-সেন আমলের ত্রিবিক্রম বিষ্ণু মূর্তি, মাড়ঘুরালি মৌজায় মহাকাল-শিব জ্ঞানে পূজিত ক্লোরাইট পাথরে নির্মিত পালযুগের বিষ্ণুমূর্তি, খড়দা-ব্রাহ্মণপাড়ায় মনসা মন্দিরে ষষ্ঠীদেবী জ্ঞানে পূজিতা প্রস্তর ভাস্কর্যের পাদপীঠ প্রভৃতির উল্লেখ এক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয়। [চিত্র : ৫]।

প্রকৃতপক্ষে কৌশিকী, দামোদর ও সরস্বতী নদীর অববাহিকা অঞ্চলে অবস্থিত জনপদগুলির ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যাদির দিকে আমাদের দৃষ্টি সেভাবে পড়েনি, এ যাবৎ কোন সমীক্ষাও হয়নি গভীর মনোযোগের সঙ্গে। তাই হাওড়া ও হুগলীর এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের পরম্পরাও আমাদের এ-যাবৎ অজানা। বলা বাহুল্য, উপরোক্ত তিনটি নদী প্রবাহ যেভাবে অতীতে পরিবর্তিত হয়েছে এবং বর্তমানে রুদ্ধগতি হয়ে নিশ্চিহ্ন হবার পথে আগুয়ান, তাতে দক্ষিণ রাঢ় তথা সুহ্মভূমির পরিচয় উদ্ধার করা এককভাবে একপ্রকার অসম্ভব। এ কারণে দলবদ্ধ প্রয়াসের প্রয়োজন।

মধ্যযুগে অর্থাৎ ষোড়শ শতকের ছয়ের দশকের সূচনাকালেও বর্তমানের জেলা হাওড়ার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল উড়িষ্যারাজ মুকুন্দদেব হরিচন্দনের রাজ্যভুক্ত ছিল। মুসলিম শাসক সুলেমান কর্‌রানী [খ্রিঃ ১৫৬৫—৭২] মুকুন্দদেব হরিচন্দনকে পরাজিত করে নিজনামে যে 'সরকার' পত্তন করেন, তার নাম হয় "সরকার সুলেমানাবাদ"। সুলেমান কররানীর কনিষ্ঠ পুত্র দাউদ কররানী [খ্রিঃ ১৫৭২—৭৬] মোঘল সম্রাট আকবরের অধীনতা অস্বীকার করে আমৃত্যু সঙঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। মোঘল সেনাপতি 'খান-ই-জাহান' হোসেন কুলি বেগ এবং তাঁর সহযোগী রাজা তোডরমল্ল স্বাধীনচেতা শাসক দাউদ কর্‌রানীকে এক যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী করে মৃত্যুদণ্ড দান করেন [১৫৭৬ খ্রিঃ]। এরপর ধীরে ধীরে সমগ্র বঙ্গদেশ সম্রাট আকবরের অধীনস্থ হয়ে যায়।

১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবরের রাজস্ব মন্ত্রীরূপে রাজা তোডরমল্ল বিখ্যাত রাজস্ব তালিকা "আসল জমা তুমার" প্রস্তুত করেন। ঐ সময় প্রশাসনিক সুবিধা ও রাজস্ব আদায়ের জন্য সম্রাট আকবরের শাসনাধীন এলাকাসমূহ 'সুবা', 'সরকার', 'পরগণা' প্রভৃতিতে বিভক্ত করা হয়। এই সূত্রেই 'ভুরশুট', 'বালিয়া', 'মণ্ডলঘাট' প্রভৃতি পরগণাব জন্ম হয়।

বর্তমান কালের সমগ্র হাওড়া জেলা ঐ সময়ে তিনটি সরকারের অধীনে শাসিত হত। যথা, সরকার সাতগাঁও [সপ্তগ্রাম], সরকার সেলিমাবাদ [পূর্বতন সুলেমানাবাদ]

এবং সরকার মদারণ [মান্দারণ]।

সরকার সাতগাঁও-অধীন পরগণা সমূহ ছিল--(১) পুড়া [পরবর্তীকালের বোরো, পাইকান পরগণা--বর্তমানে যে স্থলে শহর হাওড়ার শালিকা, হাওড়া, কাসুন্দিয়া, রামকৃষ্ণপুর, বেতোড় প্রভৃতি অঞ্চল অবস্থিত]।

(২) বালিয়া [ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত জগৎবল্লভপুর, আমতা, উলুবেড়িয়া, শ্রীরামপুর, হরিপাল, বালি প্রভৃতি অঞ্চল সমবায়ে গঠিত]।

(৩) মুজফরপুর এবং (৪) খারার [আধুনিক খালোড়]।

পরগণা ভূরশুট ছিল সরকার সুলেমানাবাদ [পরবর্তীকালে যার সেলিমাবাদ নামকরণ হয় শাহজাদা সেলিমের নামানুসারে]-এর অধীন, আর পরগণা মণ্ডলঘাট ছিল সরকার মদারণ [মান্দারণ] -এর অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তীকালে 'সরকার'-এর সীমানা পুনর্বিন্যাসের সময় 'পরগণা'-র এলাকাও বদল হয়ে যায়। এ সম্পর্কে হাওড়া জেলা গেজেটিয়ারে (১৯৭২ খ্রিঃ) বলা হয়েছে, উক্ত মহলগুলিকে অবস্থানগত দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে আদিতে ছিল মাত্র দুটি 'সরকার'--সাতগাঁও (সপ্তগ্রাম) এবং মদারণ (মান্দারণ)। 'সরকার' দুটির সীমানা নির্দেশ করত দামোদর নদের পুরাতন প্রবাহপথ।

সরকার সুলেমানাবাদ-এর জন্ম হয় সাতগাঁও থেকে বালিয়া, বসন্ধরী, ধাড়সা এবং মদারণ থেকে ভোসাট (ভূরশুট) জনপদকে বিচ্ছিন্ন কিংবা একত্রিত করার ফলে। (তদেব, পৃঃ ৭৮)

এই মন্তব্য অনুসরণ করলে বোঝা যায়, পরগণা বালিয়া প্রথমদিকে সরকার সাতগাঁও (সপ্তগ্রাম) অধীনস্থ থাকলেও, পরবর্তীকালে তা সরকার "সুলেমানাবাদ" [সেলিমাবাদ]-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে বালিয়া পরগণাধীন জগৎবল্লভপুর অঞ্চলে তৎকালে প্রশাসনিক ও রাজস্ব আদায়ের দায়ভার বা কর্তৃত্ব কিভাবে বদল হয়েছিল, জানা যায়।

"আইন-ই-আকবরী" গ্রন্থ সূত্রে আরও জানা যায় যে, বালিয়া পরগণার বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৯৪,৭২৫ দাম। [চল্লিশ দাম = এক সিক্কা টাকা বা আকবরশাহী রৌপ্য মুদ্রা]

সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর [খ্রিঃ ১৫৫৬-১৬০৫] সুবা বাংলায় রাজস্ব হার পরিবর্তন, পরগণা সমূহের ভৌগোলিক সীমার পুনর্বিন্যাস, চাকলা বিভাগের সৃষ্টি প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক সংঘটনের নেতৃত্ব দেন নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ ওরফে জাফর খাঁ [খ্রিঃ ১৭০০-১৭২৭]। জাফর খাঁ-র আমলে পূর্বেকার আকবরশাহী ১৩৫০টি পরগণার পরিবর্তে ১৬৬৯টি পরগণার সৃষ্টি হয়। সুবা বাংলায় নবসৃষ্ট চাকলা-র সংখ্যা হয় তেরোটি ; ঐ সময়ে গ্রামের সংখ্যা ছিল পঁচিশ হাজার। প্রতিটি চাকলার জন্য সুনির্দ্দিষ্ট জমা ও বার্ষিক হস্তবুদ "জমা কামেল তুমারী" নামে পরিচিত ছিল।

সুবা বাংলার রাজস্ব ও প্রশাসনিক সংস্কারের ক্ষেত্রে জাফর খাঁ-র অবদান অনস্বীকার্য। অবশ্য ১৭২২ খ্রিঃ-তে প্রবর্তিত জাফর খাঁ-র আমলের রাজস্ব পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটে ১৭২৮ খ্রিঃ-তে তাঁর জামাতা সুজাউদ্দিনের দ্বারায়।

জাফর খাঁর-র আমলে সৃষ্ট তেরোটি চাকলা হচ্ছে (১) বালাসোর [বালেশ্বর] ; (২) হিজলী ; (৩) মুর্শিদাবাদ [এর মধ্যে ছিল বীরভূম ও বিষ্ণুপুরের কতকাংশ] ; (৪) বর্ধমান [এর মধ্যে স্থান পেয়েছিলো বীরভূম ও বিষ্ণুপুরের অপরাপর অংশ এবং হুগলী ও হাওড়ার কতক অংশ]; (৫) সাতগাঁও বা হুগলী [এর মধ্যে হুগলী ও হাওড়ার অন্যান্য অংশ] ; (৬) ভূষণা ; (৭) যশোহর ; (৮) আকবরনগর [রাজমহল] ; (৯) জাহাঙ্গীরনগর [ঢাকা] ; (১০) ঘোড়াঘাট ; (১১) কুড়িবাড়ী ; (১২) শীলহট্ট [শ্রীহট্ট] ; এবং (১৩) ইসলামাবাদ [চট্টগ্রাম]।

ঐকালে পরগণা বালিয়া ছিল বর্ধমান চাকলার অন্তর্গত। ১৭৮৭ খ্রিঃ পর্যন্ত বর্ধমান চাকলা-র অস্তিত্ব বজায় ছিল। পরে ব্রিটিশ রাজত্বে চাকলা বিভাগের পরিবর্তে আধুনিক কালের জেলা সমূহের জন্ম হতে থাকে। ঐ সূত্রে বর্ধমান জেলার জন্ম। ১৭৬০ খ্রিঃ নবাব মীরকাশিমের সাথে চুক্তি অনুসারে হাওড়ার এক বিশাল অংশ বর্ধমানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিকারে যায়।

১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমান জেলার কিয়দংশ নিয়ে গঠিত হয়েছিল জেলা হুগলী। আবার ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলার কতক অংশ নিয়ে গঠিত হলো জেলা হাওড়া। অবশ্য ১৭৯৫ খ্রিঃ থেকে ১৮৪৩ খ্রিঃ কালের মধ্যে প্রশাসন ও রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে হাওড়া ছিল হুগলী ও ২৪-পরগণা জেলার দ্বৈতশাসনাধীন। ১৭৯৫ খ্রিঃ-তে বর্ধমান ও হুগলীর [হাওড়া সহ] কালেক্টরেট ছিল বর্ধমানে। আর আজকের হাওড়া জেলার বাগনান ও আমতা থানা ছিল হুগলী প্রশাসকের অধীনে। অপরপক্ষে শহর হাওড়া, রাজধানী কলকাতার অংশ রূপে গণ্য হওয়ায় সেখানকার যাবতীয় ফৌজদারী মামলার বিচারকর্তা ছিলেন ২৪-পরগণার জেলাশাসক ও জেলা জজ। ১৮১৯ খ্রিষ্টাব্দে তখনকার ২৪-পরগণাধীন রাজাপুর থানা [বর্তমানে হাওড়ার জগৎবল্লভপুর-ডোমজুড়] এবং কোটরা থানা [বর্তমানে হাওড়ার শ্যামপুর] ও উলুবেড়িয়া থানার দায়ভার হুগলী জেলাশাসকের ওপর বর্তায়। ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দের ১ মে, হাওড়া-হুগলীর জন্য স্বতন্ত্র কালেকটরেট এবং ১৮৪৩ খ্রিষ্টাব্দের ১লা মার্চ স্বতন্ত্র জেলাশাসক নিযুক্ত করা হয় জেলা হাওড়ার জন্য। হাওড়াব প্রথম জেলা শাসক ছিলেন উইলিয়ম টেলর। তাঁর শাসিত এলাকা ছিল হাওড়া, শালিকা, আমতা, রাজাপুর, উলুবেড়িয়া, কোটরা ও বাগনান প্রভৃতি।

সুতরাং আজকের জগৎবল্লভপুর অঞ্চলে ষোড়শ থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত একাধিকবার প্রশাসনিক পরিবর্তন ঘটেছিল, তার প্রমাণ রয়ে গেছে সরকারী নথি এবং বিজ্ঞপ্তি সমূহে।

১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে জগৎবল্লভপুর থানার সৃষ্টি হয় এবং হাওড়া জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পূর্বে এলাকাটি ছিল হুগলী জেলাধীন। নাম ছিল রাজাপুর।

উনিশ শতকে বারবার জেলা ও থানার সীমানা পুনর্বিন্যাস এবং রাজস্ব আদায় ও প্রশাসনিক পরিবর্তনের কারণবশতঃ ক্যালকাটা গেজেটে ৯ জুন, ১৮৮০ খ্রিঃ বুধবার

একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। ঐ বিজ্ঞপ্তিতে হাওড়া জেলাধীন বালি, গোলাবাড়ী, হাওড়া, শিবপুর, ডোমজুড়, জগৎবল্লভপুর, আমতা, বাগনান, উলুবেড়িয়া ও শ্যামপুর মোট দশটি থানার সীমানা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। উক্ত বিজ্ঞপ্তিটির প্রথম অংশে রয়েছে তদানীন্তন হাওড়া জেলার সীমানার বর্ণনা। বিজ্ঞপ্তিটির ইসু তারিখ ঃ ৫ জুন, ১৮৮০ খ্রিঃ।

[প্রতিলিপির জন্য, পরিশিষ্ট : এক, অংশ দেখুন]

বলা বাহুল্য ক্যালকাটা গেজেটে প্রদত্ত জগৎবল্লভপুর থানার দক্ষিণ সীমানায় অবস্থিত জুজারসা, বনহরিশপুর, জলা বিশ্বনাথপুর, ধুনকি, পশ্চিম পাঁচলা, পাঁচলা প্রভৃতি মৌজা বর্তমানকালে থানা পাঁচলার অন্তর্গত।

এক্ষেত্রে আরও উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে, ১৮৪৩ খ্রিঃ-তে হাওড়া জেলা গঠিত হলেও তার সর্বৈব স্বাধীনতাই ছিল না। ১ এপ্রিল, ১৯২০ খ্রিঃ, রাজস্ব আদায়ের ভার লাভ করে হাওড়ার কালেক্টর-ম্যাজিস্ট্রেট। ১লা জানুয়ারি, ১৯৩৮ খ্রিঃ থেকে স্বাধীন স্বতন্ত্র জেলা হিসাবে সার্বিক অধিকার ও মর্যাদা লাভ করে হাওড়া জেলা।

বর্তমানে কলকাতা বাদ দিলে জেলা হিসাবে হাওড়া হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্রতম জেলা। হাওড়া জেলার আয়তন ৫৭৫ বর্গমাইল (সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া অনুসারে)। ১৯৬১ সালের জনগণনা দপ্তরের মতে ৫৬০.১ বর্গ মাইল। হাওড়া জেলার ভৌগোলিক অবস্থান ২২°১´৩০´´ থেকে ২২°৪৬´৫৫´´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°২২´১০´´ থেকে ৮৭°৫০´৪৫´´ পূর্ব দ্রাঘিমা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞপ্তি নং ৯৯৯-জি. এ. তাং মার্চ ৪, ১৯৬৩ অনুসারে হাওড়া জেলা, বর্তমানে প্রেসিডেন্সী ডিভিসনের অধীনস্থ। এবার জগৎবল্লভপুর জনপদের অবস্থান বিচার করুন।

প্রাচীন নৌবহ পথ : একটি বিস্মৃত অধ্যায়—

জগৎবল্লভপুর জনপদের প্রায় মাঝ বরাবর উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত কৌশিকী নদী আজ মৃতপ্রায় কঙ্কালসার হলেও ১৬৯০ খ্রিঃ, ১৭০১ খ্রিঃ-র নৌ-চার্টেও প্রশস্ত জলপথরূপেই দেখা যাচ্ছে। এর পূর্বে ষোড়শ শতকে কৌশিকীর স্রোতপথের প্রায় অনুপুঙ্খ বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে, কবি মুকুন্দ মিশ্র রচিত "বাশুলী মঙ্গল বা বিশাল লোচনীর গীত" নামীয় কাব্যে। উক্ত "বাশুলী মঙ্গল" কাব্যের নায়ক বর্ধমান কাঞ্চননগর নিবাসী ধুস দত্ত প্রাচীন কৌশিকী নদীপথে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বন্দর-নগরী তাম্রলিপ্তে গমনাগমন করেছিলেন। মুকুন্দ মিশ্রের বর্ণনার দুটি ক্ষেত্রে জগৎবল্লভপুর থানাধীন প্রাচীন মৌজা "নাঞ্জিকুলি"র উল্লেখ আছে। কবির বর্ণনা অনুসারে তাম্রলিপ্ত অভিমুখে যাত্রাকালে "বাঘাণ্ডা এড়িয়া সাধু গেল নাঞ্জিকুলি", অনুরূপভাবে কাঞ্চননগর অভিমুখে ফিরতি পথে "নাঞ্জিকুলি এড়াইয়া সাধু পাইল বাঘাণ্ডা"। এই সামান্যতম উল্লেখ সত্ত্বেও অনুমান করা চলে কৌশিকীর স্রোতবহ রূপটিকে তথা দেশের অন্তর্বাণিজ্যের দৃশ্যটিকে।

তবে মুকুন্দ মিশ্রের একটি বর্ণনা, আজ অনেককেই সংশয়ে ফেলেছে। বর্ণনাটি শুরু

হয়েছে, পূর্বোক্ত নাঞ্চিকুলি (তাম্রলিপ্তের পথে) পার হবার পরেই। বর্ণনাটি এইরূপ ঃ

"আকাশে পাতালে ঢেউ নাহি দেখি তীর।
শুনিয়া জলের ডাক প্রাণ নহে স্থির।।
কর্ণধার বলে ভাই শুন ধূসদত্ত।
ইহারে অধিক আছে জলদুর্গ পথ।।
ভয় না করিহ তুমি নায়ের ঠাকুর।
যমখানা এড়াইয়া পাইল মানকৌর।।"

কাব্যমধ্যে বর্ণিত "জলদুর্গপথ" সংশয়ের ও জিজ্ঞাসার উৎসস্থল। কারণ, (১) মুকুন্দ মিশ্র উল্লিখিত জনপদগুলি বর্তমান থাকলেও জলদুর্গপথের সঠিক সন্ধান আজ সহজে মিলছে না। তাছাড়া, জলদুর্গপথে যাত্রা কেন? সে কেবল নদীর খরতর গতির জন্যই যদি হয়, তাহলে বিগত তিন-চারশ বছরের মধ্যে আলোচ্য এলাকায়, জনপদে যে পরিবর্তন ঘটে গেছে, তার নিদর্শন আর কিছু কি মিলেছে এ যাবৎ? আলোচ্য এলাকা সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতে, কাব্যে উল্লিখিত "যমখানা" এবং "মানকৌর" হচ্ছে যথাক্রমে "ঝামটে" ও "মানকুর", রূপনারায়ণ নদ তীরবর্ত্তী স্থান। এঁদের মতে, অতীতে নাইকুলি হতে বেগুয়ার বিল, দাদখানি দহের মধ্য দিয়ে কৌশিকীর একটি শাখার সঙ্গে রূপনারায়ণ নদের যোগ ছিল। এ বক্তব্য, তর্কাতীত নয়। কারণ নাইকুলি থেকে বর্ষাকালে বিভিন্ন খাল পথে দামোদর হয়ে রূপনারায়ণ নদে পৌঁছান সম্ভব। তাছাড়া, ভরা বর্ষায়, শরতে জগৎবল্লভপুরের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত থেকে দামোদর তীরবর্ত্তী আমতা পর্যন্ত সুবিস্তীর্ণ ধানক্ষেত আজও সমুদ্রের আকার নেয়, নদী-নালা-খালের সাথে যুক্ত হয়ে যায় জলের প্রবাহ। কাব্যের বর্ণনাটি তো ভরা বর্ষারই ইঙ্গিতবহ! দামোদর নদের প্রবাহ বা তার শাখাদি গত তিন-চারশ বছরে করেছে বহুবার গতি পরিবর্তন। তাই "জলদুর্গপথ" ঐতিহাসিক কৌতূহলের সামগ্রী হয়েই রইল। এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, একটি নাব্য নদী আজ গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে। প্রাচীন কৌশিকীর তীরে তীরে গড়ে ওঠা জনপদগুলির ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের সাথে জগৎবল্লভপুর জনপদের নাড়ীর যোগ বর্তমান। নদীর রুদ্ধ গতির সঙ্গে সঙ্গে একটি বিস্তীর্ণ এলাকার সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক ইতিহাসের গতিপথও বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাচ্ছে। কে তাদের অনুসন্ধান করবে?

যোগাযোগ ব্যবস্থা–

(ক) প্রাচীন বর্ত্ম

ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে আলোচ্য জনপদে আধুনিক মান অনুযায়ী নির্মিত কোন সড়কপথের নির্ভরযোগ্য বিবরণ সহজে পাচ্ছি না। হুগলীর চুঁচুড়াস্থিত ওলন্দাজ গভর্নর ম্যাথুস ব্রুক দ্বারায় ১৬৫৮-১৬৬৪ খ্রিঃ কালমধ্যে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে ১৭২৬ খ্রিঃ-তে ভ্যালেনটাইন যে মানচিত্রাদি অঙ্কন করেন, তাতেও আলোচ্য এলাকায় কোন

সড়কপথের হদিশ নেই।

বলা বাহুল্য, এ ধরণের মানচিত্রাদির ওপর ভিত্তি করে সাম্প্রতিক কালে মন্তব্য করা হচ্ছে যে, ঐ সময় অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের সূচনাকালেও নদী-নালা-খাল প্রভৃতি জলপথে যাতায়াত ও বাণিজ্যাদি চালু ছিল, তাই সড়কপথের হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না। এই প্রকার মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন হচ্ছে ঃ মোগল ও নবাবী আমলে সামরিক অভিযান, অন্তর্বাণিজ্যাদি কি কেবলমাত্র জলপথেই সঙ্ঘটিত হত? নবাব আলিবর্দী খাঁ (১৭২০-৫৬ খ্রিঃ)-র আমলে আলোচ্য এলাকায় বর্গীর হাঙ্গামা কি কেবল জলপথেই সাধিত হয়েছিল? বিশেষতঃ ১৭৪৩ খ্রিঃতে মারাঠা বর্গীরা ভাগীরথীর তীরবর্তী হাওড়া [শহর] সহ বহু এলাকার দখল নেয়। ঐ সময়ে আলোচ্য জনপদেও বর্গীরা এসেছিল। এছাড়া, রেশম, শর্করা, সূতীবস্ত্র, নীল, পাট ইত্যাদির অন্তর্বাণিজ্য, দূরবর্তী এলাকায় যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য সর্বত্রই জলপথের ব্যবহার কি সম্ভব ছিল? সুতরাং সড়কপথের গুরুত্ব ও অস্তিত্ব নিঃসন্দেহে ছিলই। কিন্তু তা য়ুরোপীয় মানচিত্রকর দ্বারায় অঙ্কিত হয়নি। কেন? এর উত্তর মিলবে সার্ভেয়ার জেনারেল জেমস রেণেল কৃত "মেমোয়ার্স" গ্রন্থের ভূমিকাংশে। রেণেলের বক্তব্য হচ্ছে, "Considering the vast extent of India, and how little its interior parts have been visited by Europeans, till the latter part of the last century, it ought rather to surprise us, that so much geographical matter should be collected during so short a period..." ইত্যাদি।

[ভারতবর্ষের বিশালত্বের বিচারে, য়ুরোপীয়গণ বিগত শতাব্দীতে, অতি সামান্য এলাকাই পরিভ্রমণ করতে পেরেছেন বলেই মনে হয়। অপরপক্ষে, বিশাল পরিমাণ ভৌগোলিক তথ্যাদি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের নথিবদ্ধ, মানচিত্রায়িত করতে হবে, এটা ভাবলেই বিস্ময় জাগে বৈকি!]

সুতরাং য়ুরোপীয়দের মানচিত্র কিংবা ভিন্নভাবে আলোচ্য এলাকার সড়কপথের বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে না, অতএব সহজ সিদ্ধান্ত সর্বত্র জলপথের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেয়া, বিতর্কাতীত নয়। কারণ, যুদ্ধ বিগ্রহের কালে তো বটেই, দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির ধারা বজায় রাখার ও প্রশাসনিক কারণে মোগল ও নবাবী আমলে সড়কপথের গুরুত্ব বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি।

১৭৭৯ খ্রিঃ, জেমস রেণেলের নেতৃত্বে অঙ্কিত মানচিত্রে [সার্ভে শিট নং ৭] আলোচ্য এলাকায় অবস্থিত প্রধান প্রধান সড়কপথের হদিশ পাওয়া যাচ্ছে। রেণেল প্রদর্শিত সড়কপথগুলিই আসলে মোগল ও নবাবী আমলের প্রাচীন সড়কপথ। কারণ, ১৭৬৫ খ্রিঃ সুবা বাংলার দেওয়ানী লাভ কিংবা তৎপূর্বে ১৭১৭ খ্রিঃ ডিহি কলকাতা, সুতানুটি, গোবিন্দপুর গ্রামাদি ক্রয় অথবা তারও পূর্বে ১৭১৪ খ্রিঃ [৪ঠা মে] ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক হুগলী ভাগীরথী নদীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত শালিকা, হাড়িয়াড়া, কাসুন্দিয়া, রামকৃষ্ণপুর, বেতড় প্রভৃতি মৌজার পত্তনী প্রার্থনার সময়ে দেশের অভ্যন্তরভাগের সঙ্গে সড়কপথে যোগাযোগ নিশ্চিতভাবেই ছিল। তা না হলে,

পরবর্তী পাঁচ কিংবা ছয় দশকের মধ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী উন্নত যোগাযোগের জন্য অজস্র সড়কপথ নির্মাণ করেছিলেন? তাহলে নিশ্চিতভাবেই তার বিবরণ, খরচের হিসাবাদি পাওয়ার কথা এতদিনে।

"মেমোয়ার্স" গ্রন্থে রেণেলের উক্তি পরোক্ষভাবে প্রমাণ করছে, যে পরিমাণ সড়কপথ দেশের অভ্যন্তরে ছিল স্বল্পকালমধ্যে তার সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ করা ও মানচিত্রায়িত করা য়ুরোপীয়দের দ্বারা সম্ভব হয়নি। ফলে, গ্রাম্য পথাদির পরিবর্তে বাণিজ্যিক ও সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ সড়কপথগুলিকেই মানচিত্রায়িত করেছেন।

জেমস রেণেলের মানচিত্র (সার্ভে শিট নং ৭) সূত্রে জানা যাচ্ছে, অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে হুগলী-ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্তী গঞ্জ শালিকা অঞ্চল থেকে একটি সড়কপথ পশ্চিমাস্যা হয়ে মাকড়দহ, রাজাপুর [একালের ডোমজুড়-জগৎবল্লভপুর থানা এলাকা] অতিক্রম করে বড়গাছিয়ার প্রান্তদেশ স্পর্শ করে হুগলী জেলার রাজবলহাট হয়ে বিষ্ণুপুর-বাঁকুড়া অভিমুখীন হয়েছে। এ পথ অনুসরণ করলে পৌঁছান যেত রেশম ও তন্তুজাত বস্ত্রাদি নির্মাণের কেন্দ্রসমূহে।

পূর্ব-কথিত মানচিত্রে আরও একটি সড়কপথের হদিশ পাওয়া যাচ্ছে। বর্তমান ফোর্ট উইলিয়মের বিপরীত দিকে, হুগলী-ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত বিখ্যাত তানা মাকুয়া [থানা মাকুয়া] দুর্গ এলাকা থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সড়কপথ পশ্চিমদিকে "মাণিকপীর" [বর্তমান কালে জগৎবল্লভপুর থানার ইসলামপুর মৌজা ও পাঁচলা থানার সীমান্তবর্তী] পর্যন্ত পৌঁচেছে। তারপর ঐ সড়কটি দিক পরিবর্তন করে উত্তরদিকে বড়গাছিয়া [জগৎবল্লভপুর থানা] পৌঁছানোর পর পুনরায় দিক পরিবর্তন করে পশ্চিম মুখে আমতা [শহর], দামোদর নদ পার হয়ে একদিকে মেদিনীপুর জেলার রেশম শিল্প কেন্দ্রাভিমুখী হয়েছে, অপর শাখা বর্ধমান, বাঁকুড়া অভিমুখী হয়েছে, ভায়া জাহানাবাদ [আরামবাগ], উচালন ইত্যাদি।

তাহলে বোঝা যাচ্ছে, প্রধানতঃ বড়গাছিয়াকে কেন্দ্র করে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগেও গুরুত্বপূর্ণ সড়কপথের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু এ সকল পথের বাস্তব অস্তিত্ব সাম্প্রতিককালে অনেকটা পাওয়া যাচ্ছে না। অপরদিকে আলোচ্য এলাকায়, ব্রিটিশ আমলে মানচিত্রায়িত হয়নি, এমন ধরণের কিছু সড়কপথের অস্তিত্বের কথাও জানা গেছে। যেমন—

(ক) গৌড়েশ্বরের জাঙ্গাল

প্রাচীন যুগেশ্বর (শিব দেবতা) অর্থাৎ আধুনিক কালের জুজারসা অঞ্চল থেকে [পাঁচলা থানা] এ পথের সূচনা। তারপর ক্রমে বর্ধমানাভিমুখী হয়েছিল ভায়া বড়গাছিয়া। বর্তমানে বড়গাছিয়া "ধর্মতলা" (ধর্মঠাকুর মন্দির) থেকে উত্তরাস্যা হয়ে হুগলী জেলার দুধকোমরা-লক্ষ্মণপুর—আঁইয়া রথতলা-ফুরফুরা শরীফ—শিয়াখালা পর্যন্ত পথরেখার অস্তিত্ব রয়েছে। কিন্তু পথনির্মাতা গৌড়েশ্বরের নাম-পরিচয় অজ্ঞাত। তবে

লক্ষণীয় হচ্ছে, পূর্বোক্ত যুগেশ্বর [জুজারসা] অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ থেকে মোটামুটিভাবে বিংশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত ছিল রেশম শিল্প ব্যবসায় ও উৎপাদনের একটি কেন্দ্র। যুগেশ্বরে রেশম ব্যবসায়ের সূচনা করেছিলেন বংশীধর মান্না, যিনি হুগলী জেলার হরিপাল দ্বারহাট্টায় অবস্থিত কোম্পানীর রেশম কুঠির প্রধান তত্ত্বাবধায়ক-কর্মচারী ছিলেন। বংশীধর বাবুর পূর্বপুরুষেরা, কথিত হয়, এসেছিলেন আমতা থানার খালনা গ্রাম থেকে। পূর্ব-কথিত গৌড়েশ্বরের স্মৃতি হিসাবে ধনদীঘি, দেউলপোতা, ভগ্ন প্রসাদ ইত্যাদি বর্তমান আছে জুজারসা গ্রামে। বলা বাহুল্য, এ পথ বর্তমানে নানান ভাবে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। এছাড়া, গৌড়েশ্বর খাল নামে একটি জলপথও রয়েছে পাঁচলা এলাকায়।

(খ) মুলুকচাঁদের জাঙ্গাল

এই পথরেখাটির অস্তিত্ব পাওয়া যাচ্ছে, মুন্সিরহাট চাঁদনী অঞ্চলের শঙ্করহাটি থেকে নাইকুলি হয়ে জগৎবল্লভপুর পর্যন্ত। অনুমিত হয়, এ পথের সঙ্গে বড়গাছিয়া–আঁটপুরগামী (হুগলী জেলা) পথের যোগ ঘটেছিল। মুলুকচাঁদ ছিলেন পশ্চিম দেশাগত ব্যবসায়ী–কিন্তু পথ নির্মাণের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা অনুসন্ধান সাপেক্ষ।

(গ) আট জাঙ্গালীর বাঁধ

পথরেখাটির নামকরণ ইঙ্গিত দিচ্ছে, আটটি সড়ক পথের সাথে সংযোগরক্ষাকারী গ্রাম্যপথ। জগৎবল্লভপুর থানার পূর্ব-দক্ষিণ সীমান্তে যেখানে গ্রাম-বসতি শেষ হয়েছে, তারপরেই শুরু হয়েছে সুবিশাল কৃষিক্ষেত্র। এই সুবিশাল কৃষিক্ষেত্র তিনটি থানা এলাকার (জগৎবল্লভপুর-পাঁচলা-আমতা) সংযোগস্থল। সম্ভবতঃ এ পথের সূচনা হয়েছিল কমলাপুর-পার্বতীপুর মৌজায় তারপর ভায়া বড়গাছিয়া-মানসিংহপুর-হাঁটাল-অনন্তবাটী-বোহারিয়া পর্যন্ত এসে একদিকে যুগেশ্বর (জুজারসা), খসমহরা বাঁধের বাজার (পাঁচলা থানা) এলাকায় গিয়েছে আর অপরদিকে শিয়ালডাঙ্গা, ভুরশুট রণমহল, নিমাবালিয়া (জগৎবল্লভপুর থানা) প্রভৃতি এলাকায় গৌড়েশ্বরের জাঙ্গালের সাথে মিলিত হয়েছিল। এছাড়াও, এ পথের আরও শাখা ছিল বলেই অনুমান। কিন্তু সে সবের অস্তিত্ব পাওয়া ভার। গ্রাম বসতি ও কৃষিক্ষেত্রের সীমানা বরাবর বাঁধের অংশ বিশেষ কতক কতক আজও দৃশ্যমান।

পূর্বোক্ত আলোচনা সূত্রে প্রমাণিত যে, অষ্টাদশ শতকে, কোম্পানী আমলে আলোচ্য জনপদে বড়গাছিয়া ছিল যোগাযোগ রক্ষাকারী গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র।

বিংশ শতকের সূচনাভাগেও বড়গাছিয়ার গুরুত্ব হ্রাস পায়নি। ১৯০৯ খ্রিঃ, ও'ম্যালী-চক্রবর্তী সম্পাদিত হাওড়া জেলা গেজেটিয়ার সূত্রে জানা যাচ্ছে, হাওড়া (শহর) থেকে জগৎবল্লভপুর (ভায়া বড়গাছিয়া) ১৫ মাইল ৬ ফার্লং সড়কপথে প্রথম ৮ মাইল ছিল পাকা। ১৯৩৪ খ্রিঃ, এ. জে. কিং হাওড়া জেলায় মোট ২,০৬০ মাইল (৩,২৯৬ কি. মি.) পাকা ও কাঁচা সড়কপথের উল্লেখ করেছেন, তাঁর জরিপ কাজের সূত্রে।

(ঘ) স্বাধীনোত্তর কালের সড়কপথ

৮ ডিসেম্বর, ১৮৮৬ খ্রিঃ, জেলাশাসক মিঃ ই. ভি. ওয়েস্ট ম্যাকট-এর সভাপতিত্বে তদানীন্তনকালের হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড-এর কাজকর্মের সূচনা হয়। এই বোর্ডের অন্যতম কর্মসূচী ছিল জেলাস্থিত সড়কপথ, কাঁচা রাস্তা, পুল, কালভার্ট সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।

১৯৫১ খ্রিঃ ও তার পরবর্তীকালে আলোচ্য জগৎবল্লভপুর জনপদে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড (বর্তমানে হাওড়া জেলা পরিষদ) নিম্নোক্ত পথাদির দেখভালের দায়িত্বে ছিলেন। যথা—

(১) হাওড়া (শহর) থেকে জগৎবল্লভপুর (ভায়া বড়গাছিয়া)	২৫.২ কি.মি
(২) জগৎবল্লভপুর থেকে আমতা (ভায়া মুন্সিরহাট)	১৬.০ কি.মি
(৩) জগৎবল্লভপুর থেকে খাঁদারঘাট (ভায়া পাঁতিহাল)	৭.২ কি. মি.
(৪) জগৎবল্লভপুর থেকে সীতাপুর (হুগলী জেলা)	১.০ কি.মি.
(৫) জগৎবল্লভপুর থেকে মশাট (হুগলী জেলা)	১.৬ কি.মি.
(৬) বড়গাছিয়া থেকে শঙ্করহাটি (ভায়া পাঁতিহাল)	৪.৮ কি.মি.
(৭) বড়গাছিয়া থেকে রণমহল (ফিডার রোড—ভায়া বাদেবালিয়া-নিজবালিয়া-ইছাপুর)	৫.৬ কি.মি.
(৮) মুন্সিরহাট থেকে বসন্তপুর (আশুতোষ রোড)	৭.৬ কি.মি.
(৯) বড়গাছিয়া থেকে জালালসী-বৌবাজার (ভায়া মুন্সিরহাট)	৮.০ কি.মি.
(১০) মুন্সিরহাট থেকে ঘোড়াদহ (আমতা থানা)	৪.৮ কি.মি
(১১) বড়গাছিয়া থেকে কমলাপুর	২.০ কি.মি
(১২) মাজু থেকে জগরামপুর	২.০ কি.মি.
(১৩) একব্বরপুর থেকে আঁদুল (সাঁকরাইল থানা)	১২.৮ কি.মি.
(১৪) বড়গাছিয়া থেকে নবগ্রাম (সতীশচন্দ্র রোড)	
(১৫) জালালসী-বৌবাজার থেকে ডোমজুড় ভায়া কুলডাঙ্গা (পাঁচলা থানা)	

হাওড়া জেলা বোর্ড ছাড়াও গ্রামগুলির মধ্যে সংযোগকারী গ্রাম্য পথাদির দেখভাল করত সেকালের ইউনিয়ন বোর্ডগুলি।

উনিশ শতকের শেষভাগে হাওড়া শহর বা তার নিকটবর্তী ডোমজুড় থেকে জগৎবল্লভপুর পর্যন্ত বিস্তৃত পথে (বর্ষাকাল ব্যতিরেকে) চলাচল করত ঘোড়ার গাড়ী। বসন্তকুমার পাল লিখিত "স্মৃতির অর্ঘ্য" (১৮৮০ খ্রিঃ) পুস্তকে এ ধরণের পথের যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ রয়েছে— ".....রাস্তাঘাট শুকনা থাকলে ঘোড়ার গাড়ীতে বড়গেছে হয়ে আমতার ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের বাঁধ দিয়া যাওয়া যাইত।" এই তথ্যের স্বীকৃতি রয়েছে হাওড়া জেলা গেজেটিয়ার (১৯৭২ খ্রিঃ) গ্রন্থে : Horses were used chiefly by Muhammadans and up-country men. [পৃঃ ২৯২]। নিজবালিয়ার প্রবীণ বাসিন্দা, অশীতিপর বৃদ্ধ ব্যবসায়ী গৌর ঘোষ মহাশয়ের জবানীতে জেনেছিলাম, জনৈক মৌলা

বক্‌স নিয়মিতভাবে জগৎবল্লভপুর (ভায়া বড়গাছিয়া) ডোমজুড় গাবতলা পর্যন্ত ঘোড়ার গাড়ীতে সওয়ারী নিতেন।

বিগত পঁচিশ বছরের মধ্যে সমগ্র জগৎবল্লভপুর থানার প্রতিটি প্রান্তের সঙ্গে পাকা সড়ক, বাস কিংবা মিনিবাস যোগে শহর হাওড়ার যোগাযোগ গড়ে উঠেছে। হাওড়া স্টেশন বাস টার্মিনাস থেকে যথাক্রমে হাঁটাল, খাঁদারঘাট (ভায়া পাঁতিহাল-নিজবালিয়া), ফটিকগাছি (ভায়া পাঁতিহাল-খাঁদারঘাট), মাজু (ভায়া মুন্সিরহাট), পানপুর (ইসলামপুর ভায়া মুন্সিরহাট-মাজু-জালালসী) মিনিবাস এবং জগৎবল্লভপুর ও মুন্সিরহাট গামী (ভায়া বড়গাছিয়া) অজস্র বাস ও মিনিবাস পাকা সড়কে চলাচল করছে। অপরদিকে ছয় নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে আগালে ভায়া মাণিকপীর আমতা, উলুবেড়িয়া সহজে পৌঁছান সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে মাকড়সার জালের মত বিস্তৃত পাকা সড়কগুলির বিবরণ বাহুল্যবোধে দেওয়া গেল না। এ সকল পাকা সড়কের কতক অংশ পুরাতন পথাদির ওপর নির্মিত, কতক সম্পূর্ণ নূতনভাবে নির্মিত।

রেলপথের ইতিবৃত্ত

১৮৫১ খ্রিঃ, কলকাতা বন্দরের সুবৃহৎ পশ্চাদভূমির সাথে সহজ যোগাযোগের সূত্র হিসাবে শহর হাওড়ার পূর্বপ্রান্ত থেকে হুগলী-পাণ্ডুয়া পর্যন্ত ব্রডগেজ রেলপথের সূচনা হয়েছিল। ঐ রেলপথের সুবিধা থেকে আলোচ্য জনপদ বঞ্চিত ছিল। যাহোক, ১৮৯৭ খ্রিঃ হুগলী-ভাগীরথীর পশ্চিমতীরবর্ত্তী তেলকলঘাট (রামকৃষ্ণপুর) থেকে [বর্তমানে বার্ণ স্ট্যাণ্ডার্ড কোং-র কারখানা] শহর হাওড়ার পঞ্চাননতলা-কদমতলা-দাশনগর এবং ডোমজুড় থানার প্রান্তদেশ ধরে একটি ন্যারোগেজ রেলপথের সূচনা হয়েছিল। চলতি কথায় এ ট্রেনের নাম ছিল "মার্টিন ট্রেন।" আলোচ্য এলাকায় উনিশ শতকের শেষভাগে "মার্টিন ট্রেন"-ই ছিল আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার একমাত্র উপায়। এই রেলপথ স্থাপনের পিছনে তদানীন্তন হাওড়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের তৎপরতাও অনস্বীকার্য।

১২ জুন ১৮৮৯ খ্রিঃ হাওড়া জেলা বোর্ড এবং বেঙ্গল ডিষ্ট্রিক্ট ট্রামওয়েজ কোং লিঃ-এর এজেন্ট মেসার্স ওয়ালশ লোভেট অ্যাণ্ড কোং অফ ক্যালকাটা ইঞ্জিনীয়ার্স-এর সাথে একটি চুক্তি সম্পাদনের পর ন্যারোগেজ রেলপথ স্থাপনের কাজ শুরু হয়। ঐ সময় অন্যতম প্রতিবন্ধকতা ছিল অর্থ সংগ্রহের ও বিনিয়োগের।

২৭ মার্চ, ১৮৯৫ খ্রিঃ, ক্যালকাটা গেজেটে প্রদত্ত সরকারী নির্দেশনামা অনুসারে জানা যাচ্ছে যে, মেসার্স মার্টিন অ্যাণ্ড কোম্পানীর সাথে রেলপথ নির্মাণের চুক্তি পুনর্নবীকরণ করা হয়েছে। অতঃপর ঐ চুক্তির পরিবর্তন ও সংশোধন করা হয় ৩ মে, ১৮৯৭ খ্রিঃ এবং ১৬ মে, ১৯০১ খ্রিঃ। অবশ্য এর পূর্বে ২৬ মার্চ, ১৮৯৫ খ্রিঃ, পি. ডব্লিউ. ডি. বিভাগের বিজ্ঞপ্তি নং ১১১ এবং ১১২ যোগে রেলপথ নির্মাণের সরকারী আদেশনামা জারী করা হয়।

মার্টিন রেলপথের শাখা ছিল তিনটি—

(১) হাওড়া-আমতা (ভায়া বড়গাছিয়া) ;

(২) হাওড়া-চাঁপাডাঙ্গা (ভায়া বড়গাছিয়া) ;

(৩) হাওড়া-শিয়াখালা।

'মার্টিন লাইট' রেলওয়ের মনোগ্রাম

এই রেলপথ নির্মাণের ক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিবন্ধকতা দূর হয়েছিল তদানীন্তন হাওড়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের দৌলতে। যথেষ্ট পরিমাণ মুনাফা হবে না, এই যুক্তিতে যখন রেলপথ স্থাপনের উদ্যোগ বিনষ্ট হবার উপক্রম ঘটে, তখন আর্থিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে গ্যারাণ্টী দিয়েছিল হাওড়া জেলা বোর্ড। প্রাথমিক ভাবে খরচ ধরা হয়েছিল ২৮,০০,০০০ টাকা। সেই সময় গভর্নমেন্ট সিকিউরিটি-র ব্যাজ ছিল বার্ষিক ৩%। এই অবস্থায় হাওড়া জেলা বোর্ড বিনিয়োগের ওপর ৪% ব্যাজ দিতে রাজী হল এই শর্তে যে, মুনাফার ৫০% প্রাপ্য হবে হাওড়া জেলা বোর্ডের। সৌভাগ্যের বিষয়, প্রথমাবধি যে পরিমাণ মুনাফা অর্জিত হয়েছিল, তার দ্বারা হাওড়া জেলা বোর্ড লাভবান হয়েছিল। কোন কোন বছর ১,৩০,০০০ টাকা পর্যন্ত বার্ষিক সেস আদায় করত হাওড়া জেলা বোর্ড!

হাওড়া-আমতা লাইট রেলওয়ে কোং লিঃ রেজেষ্ট্রিকৃত হয় ২মে, ১৮৯৫ খ্রিঃ-তে। পেড-আপ ক্যাপিটাল ছিল ১৬,০০,০০০ টাকা। মেসার্স মার্টিন বার্ন কোং ছিল প্রথম ম্যানেজিং এজেন্ট। মার্টিন বার্নের টমাস মার্টিন, চার্লস ওয়ালশ, হ্যারল্ড মার্টিন ও রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জী, মেসার্স ওয়ালশ লোভেট কোং এই রেলপথের উদ্যোগী অংশীদার ছিল।

হাওড়া-আমতা লাইট রেলওয়ে কোং লিঃ-র প্রথম সাবস্ক্রাইবার ছিলেন মনীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য, চার্লস ওয়ালশ, রাজেন্দ্র নাথ মুখার্জী, ভূতনাথ মুখার্জী, মতিলাল আশ, সি.টি. গেডেস, গিলবার্ট হেনডারসন প্রমুখ।

হাওড়া-আমতা শাখার কাজ সমাপ্ত হয় চার দফায়—

১ম দফা : ১ জুলাই, ১৮৯৭ খ্রিঃ—তেলকলঘাট-ডোমজুড় : ৯.২০ মাইল

২য় দফা : ১ অক্টোবর, ১৮৯৮ খ্রিঃ—ডোমজুড়-বড়গাছিয়া : ৫.৮৭ মাইল

৩য় দফা : ৪ মে, ১৮৯৮ খ্রিঃ—বড়গাছিয়া-মাজু : ৫.৫০ মাইল

৪র্থ দফা : ১ জুন, ১৮৯৮ খ্রিঃ—মাজু-আমতা : ৬.৬২ মাইল

চার দফায় মোট ২৭.১৯ মাইল ন্যারোগেজ যে রেলপথ স্থাপিত হয়েছিল, তার একটা উল্লেখযোগ্য অংশের সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছিল জগৎবল্লভপুর জনপদ। হাওড়া-আমতা, হাওড়া-চাঁপাডাঙ্গা, হাওড়া-শিয়াখালা রেলপথ তিনটি হাওড়া ও হুগলী জেলার কৃষিপ্রধান গ্রামীণ এলাকার সাথে শহরাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ গড়ে তুলেছিল। দুঃখের বিষয়, এই রেলপথটি মূলতঃ দক্ষ পরিচালনার অভাব, সরকারী বৈষম্য, আধুনিকীকরণের অনীহা এবং যাত্রী সাধারণের অবিমৃষ্যকারিতার ফলে ১ জানুয়ারী, ১৯৭১ খ্রিঃ তারিখে চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।

এই রেলপথগুলি চিরতরে বন্ধ হয়ে যাওয়া সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তিটির বয়ান ছিল

নিম্নরূপ :

হাওড়া-শিয়াখালা লাইট রেলওয়ে কোং লিঃ,
হাওড়া-আমতা লাইট রেলওয়ে কোং লিঃ

বিজ্ঞপ্তি

পরিচালকবর্গ দুঃখের সহিত ১লা জানুয়ারী, ১৯৭১ হইতে এই রেলপথটি বন্ধ করিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছেন।

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া ক্রমবর্ধমান সড়ক পরিবহন প্রতিযোগিতায় এই রেলটি তাহার বর্ধিত যাত্রীর অংশ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, এবং বর্ধিত পরিচালনা ব্যয়ভারে এমন একটি পরিস্থিতি উদ্ভব হইয়াছে যাহাতে সমগ্র ব্যয় সমগ্র আয়কে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। বৎসরের পর বৎসর ট্রেন চলাচলের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার ঝুঁকি লইয়াও অত্যাবশ্যক পরিপূরণ ও পরিবর্তনের কাজগুলি বিলম্বিত করা হইয়াছে।

অধিকন্তু ১লা জানুয়ারী হইতে হাওড়া-আমতা রেলওয়ে (যাহার রেলপথের অংশ দাশনগর হইতে শেষ স্টেশন হাওড়া ময়দান অবধি এই রেল দ্বারা যৌথভাবে ব্যবহৃত হয়)—১লা জানুয়ারী এই রেলপথ বন্ধ হইয়া যাওয়ায় ঐ দিনের পর ফলত এই রেলটি চালনা সম্ভব নহে।

কর্মচারী ও যাত্রী সাধারণের স্বার্থে গত ৭ বৎসর কেন্দ্রীয় সরকারকে এই রেলপথকে জাতীয়করণ অন্যথায় ভর্তুকী দানের কর্তৃপক্ষের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ ১লা জানুয়ারী ১৯৭১ সাল হইতে এই রেলপথটি বন্ধ করিয়া দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

রেজিষ্টার্ড অফিস :
১২, মিশন রো,
কলিকাতা - ১
২৫ নভেম্বর, ১৯৭০

বোর্ডের অনুমত্যনুসারে
সি. এস. মেহতা
জেনারেল ম্যানেজার

—হায় পরিচালন কর্তৃপক্ষ! ১৯০০ খ্রিঃ-তে ঐ হাওড়া-আমতা রেলপথে গ্রস আয় ছিল ২,৫৬,৪১৮ টাকা, ১৯০৫ খ্রিঃ-তে গ্রস আয় দাঁড়িয়েছিল ৩,২৮,৭২২ টাকা—সেক্ষেত্রে রেল কোম্পানী লিকুইডেশন ঘোষণা করলেন ১৯৭১ সালে। উন্নতির পরিবর্তে অবনতি!!

হাওড়া-আমতা রেলপথটি বন্ধ হয়ে যাবার ফলে যাত্রীসাধারণ তো বটেই, মহাবিপদের মুখোমুখি হল এলাকার অর্থনৈতিক পরিস্থিতি। তারপর "ড্যাম কুড় কুড়" ভোটের বাদ্যি বাজনার আবহাওয়ার কথা চিন্তা করে ১৬ জুলাই, ১৯৭৪ খ্রিঃ হাওড়া ময়দানে (বর্তমানে স্টেডিয়াম) ভারতবর্ষের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, প্রস্তাবিত হাওড়া-আমতা ব্রডগেজ রেলপথের শিলান্যাস স্থাপন করেছিলেন। অবশেষে দশ বছর পরে বাঙালী রেলমন্ত্রী বরকত গণি খান চৌধুরীর উদ্যোগে হাওড়া স্টেশন থেকে

বড়গাছিয়া পর্যন্ত ব্রডগেজ লাইনে ইলেকট্রিক ট্রেন চালু হয়ে সরকারের মুখরক্ষা করলেও এলাকার উন্নতিতে কোন বিশেষ অবদান আজও রাখতে পারেনি। অতি সম্প্রতি, মুন্সিরহাট ভায়া পাঁতিহাল ঐ রেলপথ সম্প্রসারণের কাজ জোর কদমে চলছে। তবে নিদেনপক্ষে আমতা পর্যন্ত সম্প্রসারিত না হলে এলাকার বিশেষ সুবিধা হবার সম্ভাবনা সামান্যই।

মজার বিষয় হচ্ছে, ১ জুলাই, ১৮৯৭ খ্রিঃ থেকে ১ জুন, ১৮৯৮ খ্রিঃ মধ্যে প্রায় ২৮ মাইল ন্যারোগেজ রেলপথ স্থাপিত হয়েছিল। সেক্ষেত্রে উন্নত আধুনিক প্রযুক্তির কালে প্রায় একই পরিমাণ পথে ব্রডগেজ রেল চালু করা ত্রিশ বছরেও সম্ভব হয়নি! বর্তমানে আর এক বাঙালী রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগ ফলপ্রসূ হবার আকাঙ্ক্ষায় এলাকার অনেকেই অধীর হয়ে উঠেছেন। নিন্দুকেরা বলছেন "ফলেন পরিচীয়তে"। আসলে সরকারী স্তরে অনীহা ও দীর্ঘসূত্রীতার ফলে এলাকার জনগণ আর কারোর ওপরই বিশ্বাস রাখতে পারেন না। সুখের বিষয়, বিগত ২২।৭।২০০০ তারিখে মুন্সিরহাট (মহেন্দ্রলাল নগর) রেলওয়ে ষ্টেশন পর্যন্ত রেলপথটি চালু হয়েছে।

পূর্ব-কথিত মার্টিন রেলপথে জগৎবল্লভপুর জনপদে অবস্থিত স্টেশনগুলির নাম হচ্ছে—বড়গাছিয়া জংশন, পাঁতিহাল, মুন্সিরহাট, মাজু, দক্ষিণ মাজু, জালালসী, পানপুর (হাওড়া-আমতা শাখায়) এবং জগৎবল্লভপুর ও ইছানগরী (হাওড়া-চাঁপাডাঙ্গা শাখা)।

ডাক ও তার [টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনসহ]

শের শাহ (খ্রিঃ ১৫৩৯-৪৫)-র আমলে অশ্ববাহিত ডাক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। ঐ ঘটনার বহু যুগ পরে, সর্বভারতীয় ভিত্তিতে, ১ অক্টোবর, ১৮৫৪ খ্রিঃ থেকে ডাক টিকিটের প্রচলন হয় সর্বসাধারণের সুবিধার্থে। ১৮৮৩ খ্রিঃ থেকে টেলিগ্রাফ যোগাযোগের দায়িত্ব নেয় ভারতীয় ডাকবিভাগ। ইতিপূর্বে ১৮৮০ খ্রিঃ ডাকবিভাগ "মানি অর্ডার" লেনদেন এবং ১৮৮২ খ্রিঃ ডাকঘর সেভিংস ব্যাঙ্ক বিভাগ চালু হয়।

হাওড়া শহরে ১৮৫৪ খ্রিঃ প্রথম ডাকঘর স্থাপিত হয় (ঐখানে বর্তমানে টেলিগ্রাফ অফিস)। জগৎবল্লভপুর জনপদে প্রাচীনকালের ডাকঘর হচ্ছে মাজু (১৮৯৩ খ্রিঃ), পাঁতিহাল ও জগৎবল্লভপুর। বর্তমানে ডাকঘর রয়েছে—জগৎবল্লভপুর, বড়গাছিয়া, পাঁতিহাল, মুন্সিরহাট. মাজু, গড়বালিয়া, নিজবালিয়া, শিয়ালডাঙা, সিদ্ধেশ্বর, ইসলামপুর, পোলগুস্তিয়া, গোবিন্দপুর, নস্করপুর, দক্ষিণ সন্তোষপুর, হাঁটাল-অনন্তবাটী, পাইকপাড়া, মানসিংহপুর প্রভৃতি এলাকায়।

টেলিগ্রাফ যোগাযোগ ব্যবস্থার আদি-পর্বে বড়গাছিয়ায় (১৮২১-১৮৩০ খ্রিঃ) একটি একশ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট সিমাফোর সিগন্যাল টাওয়ার নির্মিত হয়েছিল। কলকাতাস্থিত ফোর্ট উইলিয়ম, তারপর হাওড়া জেলার আঁদুল-মহিয়াড়ী, বড়গাছিয়া, হুগলী জেলার দিলাকাশ, হায়াৎপুর, মুবারকপুর, নবাসন—এইভাবে একের পর এক সিমাফোর স্তম্ভ নির্মিত হয়েছিল। ১৮৩০ খ্রিঃ নাগাদ পরিকল্পনা বাতিল করা হয়। সিমাফোর স্তম্ভের

নীচেকার ব্যাস ছিল তেইশ ফুট ; দেওয়াল ছিল সাতফুট চওড়া ; আশী থেকে একশ ফুট উচ্চতাজনিত ভারসাম্য রক্ষার করার কারণে মাথার দিকটা আনুপাতিক হারে সরু হত। লোকমুখে এগুলি "গির্জা" নামে পরিচিত ছিল। বড়গাছিয়ার স্তম্ভটি ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। ঐটি ছিল "ধর্মতলা"-র কাছাকাছি।

১৯৭০ খ্রিঃ-র প্রথমভাগেই জগৎবল্লভপুর জনপদে টেলিফোন ব্যবস্থা চালু হয়। কিন্তু ঐ সময়ে মার্টিন রেলপথ বন্ধের মুখোমুখি, এলাকার অর্থনীতিও হোঁচট খাচ্ছে দ্রুতগামী সড়ক ও রেলপথের অভাবে। তার মধ্যে টেলিফোনের আবির্ভাব কোন্ কামে লাগব?! জিজ্ঞাসা ও বিস্ময় যুগপৎ লোকের মনে। নিজবালিয়া (সবুজ গ্রন্থাগার) থেকে প্রকাশিত পাঁচ নয়া পয়সা দামের মাসিক বুলেটিন "অনুভব"-এর প্রথম সংখ্যাতেই সেই বিস্ময় ও জিজ্ঞাসার রেশ ধরে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন—"মাথা নেই তার মাথাব্যথা! পাঁতিহাল প্রতাপপুর ফুঁড়ে টেলিফোনের তার চলে যাবে গ্রামান্তরে। যে খুঁটিগুলি পোঁতা হয়েছে এবং হচ্ছে সেগুলি আমাদের বুকশূলের মতো লাগছে। কারণ টেলিফোন হোল সেই জগতের একটি অংশ যে জগতে ব্যবসা-বাণিজ্য চলে, কল-কারখানায় চাকা ঘোরে, অফিস-কাছারী বসে, ভালো পরিবহন ব্যবস্থা আছে, আছে বিদ্যুৎশক্তি, যেখানে কথাই একটা শক্তি। সে সব কিছুই এলো না, এলো একটা টেলিফোন! আমলাতন্ত্র এতই অন্ধ! বোধ করি বধিরও, নইলে কৃষির জন্য সাহায্য কিম্বা পথের দাবী শুনতে পেতেন.....।

আমাদের বক্তব্য ঐ টাকায় ডিপ টিউবওয়েল হতে পারত, গোটা কয়েক প্রাইমারী স্কুলও হতে পারত কিংবা তালবাঁধির রাস্তাটা বেলের হাইস্কুল পর্যন্ত ইটপাতাও হতে পারত।" [অনুভব, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা। এপ্রিল, ১৯৭০।] ঐ ঘটনার প্রায় ত্রিশ বছর পরে, পাঁতিহাল থেকে ফটিকগাছি ভায়া বেলের হাইস্কুল, খাঁদারঘাট পাকা সড়কে মিনিবাস, টু হুইলারের দাপাদাপি। পি. সি. ও., এস. টি. ডি. বুথ বেশ কয়েকটি। প্রতিটি সম্পন্ন ব্যবসায় ও প্রতিষ্ঠিত পরিবারেই টেলিফোন আধুনিক জীবনযাত্রার অঙ্গবিশেষ। নিঃসন্দেহে দেশ প্রগতির পথে!

ব্যবসা-বাণিজ্য

সর্বদেশে সর্বকালেই ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্ব স্বীকৃত। আলোচ্য জনপদে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্র হিসাবে কয়েকটি 'বাজার' গড়ে উঠেছিল, তার কিছু হদিশ মিলেছে। এলাকার প্রাচীন হাট-বাজার-গঞ্জগুলি হচ্ছে—

১. জগৎবল্লভপুর বাজার (প্রতিষ্ঠা সন ১৬৯৬ খ্রিঃ) - দৈনিক
২. নিজবালিয়া বাজার (" " ১৭৫২ খ্রিঃ) - "
৩. সিদ্ধেশ্বর হাট (" " ১৭৯৮ খ্রি) - মঙ্গল, শুক্র
৪. মুন্সিরহাট ও বাজার (" " ১৮২২ খ্রিঃ) হাট - রবিবার, বাজার - দৈনিক
৫. পাঁতিহাল হাট (" " ১৮৮২ খ্রিঃ) - বুধবার
৬. বড়গাছিয়া বাজার (" " ১৯০২ খ্রিঃ) - দৈনিক (সকাল বাজার)

বর্তমানে সর্বত্র উত্তম পরিবহন ব্যবস্থা ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে নানান জায়গায় বাজার, গঞ্জ গড়ে উঠেছে। সম্প্রতি "মিনি সুপার মার্কেট" জাতীয় বিপণির আবির্ভাব ঘটছে।

ব্যবসা-বাণিজ্যের মূলে রয়েছে পণ্য উৎপাদন। গ্রামীণ এলাকায় কৃষিজ পণ্য এবং কুটির শিল্পজাত পণ্য বিপণনই প্রাধান্য পেয়ে থাকে। তবে বর্তমানে শহর থেকে আমদানী করা পণ্যেরই প্রাধান্য।

কুটির শিল্প : প্রাচীন ঐতিহ্য

রেশম

জগৎবল্লভপুর জনপদে ঐতিহ্যপূর্ণ কুটির শিল্প বললে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় রেশমের। জগৎবল্লভপুর জনপদ ও তার সংশ্লিষ্ট পার্শ্ববর্তী থানা এলাকায় রেশম শিল্প সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য বিবরণ রয়েছে এন. জি. মুখার্জীর "সিল্ক ফ্যাব্রিকস অফ বেঙ্গল" নামীয় পুস্তকে। দামোদর ও তার শাখা কানা নদীর তীরবর্ত্তী এলাকায় রেশম গুটি উৎপাদনের জন্য তুঁতগাছের চাষ ছিল। আর রেশম গুটি উৎপাদক চাষী ও রেশমবস্ত্র উৎপাদক তাঁতীদের প্রধান আবাসস্থল ছিল হাওড়া সদর মহকুমার অন্তর্গত থানা জগৎবল্লভপুর ও আউটপোস্ট সাঁকরাইল এলাকায়, তৎসহ উলুবেড়িয়ার বিভিন্ন থানার ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে। তবে জগৎবল্লভপুর জনপদে রেশমগুটি প্রতিপালক-চাষী এবং রেশম বস্ত্র উৎপাদক তাঁতীদের ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল রীতিমত উল্লেখযোগ্য।

এন. জি. মুখার্জীর লিখিত বিবরণসূত্রে আরও জানা যাচ্ছে যে, রেশমগুটি উৎপাদক রূপে ঐ সময় যুক্ত ছিলেন কৈবর্ত্ত, বাগ্‌দী এবং নিম্নশ্রেণীর মুসলমানগণ। চাষী-কৈবর্ত্তদের মধ্যে যাঁরা তুঁতগাছ-মাধ্যমে রেশমগুটি উৎপাদন করতেন, সাধারণ্যে তাঁরা "তুঁতে-কৈবর্ত্ত" নামে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। ঐসময় "তুঁতে-কৈবর্ত্ত"দের একটি বড় ধরণের বসতি ছিল জগৎবল্লভপুর থানাধীন (আউট পোষ্ট পাঁচলা) "যুগেশ্বর" গ্রামে।

বলা বাহুল্য, ঐ সময়কার যুগেশ্বর গ্রাম বর্তমানকালের পাঁচলা থানাধীন জুজারসা মৌজা। যুগেশ্বর নিবাসী জনৈক বংশীধর মান্নার সূত্র ধরে রেশম শিল্পের প্রচলন ঘটে গড়বালিয়া সহ কয়েকটি গ্রামে। অনুসন্ধানে জানা গেছে, সুদূর উড়িষ্যা থেকেও রেশমগুটি কেনাবেচার লোকজন আলোচ্য এলাকায় যাওয়া-আসা করতেন। ঐ ধরণের কয়েকটি পরিবার স্থায়ীভাবে আলোচ্য জনপদে বসতি স্থাপনও করেছেন, তাঁদের সন্তানসন্ততিরা গড়বালিয়া, একাব্বরপুর প্রভৃতি গ্রামে আছেন। এঁরা উৎকলীয় ব্রাহ্মণ, পদবী পাণ্ডা। রেশমের সূত্রেই জগৎবল্লভপুরে 'বর্মণ' পরিবারের আগমন।

রেশম শিল্পে দাদন ব্যবস্থার প্রচলন ছিল ভালো রকম। দাদনের টাকার বিনিময়ে মহাজন ব্যবসায়ীরাই উৎপাদিত পণ্য খরিদ করে নিতেন এবং তা চালান যেত শ্রীরামপুর মহকুমাধীন ফুরফুরা, মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল এবং কলকাতার আড়তে। জগৎবল্লভপুর জনপদে উৎপাদিত পণ্যের প্রধান আড়ত ছিল ফুরফুরা।

কত বিঘা পরিমাণ জমিতে পলু পোকা (রেশম গুটি উৎপাদক)-র খাদ্য হিসাবে তুঁতগাছ চাষ হত, তার গড় উৎপাদন মূল্য কত ছিল, তারও হিসাব পাওয়া গেছে ও'ম্যালী-চক্রবর্তী সম্পাদিত জেলা গেজেটিয়ার সূত্রে। আনুমানিক ৫০০ বিঘা জমিতে তুঁতগাছের চাষ হত এবং উৎপাদিত রেশমগুটির মূল্য ছিল মোটামুটিভাবে ১২,৫০০ টাকা। স্মরণ রাখতে হবে, এ হিসাব হচ্ছে বিংশ শতকের সূচনাভাগের (১৯০১-৩ খ্রিঃ)।

১৯৭২ খ্রিঃ প্রকাশিত হাওড়া জেলা গেজেটিয়ার গ্রন্থে [পৃঃ ১৮৮-১৮৯] মন্তব্য করা হয়েছে যে, বর্তমানে সমগ্র হাওড়া জেলার কোথাওই রেশম শিল্পের অস্তিত্ব নেই। তবে ১৭৯০ থেকে ১৮৩৫ খ্রিঃ মধ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দৌলতে রেশম ব্যবসায়ের প্রচলন ছিলই। ১৮৭৫ সালেও রেশম শিল্পের অবনতির কালেও এই ব্যবসায়টি বর্তমান ছিল। এমনকি, ১৯০০ খ্রিঃ-তেও ছয়শতের মত আংশিক সময়ের কর্মী রেশম শিল্পের সাথে জড়িত ছিল। জগৎবল্লভপুর ও সাঁকরাইল থানা এবং উলুবেড়িয়া মহকুমার বিভিন্ন গ্রামে রেশম শিল্পের প্রচলনের হদিশ পাওয়া যাচ্ছে। কৈবর্ত্ত, বাগ্‌দী ও নিম্নশ্রেণীর মুসলমানগণই ছিল রেশম উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত কর্মী। হুগলীর ফুরফুরা, মেদিনীপুরের ঘাটাল এবং কলকাতার আড়তে উৎপাদিত পণ্য চালান যেত।

পুরাতন নথি সূত্রে জানা যাচ্ছে, ১৮৭২ খ্রিঃ-এ পলু পোকার চাষ থেকে বিঘা প্রতি আয় হত আশী টাকা। অথচ রেশম শিল্পের ইতিহাস বলছে, খ্রিঃ ১৮৩৩ থেকে ১৮৪৩ সালের মধ্যে রেশম শিল্পের এন্তেকাল ঘনিয়ে আসে! এই অন্তর্জলী যাত্রার কালে তো বটেই, পরবর্তী প্রায় ষাট-সত্তর বছর ধরে জগৎবল্লভপুর জনপদ সহ [পার্শ্ববর্তী] এক বিশাল এলাকায় রেশম শিল্প বেঁচে থাকার রহস্যটা কি? তার উত্তর পাওয়া যাচ্ছে, হুগলীর তদানীন্তন জেলা শাসক জর্জ টয়েনবী-র প্রতিবেদন সূত্রে : ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য-কুঠিগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ১৮৩৮ সাল নাগাদ এ জেলায় অসংখ্য ব্যক্তি মালিকানাধীন রেশম ও নীল ফ্যাক্টরী চালু ছিল। তার কারণ, এগুলির দ্বারা স্থানীয় মানুষদের কর্মসংস্থান ও অর্থাগম হত।

বলা বাহুল্য, জর্জ টয়েনবী এই মন্তব্য করেছিলেন, খ্রিঃ ১৭৯৫ থেকে ১৮৪৫ সালের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে। আর ঐ কালে জগৎবল্লভপুর জনপদ ছিল জেলা হুগলীর অধীন!

নীলচাষ

বড় মজার কল করেছে ফিরিঙ্গি কোম্পানী।

মানুষ মারা, পয়সা করা, নীল আবাদের আমদানী।।

বঙ্গে "নীল বিদ্রোহ"-এর অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক প্রেক্ষিত যাই হোক না কেন, মূলতঃ অর্থাগমের উপায় হিসাবে নীল চাষ করত বোধহয় সাধারণ চাষীরাও। ১৮৯২ খ্রিঃ নাগাদ নীল চাষ রহিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত জগৎবল্লভপুর জনপদেও নীল চাষের যে প্রচলন ছিল, তার একটি পাথুরে প্রমাণ হচ্ছে কৌশিকীর ধারে মাজুতে অবস্থিত

নীলকুঠির ভগ্নাবশেষ। বর্তমানে নীলকুঠিটি নিশ্চিহ্ন বটে, কিন্তু জনমানস ও স্থান নাম থেকে নীলকুঠি কিংবা নীলকুঠির বাঁধ এখনও নির্বাসিত হয়নি। একটি জরিপ তথ্যসূত্রে জানা যাচ্ছে, একদা সমগ্র হাওড়া জেলায় নীল চাষ হত চারশ একর জমিতে! ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানায় দুটি, ডোমজুড় থানার খাঁটোরা গ্রামে শ্মশানের কাছে একটি এবং মাজুতে একটি নীলকুঠি ছিল। তবে এদের মালিকানা কাদের ছিল, বার্ষিক উৎপাদন কত ছিল, এ ধরণের তথ্য বিশেষ জানা যায়নি এখনও। দক্ষিণ ঝাপড়দহের [ডোমজুড়] জেলেপাড়ায় জনৈক নীলসাহেবের কবর এখনও নাকি আছে।

শর্করা

রেশম শিল্পের মতোই লুপ্ত হয়ে গেছে এলাকার শর্করা শিল্প। হয়তো ব্যাপকভাবে শর্করা শিল্পের প্রচলন এলাকায় ছিল না। কিন্তু শর্করা প্রস্তুত করা হতো এক আয়াসসাধ্য মৌলিক পদ্ধতি অনুসরণ করে। এই কারণেই ধারণা জন্মায় যে, আলোচ্য এলাকায় নিশ্চিতভাবেই তা বিপণন হতো নতুবা শ্রমসাধ্য কুটির শিল্প টিকে ছিল কি ভাবে?

মাজু গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন চোঙঘুরালি গ্রামে ১৯৭৩-৭৪ খ্রিস্টাব্দে পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনের সন্ধানে যখন শ্রী তারাপদ সাঁতরার সঙ্গে ঘোরাঘুরি করছিলাম, তখন ঐ গ্রামের "গুড়ে পাড়া"র জনৈক সুবৃদ্ধ ব্যক্তির কাছে শর্করা প্রস্তুতকরণের যে মৌলিক পদ্ধতির সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল, তা এই প্রকার—

আখের রস জ্বাল দিয়ে তৈরী করা হতো গুড়। মানুষ সমান জালায় [বৃহদায়তন মৃৎপাত্র] রাখা হতো ঐ গুড়। ঐ প্রকারের জালায় ধরত কুড়ি থেকে ত্রিশ মণ গুড়। 'সার' এবং 'মাত'—এই দু'ধরণের গুড় ছিল। 'মাত' গুড় ছিল অর্দ্ধ-তরল, ঐ অবস্থাতেই বাজারে বিক্রি করা হতো। অপরপক্ষে 'সার' গুড় ছিল অনেক উচ্চমানের এবং জমাটবদ্ধ। 'সার' গুড় চাটাই বিছিয়ে রোদে প্রথমে শুকিয়ে নেয়া হতো, তাতে 'সার' গুড়ের জলীয় অংশ প্রায় থাকত না। এরপর এক বিশেষ ধরণের শ্যাওলা জাতীয় জলজ উদ্ভিদ পাটার মতো করে ঐ 'সার' গুড়ের ওপর চাপিয়ে দেয়া হতো—এভাবে দু'তিনদিন কাটানোর পর শ্যাওলার পাটা সরিয়ে নেয়া হতো, তখন দেখা যেত পূর্বেকার গুড়ের রঙ ঘন কালচে বাদামী থেকে লালচে রঙের হয়ে গেচে। ঐ লালচে রঙের ঝুরো গুড় বিক্রি হতো 'কাশীর চিনি' নামে। কাশীর চিনির ব্যবহার ছিল পূর্জাচনায়। আর ব্রাহ্মণ ও বিধবা, যাঁরা শুচি মেনে চলতে বাধ্য হতেন, তাঁরাই কাশীর চিনি ব্যবহার করতেন।

বলাবহুল্য, আমাদের বাল্যকালে ঐ ধরণের লালচে রঙের চিনিকে বলা হতো "দোলো"। আজকাল এসব কথা শুনি না, শব্দটা অপ্রচলিত হয়ে গেছে।

চোঙঘুরালী গ্রামে ঐ সময় একটা পুকুর দেখেছিলাম যেখানে "দোলো চিনি" তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় শ্যাওলার চাষ হতো।

এ থেকেই বোঝা যায় যে, ছোট আকারে হলেও শর্করা বিপণন, শর্করা প্রস্তুতিকরণ এ অঞ্চলে চালু ছিলই।

কুটির শিল্প : সাম্প্রতিক কাল

পুরাতন কালের মতই আজও বহু প্রকারের কুটির শিল্পের প্রচলন রয়েছে এলাকা মধ্যে। রেশম, নীল, শর্করা অতীতের স্মৃতি হলেও প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত মৃৎশিল্প এখনও হারিয়ে যায়নি। এছাড়া যুগের চাহিদানুসারে গড়ে উঠেছে তালাচাবি, তারের ব্রাশ, লৌহেতর ধাতু সহযোগে প্রস্তুত নকল গহনাদি, ঘোড়ার চাবুক, পরচুলা, বিড়ি তৈয়ারী এবং নানাবিধ ক্ষুদ্র ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্যাদির কারখানা সমূহ। সূচীশিল্পের মধ্যে সর্বাধিক প্রাধান্য শাড়ীতে জরি চুমকি যোগে নকাশী কাজ, ফেজ টুপি তৈয়ারী ইত্যাদি।

মৃৎশিল্প

মৃৎশিল্পের কারিগরি দু' রকমের—(ক) মাটির পাত্র, বাসন, ঘর ছাইবার উপকরণ ইত্যাদি এবং (খ) দেব-দেবীর মূর্তি, খেলনা ইত্যাদি প্রস্তুতকরণ।

প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে "কুম্ভকার" এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে "সূত্রধর" সম্প্রদায় যুক্ত আছেন। জগৎবল্লভপুর থানা অঞ্চলে মোটামুটি দশ-এগারটি গ্রামে 'কুম্ভকার' সম্প্রদায়ের বসবাস। এগুলি হচ্ছে জগৎবল্লভপুর, পাঁতিহাল, নিজবালিয়া, শঙ্করহাটি, নরেন্দ্রপুর, যাদববাটী, পাইকপাড়া, নলদা, গোবিন্দপুর এবং ইসলামপুর। এই গ্রাম কয়টির মধ্যে পাঁতিহালের কুম্ভকারদের খ্যাতি সর্বাধিক। নৃতত্ত্ববিদ নির্মলকুমার বসু 'বিয়াল্লিশের বাংলা' গ্রন্থে পাঁতিহালে নির্মিত মাটির হাঁড়ির উল্লেখ করে গেছেন। হাওড়া জেলা গেজেটিয়ার (১৯৭২ খ্রিঃ) গ্রন্থেও একই মন্তব্যের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

পাইকপাড়া, নিজবালিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে তৈরী হয় তিজেল হাঁড়ি, সখের তিজেল হাঁড়ি, ব্যন্নন (ব্যঞ্জন) হাঁড়ি, ধুচুনি, মুড়ি ভাজার খোলা ও খুলি, ধান সিদ্ধ করার হাঁড়ি, পিঠা তৈরীর ঝারা, রুটি তৈরীর জন্য তাওয়া, আশ্কে পিঠের সরা, মালসা, খেজুর রস এবং তাল রসের ভাঁড়, ডাবা, জল রাখার জালা এবং ঘর ছাঁইবার চোঙ খোলা, ফুলের টব, জলের গ্লাস, খুরি, প্রদীপ ও পিলসুজ, পূজোর ঘট, কলসী ইত্যাদি।

শঙ্করহাটি (মুন্সিরহাট) অঞ্চলে আবার দই মিষ্টির হাঁড়ির সারা বছর চাহিদা থাকায় এগুলি বেশী পরিমাণে তৈরী হয়। তবে ইদানীং তো প্লাস্টিক প্যাকেটে ভরে রসগোল্লা-পানতুয়া জাতীয় রসে হাবুডুবু মিষ্টি বিক্রির রেওয়াজ হয়ে গেছে।

কুমোর বাড়ীর কাজ তো 'চাক' ছাড়া কল্পনা করা যায় না। অথচ ১৯৮৮ খ্রিঃ দেখেছি শঙ্করহাটির পঞ্চু পাল (তখন বয়স ছিল ৬৫+, গুরুতর রোগে আক্রান্ত হয়ে সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী)—এর গৃহিণী চাকের সাহায্য না নিয়ে সম্পূর্ণ হাতের কায়দায় হাঁড়ির উপরের অংশটি তৈরী করছেন! চাক আবিষ্কারের পূর্বে আদিম যুগের নারীরা কি এইভাবেই মৃৎপাত্রাদি তৈরী করতেন! এঁর বাপের বাড়ী বেগড়ী অঞ্চলে। এইভাবে ঐ অঞ্চলের মেয়ে-বৌয়েরা কাজ করে থাকেন।

নরেন্দ্রপুর, শঙ্করহাটির কুম্ভকার সম্প্রদায় যে সব পোড়ামাটির খেলনা তৈরী করে থাকেন সেগুলি হলো পালকী, রথ, চাকা লাগানো নৌকা, মা-পুতুল, মেয়ে পুতুল

ইত্যাদি। শেষোক্ত দুধরণের পুতুল নিজবালিয়াতেও তৈরী করতে দেখা যায়। মা-পুতুল, মেয়ে-পুতুল গঠনভঙ্গি হচ্ছে নীচের দিকটা (পায়ের অংশ) গোলাকার কিন্তু উন্নত বুক, মুখ, নাক, চোখ সুস্পষ্ট। আদিম ভাবাপন্ন—এজলেস টাইপ।

অ্যালুমিনিয়ম, স্টেনলেস স্টীল প্রভৃতি ধাতব তৈজসপত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে এখনও যে কুম্ভকারদের তৈরী জিনিসপত্রের কেনা-বেচা চলছে, এটাই ঐ শিল্প ও ব্যবসার প্রাণশক্তি। তবুও বলি, কুম্ভকার বৃত্তিতে টিকে থাকার লড়াই শুরু হয়েছে ষাটের দশকেরও পূর্ব থেকে। আজ একপ্রকার নিরুপায় হয়েই পিতৃপুরুষের বৃত্তি আঁকড়ে ধরে আছেন, এমন কর্মীর সংখ্যাও ধীরে ধীরে কমছে। অথচ এটি অত্যন্ত পরিশ্রম সাপেক্ষ কুটির শিল্প এবং নারী ও পুরুষ মিলিতভাবে যুক্ত এই কুটীর শিল্পটির সাথে।

[দ্র. "মৃৎশিল্প : জগৎবল্লভপুর"—শিবেন্দু মান্না, ক্রন্দসী, শারদীয়া, ১৯৮৮]

তারের ব্রাশ

এই কুটির শিল্পটি গত পনের-কুড়ি বছরের মধ্যে রীতিমতো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কল-কারখানা ছাড়াও অন্যত্র এ ধরণের তারের বুরুশের চাহিদা রয়েছে। এক সময় প্রধান বাজার ছিল আসামের চা বাগান এলাকা। এখন আসাম থেকে দক্ষিণভারত সর্বত্র চালান যাচ্ছে। ব্রাশ শিল্প চালুর মূলে ছিল গড়বালিয়া নিবাসী দাশরথি মান্না এবং তাঁর ভাই রতন মান্না প্রমুখের ব্যবসায়িক উদ্যোগ। বর্তমানে ওঁদের পরিবারের প্রায় সকল সদস্যই ব্রাশ শিল্পের সঙ্গে জড়িত। আশপাশের কয়েকটি গ্রামের ছেলেরাও এখানে হাতেকলমে কাজ শিখে স্বতন্ত্র ইউনিট চালু করেছে, কলকাতায় চালান দিচ্ছে নিয়মিত।

তালাচাবি

জগৎবল্লভপুর এলাকায় একটি বহুকাল প্রচলিত কুটির শিল্প হচ্ছে তালাচাবি শিল্প। বিংশ শতকের গোড়ায় ১৯০২ খ্রিঃ নাগাদ তালাচাবি শিল্পের সূচনা হয় মানসিংহপুর গ্রামে সুশীল চন্দ্র কর এবং ভীষ্মদেব মান্নার উদ্যোগে। সুশীল চন্দ্র কর মশায় আলীগড়ে তালাচাবির কাজ হাতে-নাতে শিখেছিলেন। তারপর ওনাদের দেখাদেখি আরো অনেকেই হাতে-কলমে কাজ শিখে কারবার চালু করেছিলেন। জগৎবল্লভপুর থানা অঞ্চলে উনিশ শো ষাটের দশকে কমপক্ষে আঠারোটি মৌজায় তালাচাবি ও তার যন্ত্রাংশ তৈরী হতো। এই গ্রামগুলি হচ্ছে, মানসিংহপুর, হাঁটাল-অনন্তবাটী, বোহারিয়া, বড়গাছিয়া, পাঁতিহাল, বাঁকুল, বাদেবালিয়া, ইছাপুর, রামপুর, মাড়ঘুরালী, চোঙঘুরালী, সিদ্ধেশ্বর, ফটিকগাছি, একব্বরপুর, শিয়ালডাঙ্গা, সাদতপুর, সন্তোষপুর (মধ্য ও দক্ষিণ), গড়বালিয়া।

বলাবাহুল্য, পার্শ্ববর্তী পাঁচলা এবং ডোমজুড়--এই দুটি থানার পনের-ষোলটি গ্রামেও তালাচাবি শিল্পের প্রচলনের কথা জানা যায়। তবে এককভাবে এখনও জগৎবল্লভপুর এলাকাই শীর্ষস্থানে রয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, বড়গাছিয়া-তে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তালা-চাবি শিল্পে সহায়তাদানের উদ্দেশ্যে ১৯৫৮-১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে চালু

করেছিলেন সেন্ট্রাল লক ফ্যাক্টরী। এ সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্টেট স্ট্যাটিসটিক্যাল ব্যুরো প্রকাশিত "লকস অ্যাণ্ড কীজ ইণ্ডাস্ট্রি ইন হাওড়া" নামীয় সমীক্ষা পত্রের (১৯৬১ খ্রিঃ) মন্তব্য হচ্ছে ঃ পঃ বঃ সরকার কর্তৃক তালাচাবি শিল্পকে আধুনিকীকরণ ও বিভিন্নভাবে সহায়তাদানের জন্য বড়গাছিয়া-য় ইতিমধ্যে "সেন্ট্রাল লক ফ্যাক্টরী" স্থাপন করা হয়েছে। এই ফ্যাক্টরী স্থাপনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ডাইরেক্টরেট অফ ইণ্ডাস্ট্রিজের অভিমত হচ্ছে, উক্ত সেন্ট্রাল লক ফ্যাক্টরীতে উন্নতমানের ও বিপুল পরিমাণে তালাচাবির যন্ত্রাংশ নির্মাণ করা হচ্ছে আধুনিক মেশিনের সাহায্যে এবং ঐ সকল উৎপাদিত যন্ত্রাংশ স্থানীয় কর্মী সমবায়গুলিতে সরবরাহ করা হবে জোড়া লাগিয়ে সম্পূর্ণ তালাচাবি সেট তৈরীর জন্য। এইভাবে কর্মীরা ঘরে বসেই উন্নতমানের তালাচাবি তৈরী করতে পারবে, আই. এস. আই. মার্কা যুক্ত হয়ে তা বাজার-জাত করা সম্ভব হবে।

আসল কথা হচ্ছে, এলাকায় দীর্ঘকাল প্রচলিত তালাচাবি শিল্প যাতে আলিগড় বা অনুরূপ কেন্দ্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে, তারই জন্য সেন্ট্রাল লক ফ্যাক্টরী স্থাপন। এখানে উৎপাদিত পণ্য প্রকৃতই উন্নতমানের ছিল তো বটেই, দামেও ছিল তুলনামূলকভাবে সস্তা। ১৯৬০-৬১ সালে উৎপাদিত তালাচাবি সাইজ অনুসারে দাম ছিল—

(১)	১$\frac{১}{২}$'' ইঞ্চি × চার লিভার (পিতলের ডুপ্লিকেট চাবিসহ)	টাঃ ৪.০০
(২)	২'' ইঞ্চি × চার লিভার (—ঐ)	টাঃ ৫.৫০
(৩)	২$\frac{১}{২}$'' ইঞ্চি × ছয় লিভার (—ঐ)	টাঃ ৭.৫০
(৪)	৩'' ইঞ্চি × ছয় লিভার (—ঐ)	টাঃ ১২.০০

ঐ সময়ে ৩'' × ছয় লিভার তালার গড়পড়তা বাজারমূল্য ছিল প্রায় টাঃ ১৭.৫০ পঃ। কোন শিল্পে শতকরা তেত্রিশ ভাগ মুনাফা প্রত্যাশা করা চলে? ভাগ্যের পরিহাস এমনই যে, বড়গাছিয়াস্থিত সেন্ট্রাল লক ফ্যাক্টরী যোগ্য পরিচালকের অভাবে দু'দশক আগে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গেছে। তারপর ঐ তালাচাবি কারখানার জায়গায় পান থেকে তেল নিষ্কাশন, পাটের দড়ি-সুতুলী জাতীয় শিল্প চালু করার চেষ্টা হলেও স্থায়ী ফললাভ কিছুই হয়নি।

জগৎবল্লভপুর অঞ্চলে বিভিন্ন সাইজের ক্যাবিনেট লক, ফার্নিচার লক, মার্টিস লক, দরজার তালাচাবি ছাড়াও সিন্ধুক ও আলমারীতে ব্যবহার্য তালাচাবি, পার্টনার লক (পর পর দুটো-তিনটে চাবি ব্যবহার করতে হয়) তৈরী হয়। একদা কলকাতার বাইরে মুম্বাই, তামিলনাড়ু, বাঙ্গালোর ছাড়াও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ, আফ্রিকা, ইন্দোনেশিয়া, মালয়, সিংহল প্রভৃতি রাষ্ট্রের সাথে ব্যবসায় চালু ছিল। মূলধন এবং দক্ষ কারিগরের অভাবে এ শিল্পের পূর্ব গৌরব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন।

সূচীশিল্প / জরিকাজ

বর্তমানে সবচেয়ে জনপ্রিয় ও অর্থকরী হয়ে উঠেছে সূচী শিল্প বা এমব্রয়ডারীর কাজ, যেটি এ অঞ্চলে জরি শিল্প নামে সুপরিচিত। বিভিন্ন ধরণের রঙ্গীন সুতো, পুঁতি, জরির সাহায্যে শাড়ীতে কলকা বা নকশার কাজে নিযুক্ত রয়েছে অজস্র নারী-পুরুষ। এক সময় জরির কাজ চলত জালালসী মৌজায়। ঐ গ্রামের মুসলিম কারিগররাই যুক্ত ছিল। কিন্তু শাড়ীতে নয়া ডিজাইন, আধুনিক ফ্যাশানের চাহিদা ক্রমে বাড়তে থাকায় জরি শিল্প হয়ে উঠেছে পরিবার কেন্দ্রিক। বহু মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে-বৌয়ের দল অবসর সময়ে এই কাজ করছেন। নিঃসন্দেহে একটা আর্থিক নিরাপত্তা দিতে সক্ষম হয়েছে জরি শিল্প। এই এলাকায় এমন কোন গ্রাম নেই, যেখানে শাড়ীতে জরি-নকশা কাজের কারিগর নেই। বহুক্ষেত্রে রীতিমতো 'কারখানা' চালানোর পদ্ধতিতে এই ব্যবসায় পরিচালিত হচ্ছে। বহু মুসলিম ও হিন্দু পরিবার এর সাথে জড়িত।

এ ছাড়া মাজু অঞ্চলে ফেজটুপি তৈরী করছে দু'তিনটি মুসলিম পরিবার। আর একটি মুসলিম পরিবার তৈরী করে থাকে ঘোড়ার চাবুক।

তাঁতশিল্প

উনিশ শো সালের বিশ-ত্রিশের দশকেও এ অঞ্চলে চালু ছিল তাঁতশিল্পের কয়েকটি কেন্দ্র। এলাকা মধ্যে নবাসন মৌজার তাঁতশিল্পীদের সুনাম ছিল মিহিসুতোর কাপড় বোনার জন্য। বছর কুড়ি পূর্বেও অর্থাৎ আশীর দশকের সূচনার সময়েও দেখা যাচ্ছে মাজু, পাঁতিহাল, চাঁদুল, বাঁকুল প্রভৃতি মৌজায় অল্প কিছু তাঁত চালু ছিল। কিন্তু মোটা কাপড়, শাড়ী, গামছা ইত্যাদি বোনার কাজ সারা বছর পাওয়া যেত না—সুতরাং পরবর্তী অবস্থা অনুমেয়।

বাঁশের কাজ

ডোম কারিগরদের দ্বারা বাঁশের ঝোড়া-ঝুড়ি, চুবড়ি, কুলো, ধুচুনি, মাছ ধরার ঘুনি ইত্যাদি তৈরী হয় নিজবালিয়া, প্রতাপপুর, জগৎবল্লভপুর (দখিন পাড়া), শিয়ালডাঙ্গা, শঙ্করহাটি, ভূপতিপুর, নলদা, পোলগুস্তিয়া, পাঁতিহাল, ইসলামপুর প্রভৃতি মৌজায়। কুলো, চুবড়ি, চালান যাচ্ছে হাওড়া, কলকাতা শহরেও। তবু অধিকাংশ ডোম-কারিগর দারিদ্র্য সীমার নীচেই রয়ে গেছেন। কেবল এ কাজের দ্বারা বেঁচে-বর্তে থাকা অনেকের পক্ষেই কঠিন হয়ে পড়েছে। তারওপর আছে প্ল্যাস্টিক শিল্পের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতা।

বিড়ি তৈরী

আর একটি ছোট্ট আকারের শিল্প রয়েছে—একে কুটির শিল্প বলা চলে কিনা জানা নেই। এটি হচ্ছে বিড়ি শিল্প। জগৎবল্লভপুর থানা অঞ্চলে প্রায় এক হাজার জন বিড়ি কারিগর ছিল বছর দশ-বারো আগে, যার মধ্যে সিকিভাগই মহিলা। এক্ষেত্রে নারী-পুরুষ

ভেদাভেদ বৈষম্য ছিল মজুরীতে। যেখানে পুরুষ কারিগর হাজার পিছু বিড়ির মজুরী পেত টাঃ ১৯.৪০ সেখানে মহিলা কারিগর পেত টাঃ ১৭.৪০, ইউনিয়নের রেটে।

নকল সোনার গহনা

অ্যালুমিনিয়ম, পিতল, তামা জাতীয় লৌহেতর ধাতু এবং পুঁতি ইত্যাদি দিয়ে তৈরী হচ্ছে নকল সোনার গহনা, যা বাজারে ইমিটেশন গহনা নামে চালু আছে। যমুনাবালিয়া, নিজবালিয়া, গড়বালিয়া সহ বেশ কয়েকটি গ্রামের নারী-পুরুষ এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। সহস্র রকম ডিজাইনের ও সাইজের চুড়ি, বালা, কানের দুল, হার তৈরী হয়ে চালান যাচ্ছে কলকাতার বিভিন্ন পটিতে। তবে কলকাতার বাইরে যে সর্বভারতীয় বিশাল বাজার রয়েছে, সেখানে প্রবেশ করার মত মূলধন, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি এখানে কিছুই নেই। তবুও বহু পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন নিশ্চিত করেছে শিল্পটি।

লৌহ দ্রব্যাদি

লৌহ শিল্পরূপে বহুল প্রচলিত হচ্ছে বিভিন্ন প্রকারের কাঁচি তৈয়ারী। এছাড়া, কাটারি, কাস্তে, বঁটি ইত্যাদি অল্পবিস্তর তৈরী হয়ে থাকে। কাঁচি তৈরীর প্রধান আড়ত হচ্ছে নিমাবালিয়া, নস্করপুর প্রভৃতি এলাকা।

নানাপ্রকার ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্যাদিও তৈরী হচ্ছে কুটিরশিল্পের ভিত্তিতে। হাঁটাল, সাদতপুর, মানসিংহপুর, বড়গাছিয়া হচ্ছে এ শিল্পের কেন্দ্রভূমি।

কাঠের ও লোহার আসবাবপত্রাদি

পরিবেশ দূষণ ও বৃক্ষরোপণ নিয়ে হাজার চেঁচামেচি সত্ত্বেও বৃক্ষনিধন যেভাবে চলছে, তাতে পঞ্চাশ বর্গমাইল এলাকা মধ্যে প্রাচীন বৃক্ষের চিহ্নমাত্র থাকবে না অল্পকালের মধ্যেই। তবুও কাঠের আসবাব তৈরীতে মন্দা আসবে বলে মনে হয় না। বড়গাছিয়া, মুন্সিরহাট, মাজু, প্রতাপপুর, পাঁতিহাল, নিজবালিয়া, নস্করপুর কোথায় নেই কাঠের আসবাব তৈরীর দোকান! এলাকার সব গ্রামেই রয়েছে।

লোহার আলমারি, চেয়ার তৈরীর কারখানা রয়েছে পোলগুস্তিয়া অঞ্চলে।

পাটের তৈরী নকল চুল

হিন্দু দেবদেবীর মূর্তির জন্য প্রয়োজনীয় পাটের তৈরী নকল চুল তৈরী করেন মুসলমান নারী-পুরুষের দল। এঁদের একটি বড় আস্তানা আছে বড়গাছিয়া ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন পার্বতীপুর মৌজায়। বসত বাটীর বহির্ভাগে প্রতিমার চুল তৈরীর কারখানা। পাটের চুল তৈরীর পদ্ধতিটি হলো ঃ প্রথমে পাটকে তরলীকৃত কালো রঙে ডুবিয়ে রাখা হয়, এরপর ঐ কালো রঙে চোবানো পাটকে শুকনো করা হয় রোদে মেলে দিয়ে। শুকিয়ে গেলে সরু চিরুনি দিয়ে ভাল করে আঁচড়ানো হয়। এইভাবে

পাটের ফেঁসো বাদ দিয়ে লম্বা, জটহীন, মসৃণ ও চক্‌চকে করে তোলা হয় কালো রঙের পাটের গুছিকে। তারপর মৃৎশিল্পীর দেওয়া মাপ মত ঐ কালো পাটগুছিকে কেটে নেওয়া হয় এবং যত্ন সহকারে কাঠিতে জড়িয়ে রাখা হয়। এরপর তা চালান যায় কলকাতার কুমোরটুলি সহ বিভিন্ন জেলার গ্রাম-গঞ্জে, এমনকি বিহার, অসম প্রদেশেও।

মাপ অনুযায়ী পাট কাটা, রঙ করা, আঁচড়ানো, সাজানো-গোটানো কাজের জন্য আলাদা আলাদা কারিগর।

পার্বতীপুর মৌজার মল্লিকপাড়ায় প্রায় পঞ্চাশটি পাটের চুল তৈরীর "কারখানা"য় আছে নারী-পুরুষ কারিগর। দক্ষ কারিগরের মজুরী গড়ে দৈনিক চল্লিশ টাকা পর্যন্ত।

লোকশিল্প

লোকশিল্প হচ্ছে, লোকসাধারণের শিল্পীমনের, শিল্পচেতনা তথা সৌন্দর্যকলা-জ্ঞানের অভিজ্ঞান ; স্বভাব-শিল্পীর শিল্প পটুত্বের ঐতিহ্যানুসারী বস্তুগত নিদর্শন ; যার নির্মাণ শৈলীর সূচনাকাল অজ্ঞাত হলেও সুপ্রাচীনকাল থেকে বিশেষ জাতি-গোষ্ঠীর দ্বারা বংশানুক্রমিকভাবে অনুসৃত হয়ে আসছে।

ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্পের মধ্যে আলোচ্য এলাকায় প্রচলিত আছে ঃ শোলাশিল্প, চালচিত্র, বৃষকাষ্ঠ, এবং মাটির মূর্তি নির্মাণ (প্রতিমা ও পুতুল)।

শোলা

"শোলা" নামীয় একপ্রকার জলজ উদ্ভিদকে শুকিয়ে নিয়ে খুব ধারালো ছুরির সাহায্যে বহিরাবরণ 'ছাল' অংশটি বাদ দেয়ার পর যে সাদা অথচ নরম অংশটি পাওয়া যায় তা দিয়েই শোলাশিল্পীরা বহুবিধ শিল্পকর্ম সৃষ্টি করে থাকেন।

আলোচ্য এলাকায় শোলাশিল্পের সাথে বংশানুক্রমিকভাবে জড়িত আছেন "মালাকার" সম্প্রদায়। মালাকার সম্প্রদায়ের প্রাচীন বসতি আছে মৌজা রামেশ্বরপুর, নিজবালিয়া ও শিয়ালডাঙ্গা অঞ্চলে। এঁদের পদবী দে, দাস, দত্ত, মালিক ইত্যাদি।

রামেশ্বরপুর মৌজায় বসবাসকারী সুপরিচিত শোলাশিল্পী হলেন পিনাকপাণি দাস, পশুপতি দে, সুরেন দে, সুদর্শন দত্ত, মদন দত্ত, গোপাল দত্ত প্রমুখ। শিয়ালডাঙ্গা (ব্রহ্মাতলা এলাকা)-তে আছেন বটকৃষ্ট দত্ত। নিজবালিয়ায় আছেন নিমাই দে, গ্যাঁদা মালিক।

পিনাকপাণিবাবু ১৯৮৪-৮৫ খ্রিঃ-তে পঃ বঃ ক্ষুদ্র কুটির শিল্প অধিকার কর্তৃক পুরস্কৃত ও শংসিত শিল্পী। উৎকৃষ্ট মানের শোলা আমদানী হয় বনগাঁ অঞ্চল থেকে। বিধাননগর বা উল্টোডাঙ্গা মেন রোডের কাছে শোলা বিকিকিনির হাট আছে—ঐখান থেকে আনা-নেওয়ার খরচ আছে। স্থানীয়ভাবে উচ্চমানের শোলা প্রায় অমিল—পার্শ্ববর্তী ডোমজুড় আমতা প্রভৃতি থানা-এলাকায় শোলা মিললেও তা অত্যুৎকৃষ্ট নয়। তাছাড়া শোলা সংগ্রহের সেরা সময় বর্ষাকাল—কাঁচা শোলার চাহিদা বাড়লে দাম বাড়ে, ফলে তৈরী

জিনিসের পড়তা বাড়ে। তাহলেও বিবাহ, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড সহ নানাবিধ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে শোলার টোপর, সিঁথিমৌর, কদমফুল, মালা, চাঁদমালার প্রয়োজনীয়তা যেহেতু অনস্বীকার্য, সেহেতু 'মালাকার' সম্প্রদায়ের অনেকেই তাঁদের জাতিগত বৃত্তি অনুসরণ করে চলেছেন। একটা সময়ে অর্থাৎ আজ থেকে বছর ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ পূর্বেও 'রাসযাত্রা'-র সময়ে শোলার টিয়াপাখি, কাকাতুয়া, ফুলের ঝাড় ইত্যাদি তৈরী হত, 'রাসমঞ্চ' সাজানোর উপকরণ হিসাবে।

সাম্প্রতিককালে 'শোলা'-র প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে 'থার্মোকল'। থার্মোকল দিয়ে তৈরী হচ্ছে গৃহসজ্জার নানাবিধ উপকরণ। রামেশ্বরপুরের পিনাকপাণি দাস ও তাঁর ভাই-এর বাড়ীতে এ ধরণের বহু নিদর্শন দেখতে পাওয়া যাবে।

শোলাশিল্পীরা সারা বছরই কর্মব্যস্ত থাকেন—ব্যতিক্রম মাঘী নবমী তিথি। মাঘী নবমী তিথিতে মালাকার সম্প্রদায় মাহেশ্বরী পূজা উপলক্ষ্যে কর্মবিরতি ঘটান। শ্বেতশুভ্রা, বৃষবাহনা দেবী মাহেশ্বরীর কৃপাধন্য মালাকার সম্প্রদায়।

বৃষকাষ্ঠ

বৃষকাষ্ঠ. চলতি ভাষায় 'বেযো কাঠ'-এর একমাত্র কারিগর হচ্ছেন গড়বালিয়া নিবাসী যুগলচন্দ্র দাস। জাতিতে সূত্রধর। বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ ব্যতিরেক 'বৃষকাষ্ঠ'-এর কোন চাহিদা নেই। তাই শিল্পীও নেই বিশেষ। যুগলবাবুর বর্তমান বয়স ৮০+। পিতা, পিতামহের বৃত্তি ইনি ধরে রেখেছেন সফলভাবেই। এনার দাদা কিশোরীবাবুও ছিলেন বৃষকাষ্ঠ নির্মাণের দক্ষ শিল্পী। আমার বাল্যকালে অর্থাৎ ১৯৫০ খ্রিঃ-র আশেপাশের সময়ে স্থানীয় নিজবালিয়া সিংহবাহিনী মন্দিরের অদূরে এক পুকুর পাড়ে কমপক্ষে ছটি, বুড়ি পুকুর শ্মশানে ৫-৬টি বৃষকাষ্ঠের নিদর্শন দেখতে পেতাম। বর্তমানে ঐগুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এখন একটি পুরাতন বৃষকাষ্ঠ রয়েছে নরেন্দ্রপুরে (জিওলজিক্যাল সার্ভের প্রাক্তন কর্মী বিভূতি মল্লিক মহাশয়ের বাটীর পাশে) আর অপরটি রয়েছে রামপুর শিবতলায়—লক্ষ্মণ চক্রবর্তীর মাতৃশ্রাদ্ধের নিদর্শন স্বরূপ। বলা বাহুল্য, নরেন্দ্রপুরেরটির নির্মাতা ছিলেন কিশোরীমোহন দাস আর শেযোক্তটি নির্মাণ করেছেন যুগলচন্দ্র দাস। এছাড়াও কয়েকটি আছে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে।

যুগলবাবু-র একটি সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে জানা গেল—নিম কিম্বা বেলকাঠ হতে হবে পুরাতন ও সারবান। অসার অংশ বাদ দিয়ে তৈরী করতে হবে, তবেই খোলা আকাশের নীচে রোদ-জল-ঝড়-বৃষ্টি সহ্য করে অনেককাল টিকে থাকবে বৃষকাষ্ঠটি।

যুগলবাবুর মতে, বৃষকাষ্ঠ খোদাই ও অলঙ্করণ নির্ভর করে দুটি জিনিসের ওপর। প্রথমতঃ ছ'ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট ও ছয় ইঞ্চি বর্গাকৃতি পাকা কাঠের বীম এবং খোদাই শিল্পী বা নির্মাতার মজুরী। নকাশী কাজের হেরফেরে মজুরী বাড়ে-কমে। কাঠের সঙ্গে কোন আপোষ নেই।

ছ'ফুট উচ্চতার মধ্যে নীচের দিকের দেড় ফুট থাকে মাটির ভিতরে। তারপর

খোদাই করা হয় মৃতের মূর্তির আদল। মৃত ব্যক্তি ব্রাহ্মণ পুরুষ হলে নগ্ন গাত্র (আদুড় গা) গলায় উপবীত, কাঁধে নামাবলী চাদর। অব্রাহ্মণ পুরুষের ক্ষেত্রে উপবীত থাকে না। উভয়ক্ষেত্রে ডানহাতে থাকে জপমালা। সধবা নারী হলে পরণে লালপাড় শাড়ী, মাথায় সিঁদুর, পায়ে আলতা, ডানহাতে কমণ্ডলু অথবা জপমালা, গলায় কণ্ঠিমালা। বিধবা হলে পরণে সাদা থান, গলায় কণ্ঠিমালা, ডানহাতে জপমালা, বামহাতে কমণ্ডলু। মূর্তির আদল খোদাই করার পর ভালোজাতের তেলরঙ ব্যবহার করে এসব সাজসজ্জা ফুটিয়ে তুলতে হয়।

মূর্তি খোদাই হলে পর পর উপরিভাগে খোদাই করা হয় তুলসীমঞ্চ, বৃষমূর্তি, শিবলিঙ্গ, জোড়া মন্দির, রাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্তি, দুর্গামূর্তি, তালপাতার পাখা ও খড়খড়ি জানালার নকশা, পীঢ়া দেউল ইত্যাদি।

বৃষ ও শিবলিঙ্গ এবং দেউল খোদাই করা হয় "স্কাল্পচার-ইন-দ্য-রাউণ্ড" এবং অপরাপর মূর্তি-আদি নতোন্নত পদ্ধতিতে। সবচেয়ে উপরে থাকে লোহার ত্রিশূল। একটা বৃষকাষ্ঠ তৈরী করতে অন্ততঃ পনের দিন সময় লাগেই। খোদাই-এর সময় শিল্পীকে শুদ্ধাচারে থাকতে হয়।

মাটির প্রতিমা ও পুতুল

লোকশিল্পের এই বিশিষ্ট ধারাটি বহু বছর ধরে টিকে রয়েছে গড়বালিয়ার সূত্রধর গোষ্ঠীর দ্বারা। এই সূত্রধর গোষ্ঠীর মধ্যে প্রবীণতম হলেন যুগলচন্দ্র দাস। যুগলবাবুর পুত্রেরাও প্রতিমা নির্মাণ শিল্পের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছেন।

যুগলবাবুর কাছে রয়েছে বহু পুরাতন ছাঁচ, যার সাহায্যে দেবদেবীর মুখমণ্ডল তৈরী হয়। এছাড়া রথ, চৈত্র সংক্রান্তির মেলায় বিক্রির জন্য কাঁচা মাটির, রঙ লাগানো পুতুল ইত্যাদিও তৈরী করেন এঁরা। দু'তিন ধরণের পাখি, নাড়ুগোপাল, রাধাকৃষ্ণ জাতীয় পুতুল তৈরী হয় স্রেফ আঙ্গুলের দক্ষতাগুণে। বর্তমানে ভিন্ন জাতির প্রতিমাশিল্পীরাও কর্মরত।

আলোচ্য জনপদের কুম্ভকার সম্প্রদায়ের বৌ-মেয়েরা অবসর সময়ে তৈরী করে থাকে ছোট ছোট মা-পুতুল, মেয়ে-পুতুল—যেগুলিকে বলা চলে এজলেস টাইপের পুতুল।

বর্তমানে প্রতিমাশিল্পে রুইদাস, নমঃশূদ্র, গোপ-গোয়ালা এবং পূর্ববঙ্গাগত অপরাপর জাতি-গোষ্ঠীর শিল্পীরাও নিযুক্ত রয়েছেন। এঁদের তৈরী প্রতিমার চাহিদাও রয়েছে সারা বছরই।

সাহিত্য-নিদর্শন

সাহিত্য নিঃসন্দেহে ব্যক্তিমনের চিন্তার ও অনুভূতির ফসল। তথাপি, সাহিত্য একদিকে সমকালের সমাজ-দর্পণ আর অপরদিকে কালের ইতিহাস। ব্যক্তির প্রচেষ্টার ফল ফসলে তাই কালে কালে সমাজেরও অধিকার বর্তায়। সেজন্য বলা চলে, "সাহিত্য সমাজনদীর প্রশান্ত সলিল / জীবনের সূক্ষ্মাতীত বাস্তব দলিল।"

বালিয়া পরগণা, আকবরের শাসনকালের পূর্বে ভুরশুট রাজের অধীন ছিল। মধ্যযুগের শেষভাগে ভুরশুট-বালিয়া-মান্দারণ পরগণা হয়ে ওঠে বহু প্রখ্যাত কবির লীলাভূমি। এঁদের মধ্যে সুবিখ্যাত কবি ভারতচন্দ্র অত্যন্ত সচেতনভাবে হিন্দু জনসমাজকে তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে তাঁর অন্নদামঙ্গল কাব্যে যাবনী-মিশাল ভাষা ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তাঁর পাশাপাশি অনেকানেক মুসলমান কবিও তাঁদের কাব্যে আরবী-ফারসী-উর্দ্দু-হিন্দুস্তানী মিশ্রিত বাংলা ভাষা ব্যবহার করেছেন। এই সকল কবিদের মধ্যে ভগীরথ-তুল্য হলেন বালিয়া পরগণার কবি শাহ গরীবুল্লাহ। এঁর কাব্যভাষা মিশ্রিত বাংলা কিন্তু অক্ষর বিন্যাস ফারসী। এঁর কাব্য হিন্দু-মুসলিম উভয়েই উপভোগ করেছেন।

কবি শাহ গরীবুল্লাহ

কবি শাহ গরীবুল্লাহর জন্ম তৎকালীন বালিয়া পরগণার (অধুনা জগৎবল্লভপুর থানাধীন পাঁতিহাল গ্রাম পঞ্চায়েতভুক্ত) হাফেজপুর মৌজায়। কবির পিতার নাম—শাহ সৈয়দ আজমোতুল্লাহ ওরফে শাহ দুন্দি কোরেশী ওরফে ফুলওয়ারী শাহ। সৈয়দ আজমোহতুল্লাহ-র আদি নিবাস বাগদাদ। ইনি ছিলেন উচ্চস্তরের সুফী সাধক। এঁর নামাঙ্কিত মাজার আজও রয়েছে হাফেজপুর গ্রামে।

কবি শাহ গরীবুল্লাহ ছিলেন তাঁর পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র। কবির বংশধরদের মতে, কবির জন্ম তারিখ ২৩শে ভাদ্র, প্রয়াণ তারিখ ১১ কার্তিক। হাফেজপুরের পার্শ্ববর্তী নাইকুলি গ্রামে (বর্তমানে জগৎবল্লভপুর-১নং গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের পূর্ব-দক্ষিণ দিক বরাবরে) অবস্থিত কবির নামাঙ্কিত মাজারে ১১ই কার্তিক ইসালে সওয়াব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে প্রতি বছর

কবির [illegible] সন নিয়ে অবশ্য গবেষকদের মধ্যে প্রচুর মতভেদ রয়েছে, কারণ কাব্যমধ্যে কবির আত্মপরিচয় বিশেষ স্পষ্ট নয়। কবির বংশধরদের মতে, আবির্ভাব ও তিরোভাবকাল যথাক্রমে খ্রিঃ ১৬৭০ ও খ্রিঃ ১৭৭০। কিন্তু ডঃ গোলাম সাকলায়েন মনে করেন, জন্ম আনুঃ ১৬৯০-৯৫ খ্রিঃ মধ্যে এবং মৃত্যু আনুঃ ১৭৭০-৭৫ খ্রিঃ মধ্যে। পক্ষান্তরে, কবির জীবৎকাল খ্রিঃ ১৭৮০ পর্যন্ত বলে অনুমান করেছেন ডঃ আহমদ শরীফ। কবির একটি বংশলতিকা, বংশধরদের নিকট প্রাপ্ত কুর্শিনামার ভিত্তিতে হাফেজপুর নিবাসী মহম্মদ সাদিক প্রস্তুত করলেও দেশ-বিদেশের গবেষকদের কাছে তার যাথার্থ্য বিচারে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ দেখা দিয়েছে। তবুও বলা চলে, কবির রচিত পাঁচখানি কাব্যমধ্যে জন্মস্থান, পিতার নাম ও কর্মজীবনের পরিচয় আভাসিত। সর্বোপরি কবির শিষ্য ভুরশুট

পরগণা নিবাসী কবি সৈয়দ হামজা রচিত 'আমীর হামজা' (২য় খণ্ড) কাব্যগ্রন্থে কবি শাহ গরীবুল্লাহ সম্পর্কিত কিছু মূল্যবান তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। যথা—"আল্লার মকুবল শাহা গরীবুল্লাহ নাম। / বালিয়া হাফেজপুর যাহার মোকাম।। (আমীর হামজা—২য় খণ্ড)।

অধ্যাপক সুকুমার সেনের মতে, ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে আমীর হামজা কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ড লিখেছিলেন সৈয়দ হামজা। সুতরাং ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দের নিশ্চয়ই বেশ কিছুকাল পূর্বে গরীবুল্লাহর কাব্যটি লেখা হয়েছিল এবং তখনও এদেশে ইংরাজ-শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি।

কবি নিজে 'দেওয়ান' 'গরীব' 'ফকির' ইত্যাদি ভনিতা ব্যবহার করেছেন। কবির শিষ্য সৈয়দ হামজার কাব্যেও নিদর্শন রয়েছে। যথা—

"তামাম কেতাব যদি পাইতেন দেওয়ান।
গাঁথিত কবিতার হার মুক্তার সমান।।"

কাব্যভাষা

শাহ গরীবুল্লাহ-র কাব্যধারা অনুসরণ করে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে শতাধিক মুসলমান কবির রচিত সহস্রাধিক কাব্যের নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে বর্তমানকালের হাওড়া-হুগলী থেকে ঢাকা, চট্টগ্রাম পর্যন্ত সুবিস্তীর্ণ এলাকায়। এই ধরণের কাব্যগুলিকে গবেষকবৃন্দ নানান নামে অভিহিত করে থাকেন। যথা—মুসলমানী বাঙলা সাহিত্য [জেমস লঙ], মুসলমানী বেঙ্গলী [উইলিয়ম হাণ্টার], ইসলামি বাংলা সাহিত্য [সুকুমার সেন], দোভাষী পুঁথি [ডঃ আবদুল হাই, সৈয়দ আলী আহসান, ডঃ আহমদ শরীফ], ইসলামী বাঙলা পুঁথি সাহিত্য [আবদুল হাকিম], মিশ্রভাষারীতির কাব্য [ডঃ আনিসুজ্জামান]। "দোভাষী পুঁথি সাহিত্যের সৃষ্টি অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরু থেকেই অর্থাৎ নবাবী আমলেই। যদিও এর পরিপুষ্টি ইংরেজ আমলে (১৭৫৭-১৯০৭ খ্রিঃ)। পশ্চিমবঙ্গের যেসব এলাকায় বাংলা ভাষার ওপর আরবী-ফারসী, উর্দু-হিন্দি শব্দের ব্যাপক মিশ্রণ ঘটে মুখ্যতঃ সেখানেই দোভাষী পুঁথি সাহিত্যের চর্চা ও বিকাশ ত্বরান্বিত হয়।" [মুহম্মদ আবদুল জলিল ঃ শাহ গরীবুল্লাহ ও জঙ্গনামা। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। জানুয়ারী '৯১। পৃঃ ১০-১১]

কাব্য পরিচয়

নিম্নোক্ত পাঁচখানি কাব্যগ্রন্থকে, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এবং ডঃ আহমদ শরীফ, ডঃ গোলাম সাকলায়েন, সৈয়দ আলী আহসান প্রমুখ গবেষকগণ, কবি শাহ গরীবুল্লাহের রচনা বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন,—(১) ইউসুফ জোলায়খা, (২) জঙ্গনামা (৩) সোনাভান, (৪) সত্যপীরের পুঁথি এবং (৫) আমীর হামজা (১ম খণ্ড) [চিত্র : ৬]।

বলা বাহুল্য, ইউসুফ জোলায়খা, সোনাভান, জঙ্গনামা প্রভৃতি কাব্য বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যরূপে গৃহীত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে।

কবির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য হলো "ইউসুফ জোলায়খা"। এটি একটি রোমান্টিক প্রণয় কাব্য-উপাখ্যান।

অধ্যাপক সুকুমার সেনের ধারণা অনুযায়ী গরীবুল্লাহর লেখা দুখানি কাব্য পাওয়া গেছে (ক) আমীর হামজার জঙ্গনামা এবং (খ) ইউসুফ-জেলেখা। দুটি কাব্য কাহিনীরই বক্তা দরিয়া-পীর বদর এবং শ্রোতা বড়-খাঁ গাজী (= সুফী খাঁ বা ইসমাইল গাজী)।

গরীবুল্লাহ-র কাব্যে পীর বদর কর্তৃক শ্রোতা বড়-খাঁ গাজীকে ইউসুফ-জেলেখার কাহিনী শোনানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁকে ফকীরি পন্থা গ্রহণ করানো। এক্ষেত্রে গাজীর সাগ্রহ উত্তর ছিল ঃ "ইউসুফ নবীর কথা কহ দস্তগীর। / শুনিলে আল্লার রাহে হইব ফকীর।" অপরপক্ষে বড়-খাঁ গাজীর সানুগ্রহে গরীবুল্লাহ কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তার প্রমাণ এই উক্তিটি—"গরীব ফকীর কহে কেতাবের বাত, / বড়খাঁ বাতুনে যারে দিল মোলাকাৎ"।।

কবির অপর উল্লেখযোগ্য কাব্য হচ্ছে "জঙ্গনামা"। কবির রচিত কাব্যগুলির মধ্যে এটি সর্ববৃহৎ। "জঙ্গনামা" দুটি পৃথক ফার্সী শব্দ। জঙ্গ অর্থে যুদ্ধ এবং নামা অর্থে বিবরণ। বাঙ্গালী মুসলমানগণের নিকট জঙ্গনামা-র বিষয়বস্তু হচ্ছে কারবালা মরু-প্রান্তরে সংঘটিত যুদ্ধের হৃদয়স্পর্শী বিবরণ। শাহ গরীবুল্লাহ-র "জঙ্গনামা"-র পর আরও জনাকয় শক্তিশালী কবি 'জঙ্গনামা' কাব্য লিখে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

কবি শাহ গরীবুল্লাহ রচিত জঙ্গনামা-র বিষয়বস্তু হচ্ছে, ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদের দৌহিত্র হোসেনের সঙ্গে উমাইয়া বংশের দ্বিতীয় খলিফা এজিদের সৈন্যবাহিনীর কারবালা মরুপ্রান্তরে ৬৮৩ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হৃদয়বিদারক যুদ্ধের কাহিনী এবং কারবালা প্রান্তরে বীরগতিপ্রাপ্ত শহীদদের স্মৃতি-আলেখ্য। জঙ্গনামা-র উৎস হচ্ছে ফারসী ভাষায় লিখিত উপাদান। এ সম্পর্কে কবি নিজেই বলেছেন ঃ

"ফারসী কেতাব ছিল মোক্তাল হোসেন।
তাহা দেখি কবিতায় করিনু রচন।।"

কবির আরেকটি কাব্য হল 'সোনাভান'। এ কাব্যেরও উৎস হচ্ছে আরবী-ফারসী ভাষায় রচিত গ্রন্থাদি। গ্রন্থটির রচনাকাল ১১২৭ সাল = ১৭২০ খ্রিঃ।

'সোনাভান' কাব্যের বিষয়বস্তু হচ্ছে ঃ টুঙ্গির শহরের রানী, অসামান্যা রূপসী এবং বীরবালা সোনাভান-এর সঙ্গে হাসান-হোসেনের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হানিফার যুদ্ধ, সোনাভান-এর হাতে হানিফার চরম লাঞ্ছনা, পরিশেষে আল্লাহ-র 'দোআ'-তে হানিফার জয়লাভ, হানিফা-সোনাভানের বিবাহ, সোনাভান-এর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ এবং উভয়ের মদিনায় গমন। সোনাভান-এর বীরত্ব কাব্যমধ্যে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তাতে তাকে অনায়াসে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয়া বীরাঙ্গনারূপে চিহ্নিত করা চলে।

সোনাভান কাব্যের সূচনাতে আছে—
"আল্লা আল্লা বল ভাই নবি কর সার।
নবির কলেমা পড়ি হইয়া জাবে পার।।

আল্লা আল্লা বল ভাই জত মমিন গণ।
মোহাম্মদ হানিফার কিছু শোন বিবরণ।।
জতেক পাইল দুক্ষ হানিফা পাহালাওান।
সে সব দুক্ষের কথা করিব বত্রয়ান।।
বার জঙ্গ করে মর্দ্দ কেতাবে খবর।
তের জঙ্গ করে মর্দ্দ টুঙ্গির সহর।।
সোনাভান নামে বিবি বাদশা সে শহরে।
কুয়তের হদ্দ আল্লা এ দিয়াছে তাহারে।।

... ...

সোনাভান বলে আমি জাব মদিনাএ,
হানিফা কেমন মর্দ্দ দেখিব তাহা এ।।

... ...

এরপর বীরবালা সোনাভানের শক্তির পরিচয় ও যুদ্ধযাত্রা প্রসঙ্গে কবির বর্ণনা-

'আশি মোন লোহার গুর্জ তুলি লইল হাতে।
আছিল লোহার জেরা পোরিল গাএতে।।
সিঙ্গার করিয়া বিবি বামে বান্ধে খোফা।
তারপরে তুলিয়া দিল গন্ধরাজ চাঁপা।।
আছিল লোহার টোপ তুলি দিল শিরে।
নেজা গুর্জ তলোয়ার ঢাল পিঠ পরে।।
রাহাতে চলিল দন্ত করে করমর।
এমন জোরেতে চলে জেন চলে বহে ঝর।।
গাছপালা হাতি ঘোড়া জামিনে সমুক্ষি।
উখরিয়া ডালে মর্দ্দ ধন্ধ লাগে দিক্ষি।।
ছোয়ার হইয়া বিবি ঘোড়ার উপরে।
মএদানে চলিল বিবি হানিফার হুজুরে।।
হানিফার কাছে হাক মারে সোনাভান।
হুসিয়ার হইল মর্দ্দ হানিফ পালয়ান।।

... ...

সোনাভান বলে নেরে এত তকব্বরি।
আসিয়া আমার লোভে কর বরাজুরি।।
চাকরের সমান নহে হইতে চাহে স্বামি।
একিনে বুঝিব আজি তোমার মর্দ্দামি।।
বকের সমান তুমি ফির ডালে ডালে।
আসিয়া ঠকিলে আজি বাঘের জঙ্গলে।।

এরপরে সোনাভান-হানিফার যুদ্ধ বর্ণনাও কবি প্রাণবন্ত করে তুলেছেন—

তেজধার ছুরি বিবি নেকালিয়া লইল।।
কি কইব ছুরির কথা জেন হিরার ধার।
হানিফা দেখিয়া ছুরি কান্দে জার জার।।
হানিফারে সোনাভান বগলে দাবিয়া।
বরা এক মএদানেতে পৌঁছিল জাইয়া।।
পটকান মারিয়া তারে ফেলে জমি পরে।
বসিল জাইয়া তার ছাতির উপরে।।
এমন জোরেতে বইসে মনে লাগে ব্যথা।
কাতর হইয়া মর্দ কএ এই কথা।।
একবার ওঠ বিবি এ দুনিয়া দেখি।
এ জনমের মত আমি আল্লা বলে ডাকি।।

শেষপর্যন্ত আল্লার দোয়া লাভ করে হানিফা সোনাভানকে পরাজিত করে এবং কলেমা পড়িয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে। তারপর—

সোনাভান লই সবে করিল গমন।
মদিনা সহরে গিয়া দিল দরশন।।
আল্লা আল্লা বল সবে জত মুমিনগণ।
তামাম হইল পুঁথি শোন সর্বজন।।

•

সত্যপীরের পুঁথি বা মদন কামদেব পালা

সত্যপীরের পাঁচালি পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা সহ অনেকানেক প্রদেশে প্রচলিত রয়েছে। এ কাহিনীর মূল সুর হচ্ছে ধর্ম সমন্বয়। আঠারো শতকের কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য 'সত্যপীর' নামের ব্যাখ্যা দিয়েছেন ঃ সত্যপীর নামের তাৎপর্য শুন আগে।

মিথ্যার বিনাশ হেতু সত্য পুরভাগে।।

কবি শাহ গরীবুল্লাহ রচিত সত্যপীর কেন্দ্রিক কাব্যটির নাম সত্যপীরের পুঁথি বা মদন কামদেবের পালা। কাহিনী হচ্ছে ঃ হুগলী জেলার চন্দননগর নিবাসী বেণে জয়ধর সওদাগরের পুত্র সুন্দরের সকরুণ ঘটনা, পরিশেষে সত্যপীরের কৃপায় যন্ত্রণামোচন। বলা বাহুল্য, সত্যপীর ও সত্যনারায়ণ কাব্যমধ্যে অভিন্ন সত্তারূপে প্রতিভাত। কাব্যমধ্যে শেষতক—

"সিরনি বাটিয়া দিল হিন্দু ব্রাহ্মণে।
পাইয়া সিরণি ঘরে গেল জনে জনে।।

এইভাবে একদিকে হিন্দু-ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সম্প্রীতি গড়ে তোলার চেষ্টাও যেমন দেখা যায়, অপরদিকে যেহেতু কবি গরীবুল্লাহ নিজে একজন সুফী সাধক বা

আউলিয়া সেহেতু সর্বদাই ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চেষ্টা করেছেন বা জয়গান গেয়েছেন। এর প্রমাণ সোনাভানের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ। যাহোক, শাহ কবি কিন্তু কোথাও উগ্র সাম্প্রদায়িক মনোভাব পোষণ করেননি, ফলে হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মের শ্রোতার কাছে তাঁর কাব্যের আবেদন সুপরিচিত ছিল। তার প্রমাণ পাই, ইউসুফ-জেলেখার গীত-কাব্যে। কবি গরীবুল্লাহ অন্যান্য প্রাচীন কবিদের মত কাব্যের শেষভাগে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জন্যই আল্লাহ বা ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছেন। যেমন--

গরীব ফকীর কহে সব এয়াদ্‌গারে।
সের সালামৎ আল্লা রাখ সবাকারে।।
এখানে রহিল গীত পালা হৈল সায়।
আল্লা আল্লা বল ভাই দিন বয়্যা যায়।।
আল্লা তালা সালামৎ রাখিবে বাদশারে।
সের সালামৎ রাখ বাদশার উজীরে।।
দোজখ আজব হৈতে জরাও করতারে।
ইমান বজায় রাখ মোমিন সবারে।।
বজায় সালামৎ রাখ বাজার দেওানে।
শিকদার তোকদার ইজারদার জনে।।
মণ্ডল কমদ্দম আর তামাম প্রজায়।
সের সালামৎ আল্লা রাখিবে সবায়।।

আসরে বসিয়া যত হিন্দু মুসলমান।
সবাকার তরে আল্লা হও নেঘাবান।।
ইউসুফ জেলেখার গীত পালা হৈল সায়।
নেহ ভাই আল্লার নাম দিন বয়্যা যায়।।
গরীব ফকীর কহে কেতাবের বাত।
নায়েকের তরে আল্লা বাড়াও হায়াৎ।।

পরিশেষে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে প্রকাশিত 'সাহিত্য' পত্রিকায় (বর্ষা-শীত সংখ্যা, ১৩৬৫) অধ্যাপক আনিসুজ্জামান কবি গরীবুল্লাহ সম্পর্কে বহু তথ্য উপস্থাপিত করে বলেছেন : গরীবুল্লাহও আমাদের ঐতিহাসিক কৌতূহলের সামগ্রী। তিনি প্রায় ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক --.....রামপ্রসাদের তিনি সমকালীন--. . .রোমাণ্টিক প্রণয়কাব্য হিসেবে তাঁর ইউসুফ-জেলেখা উল্লেখযোগ্য রচনা।

কবি গরীবুল্লাহ-র উত্তরসূরী

ভুরশুট পরগণাধীন উদনা (বা অদুনা) গ্রামনিবাসী কবি সৈয়দ হামজা ছিলেন গরীবুল্লাহ-র উত্তরসূরী। সৈয়দ হামজা, কবি গরীবুল্লাহ রচিত "আমীর হামজা" কাব্যের

দ্বিতীয় ও বৃহত্তর খণ্ডটি রচনা করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে গরীবুল্লাহ্ ও সৈয়দ হামজা রচিত "আমীর হামজার জঙ্গনামা" আকারে কাশীরাম দাসের মহাভারতের ন্যায় বিশাল কাব্য। সৈয়দ হামজাকে বহু মানুষ অনুরোধ করেছিলেন 'আমীর হামজা' কাব্যটি সম্পূর্ণ করতে। কবির বয়ানে—

"না পারিনু এড়াইতে লোকের নেহারা
এ খাতেরে কবিতার খাহেশ হৈল মেরা।"

—এরপর তিনি কাব্যগুরু গরীবুল্লাহ-র উল্লেখ করেছেন—

"পীর শাহ গরীবুল্লাহ কবিতার গুরু।
আলমে উজালা যার কবিতার শুরু।।"

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে "সুবা বাঙলা"র এক বিস্তীর্ণ অংশে গরীবুল্লাহ্ ও হামজার কাব্য ছিল সুপরিচিত।

কবি শাহ্ গরীবুল্লাহ স্মৃতি পুরস্কার

পশ্চিম বাংলায় ইসলামি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান বালিয়া-ভুরশুট-মান্দারণ এলাকার খ্যাতনামা কবি শাহ্ গরীবুল্লাহ সম্পর্কে এলাকার জনগণকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে বিগত ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা-৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে সর্বপ্রথম শাহ্ গরীবুল্লাহ্ স্মৃতি রক্ষা সমিতি, কবির স্মরণে একটি সংস্কৃতি মেলা ও প্রদর্শনী এবং ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে শাহ্ গরীবুল্লাহ্ স্মৃতি পুরস্কারের প্রচলন করেন। এই সকল ঘটনাবলীর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন ডঃ অশোক কুণ্ডু [অধ্যক্ষ, পুরাশ-কানপুর হরিদাস নন্দী মহাবিদ্যালয়], মহম্মদ সাদিক [প্রধান পরিচালক, পিপলস অ্যালবাম থিয়েটার, শিবানন্দবাটী], সৈয়দ আবদুস সুলতান, সৈয়দ জামালউদ্দিন, সৈয়দ মইনুল হক, সৈয়দ ফজলুর রহমান, সৈয়দ মাজহারুল হক, কাজী জাফর আমেদ, অধ্যাপক সনৎ ঘোষ, সর্বশ্রী বিভূতি ভূষণ মল্লিক, কাশীনাথ আদক, বিবেকানন্দ পাল, মুরারী নন্দী, গোপীকান্ত মেথুর সহ অনেকানেক বিশিষ্ট উৎসাহী।

ঐ সংস্কৃতি মেলা উপলক্ষ্যে প্রকাশিত 'শাহ্ সংবাদ' শীর্ষক পুস্তিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে মহম্মদ সাদিকের বক্তব্য ছিল—"কবি শাহ গরীবুল্লাহ স্মৃতিরক্ষা সমিতির উদ্‌যোগে মেলা, প্রদর্শনী প্রভৃতির এই যে আয়োজন এর সামাজিক তাৎপর্য হল অতীতের সাথে বর্তমানের মেলবন্ধন ঘটানো। অতীতের পৃষ্ঠা খুলে দেখা গেল আমরা এক গৌরবময় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী, আমাদের একটি চমৎকার অতীত ছিল। বালিয়া-ভুরশুট-মান্দারণের এই ভূমি, রাঢ় বঙ্গের এই মাটি—এই প্রিয় মাটিকে আজ আর অনুর্বর বলে মনে হচ্ছে না। এই মূল্যবান অনুভব এই মুহূর্তে আমাদের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি।"

এ যাবৎ কবি শাহ্ গরীবুল্লাহ্ স্মৃতি পুরস্কার প্রাপকগণ হলেন—

১৯৯০ খ্রিঃ — শ্রী কালীপদ ঘোষাল। নিবাস গোবিন্দপুর, হাওড়া। মহান শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাক্ষাৎ শিষ্য।

১৯৯১ খ্রিঃ — অধ্যাপক মুহম্মদ আবু তালিব, রাজসাহী বিশ্ববিদ্যালয়। শাহ গরীবুল্লাহ বিশেষজ্ঞ ও লোকসাহিত্যের বিশিষ্ট গবেষক।

১৯৯৪ খ্রিঃ — শ্রী তারাপদ সাঁতরা। নিবাস-নবাসন, বাগনান, হাওড়া। গ্রন্থকার ও বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতি গবেষক, পুরাতত্ত্ববিদ এবং মন্দির লিপি বিশেষজ্ঞ।

বিগত ২০।০৩।৯৪ তারিখে কবি শাহ গরীবুল্লাহ স্মৃতি পুরস্কারে সম্মানিত হবার কালে শ্রী তারাপদ সাঁতরা, কবি গরীবুল্লাহ সম্পর্কে একটি তথ্যবহুল মনোজ্ঞ ভাষণ দিয়েছিলেন। ঐ ভাষণের সারমর্ম হচ্ছে—

বাংলায় খ্রিঃ তেরো শতকের পর মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এদেশে বহু সুফী সাধকের আবির্ভাব ঘটে। সুফী সম্প্রদায় এদেশে এসে যে ধর্মমত প্রচার করেন, তাতে কালক্রমে হিন্দুধর্মের কিছু কিছু প্রভাব যুক্ত হয়ে পড়ে। ফলতঃ হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ই আউল-বাউল-পীরদের শ্রদ্ধা করতেন। এই প্রকার হিন্দু-ইসলাম সংস্কৃতি সমন্বয়ের ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়েছিল সত্যপীর সংস্কৃতির, যার ভিত্তি এক লৌকিক ধর্মবিশ্বাস। হিন্দু মুসলিম এই দুই পরস্পর বিরোধী ধর্মমতের সমন্বয় সাধিত হয়েছিল সত্যপীর-কে কেন্দ্র করেই। বাংলার সংস্কৃতি সাধনায় হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের অবদান আজ অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

কবি শাহ গরীবুল্লাহ ছিলেন সুফী ভাবাদর্শের উত্তরাধিকারী। তাঁর পিতা শাহ সৈয়দ আজমোতুল্লাহর জন্ম বাগদাদে। তিনি ছিলেন এক উচ্চস্তরের সুফী সাধক। শাহ গরীবুল্লাহব পিতা দেশভ্রমণে বেরিয়ে প্রথমে কেরমান শহরে, পরে ভারতে ফুলওয়ারী শরীফ এবং আরও পরে রাঢ় বাংলার খোসটিকরীতে আসেন। খোসটিকরীকে "শাহ সংবাদ" পুস্তিকায় বর্ধমান জেলায় অবস্থিত বলা হয়েছে। আমার ধারণা সেটি হবে বীরভূম জেলার ইলামবাজার থানাধীন খুশটিকরী বা খুশতিগিরি, মতান্তরে কুষ্টিগিরি। কারণ, সরেজমিন তদন্তে দেখা যাচ্ছে, বীরভূমের খুশটিকরীতে যে মুসলিম সাধকের দরগাটি আছে, সেই সাধকের নাম হচ্ছে সৈয়দ শাহ আবদুল্লা কিরমানী। সেই সাধকের সম্পর্কে প্রচলিত কিংবদন্তী, উনি সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে (খ্রিঃ ১৬২৭-৫৮) পারস্যদেশের কিরমান নামক স্থান থেকে ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে খুশটিকরীতে এসেছিলেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ঃ বীরভূমের খুশটিকরীর ঐ সাধক সৈয়দ শাহ আবদুল্লা কিরমানীর সঙ্গে বালিয়া পরগণার কবি শাহ গরীবুল্লাহ-র পূর্বপুরুষদের কি কোন প্রকার সম্পর্ক ছিল? কারণ, গরীবুল্লাহ-র পিতা একদা খুশটিকরীতে বসবাস করেছিলেন এবং তিনি কিরমানী বা কেরমান শহর থেকেই এসেছিলেন। অপরপক্ষে সৈয়দ শাহ আবদুল্লা, ঐ কিরমানী শহর থেকেই খুশটিকরী এসেছিলেন--কিন্তু স্মৃতিরক্ষা সমিতি প্রকাশিত 'শাহ সংবাদ' পুস্তিকায় খুশটিকরীর সাধক সৈয়দ আবদুল্লা কিরমানীর সঙ্গে বালিয়া পরগণার (মৌজা হাফেজপুর) শাহ সৈয়দ আজমোতুল্লাহ-র মধ্যে কোন যোগসূত্রের সন্ধান বা সাযুজ্য না পাওয়ায় ঐ বিষয়ে আলোকপাতের প্রয়োজন অনুভব করছি।

গ্রাম গ্রামান্তরে আজ দ্রুত পট পরিবর্তন ঘটে চলেছে। সেক্ষেত্রে পাঁচশো-হাজার বছরের ইতিহাস তো যুগের নিয়মেই পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। তাই সামান্য ছিন্ন সূত্রের উপর নির্ভর করেই সেকালের ইতিহাসটিকে আমাদের বুঝে নিতে হবে। কবি শাহ গরীবুল্লাহর পিতা হাফেজপুর গ্রামে এসেছিলেন কানা দামোদর নদীপথ দিয়ে। অথচ আজ কোথায় সে স্রোতবহা কানা দামোদর--যার বুক দিয়ে যুগ যুগ ধরে সওদাগরের দল বাণিজ্যে বেরুতেন। মধ্যযুগের কবি মুকুন্দ মিশ্র তাঁর বাশুলী মঙ্গল কাব্যে সওদাগর ধূস দত্তের বাণিজ্য যাত্রার বিবরণ দিয়েছেন। ওই বণিকটি তার বাণিজ্যের পসরা নিয়ে দামোদর নদীপথ ধরে বর্ধমান থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন। পরে জামালপুরের কাছে কানা নদী ধরে বর্ধমান ও হুগলী জেলার বহু জনপদ গ্রাম পার হয়ে এসেছিলেন হাফেজপুরের পার্শ্ববর্তী নাইকুলি গ্রামে। নাইকুলি থেকে কানা দামোদরের পথটি এসে মিশেছিল, কবির বর্ণনা অনুযায়ী, এক 'জলদুর্গে'। কবি বর্ণিত জলদুর্গটি যে কোথায় অবস্থিত ছিল, তা আজও সঠিক জানা যায়নি। তবে অনুমান, অতীতে নাইকুলি থেকে বেগুয়ার বিল হয়ে দাদখানি দহের মধ্যে দিয়ে রূপনারায়ণ নদের যোগ ছিল। বণিক ধূস দত্ত ঐ জলদুর্গ পার হয়ে রূপনারায়ণ নদ পথে মানকুর হয়ে তমলুক এবং পরে সিংহল বা দক্ষিণ পাটন পৌঁছেছিলেন। কানা নদী বা কৌশিকীর জলধারা সম্পর্কে সপ্তদশ শতকের কবি মুকুন্দ মিশ্রের বিবরণ উল্লেখনীয় এই কারণে যে, হারিয়ে যাওয়া কানা নদীর তীরে তীরে বহু প্রাচীন জনপদ ও গঞ্জ গড়ে উঠেছিল। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে তেলিহাটির কাছে বালিখাদ খননের সময় খ্রিঃ দশম-একাদশ শতকে নির্মিত কষ্টিপাথরের বহু দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল, যার দ্বারা কানা নদীর তীরবর্তী স্থানগুলির সমৃদ্ধি প্রমাণিত হয়। তাছাড়া, নদী তীরবর্তী স্থানেই যে বিশালাক্ষ্মীর অধিষ্ঠান হয়ে থাকে, নাইকুলির দেবী বিশালাক্ষ্মী তারই প্রমাণ। কানা দামোদরের জলপথ দিয়ে শাহ গরীবুল্লাহর পিতা যে হাফেজপুরে এসেছিলেন, তার সত্যতা সম্পর্কে সন্দিহান হওয়ার জন্য এবং অতীতের আলোকে বিষয়টি উপলব্ধির জন্যে কানা দামোদর বা কৌশিকীর স্রোতোবাহী জলপথটির ভূমিকা কি ছিল ঐ সময়ে, তা উল্লেখ করা প্রয়োজন।

একাধারে পীর ও অন্যদিকে কবি, শাহ গরীবুল্লাহ সমকালের পারিপার্শ্বিক প্রভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন কাব্য রচনার জন্য। তাঁর কাব্যে আরবী-ফারসী ভাষার যে প্রভাব রয়েছে, তা সেইকালে প্রচলিত রাজতন্ত্রের ভাষার প্রভাব। তাই প্রচলিত বাংলা ভাষার সঙ্গে আরবী-ফারসীর সংমিশ্রণে রচিত ওই ধরণের কাব্যসমূহ স্থানীয় মানুষজনেরও যে চিত্তহরণ করেছে, এর বড় প্রমাণ ভূরশুটের কবি ভারতচন্দ্রের কাব্যধারা। এইভাবে যে বাংলা সাহিত্যধারার বনিয়াদ সুদৃঢ় হয়ে উঠেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ভাষা হচ্ছে সমাজের জীবন দর্পণ। কালের জীবনেতিহাসের প্রতিফলন তাতে তো থাকবেই।

আরবী-ফারসী শব্দের আমদানীতে বাংলা সাহিত্যে নূতন কথাবস্তুর যে সৃষ্টি তাতে বাংলা সাহিত্য তো একদিকে পুষ্টিলাভই করেছে। সুতরাং কবি শাহ গরীবুল্লাহ-র কাব্যকৃতিকে আরবী-ফারসীর প্রয়োগের জন্য সাহিত্যধারা বিচ্যুত মুসলমানী পুঁথি সাহিত্য

বলার যৌক্তিকতা কোথায়?

দেখা যাচ্ছে, কবি গরীবুল্লাহ যে কাব্য রচনা করেছেন তার ভাষা বাংলা কিন্তু তার হরফ ফারসী। এতে অবশ্য অভিনবত্ব নেই। কারণ, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত হয়েছে একই ধারায় অর্থাৎ ভাষা সংস্কৃত কিন্তু হরফ স্থানীয় ভাষার, অর্থাৎ বাংলায় হরফ বাংলা, উড়িষ্যায় হরফ ওড়িশি, দাক্ষিণাত্যে তামিল, তেলেগু ইত্যাদি। কবি নিত্যানন্দ রচিত শীতলামঙ্গল কাব্য উড়িষ্যায় প্রচলিত আছে—তার ভাষা বাংলা, হরফ ওড়িশি। সুতরাং ভাষা ও হরফ সমাজজীবনের চাহিদার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কবি গরীবুল্লাহ, রাজতন্ত্রের ভাষাকে মর্যাদা দিয়েছেন অক্ষরের মাধ্যমে কিন্তু রচনামধ্যে প্রচলিত বাংলা ভাষাকে গ্রহণ করে, বাংলা ভাষার চলমানতাকে সুদৃঢ় করেছেন। বলা বাহুল্য, ভারতচন্দ্র এবং শাহ গরীবুল্লাহ প্রমুখের সাহিত্য রচনায় এই যে নবতর ধারাটির পরিচয় পাই, তা বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তো বটেই, উপরন্তু আরবী-ফারসী সহযোগে বাংলায় কাব্য রচনার এই ধারা হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি সমন্বয়ের এক বড় উদাহরণ। বর্তমানে এক অভূতপূর্ব রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সঙ্কটের পরিপ্রেক্ষিতে, হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি সাধনার প্রয়াস সফল হয়ে ওঠা একান্ত বাঞ্ছনীয়, তা বলা বাহুল্যমাত্র।

[গ্রাম-বাংলায় হিন্দু-মুসলিম সমন্বয় প্রচেষ্টা এবং সৈয়দ শাহ আবদুল্লা সম্পর্কিত বহু তথ্যাদি বর্ণিত হয়েছে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় রচিত 'গৌড়বঙ্গ সংস্কৃতি' গ্রন্থে।—পুস্তক বিপণি সংস্করণ। ১৯৭২ খ্রিঃ, পৃঃ ৭৪-৮০।। —গ্রন্থকার]

দেশেতে রসিক নাই কে শুনিবে কবি

কবি আর কবিতা—এ তো যুগ পরিবেশ আর স্রষ্টা ও শ্রোতার রসিক মনের ফসল। সুতরাং ঐ ক'টি বস্তুর অভাব ঘটলে কবির আক্ষেপ অতি স্বাভাবিক ঘটনা। তবুও দেখা যায় উনিশ শতকের শেষার্ধে জগৎবল্লভপুর অঞ্চলে ইসলামী বাংলা কাব্য রচিত হচ্ছে, কিছু কিছু নমুনাও পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন সূত্রে। অনেকের আবার নামটুকু পাওয়া গেলেও কাব্যের নমুনা অনুসন্ধান সাপেক্ষ। অতি সংক্ষেপে এঁদের কথা আলোচনা করা গেল।

(ক) ফজলে হক খোন্দকার

এঁর নিবাস ও পরিচয় সম্পর্কে জানা গেছে, জেলা হুগলীর চকসাদত গ্রাম [পরগণা বালিয়া] নিবাসী কবি সের আলী রচিত "তুতিনামা" কাব্যগ্রন্থের সূত্রে :

"বালিয়া সামিল এক বামনপাড়া গ্রাম,
তাহে বাস খোন্দকার ফজলে হক নাম।

রূপগুণে মনোহর বিদ্যার সাগর,
প্রভুপথে মন তাঁর আছে নিরন্তর।
তপে জপে ধ্যানে জ্ঞানে আছয়ে প্রচুর,

তেজস্বী তপস্বী তিনি মারফতে জহুর।
গুণাগুণ দেখি তাঁর এই দীনহীনে,
বিক্রীত হইনু সেই গুরুর চরণে।

তার তুল্য পুত্র তার দিল ভগবান,
রসি সম প্রকাশ নাম আজিজ রহমান।
তার যত গুণ তাহা লিখনে না যায়,
পিতাপুত্রে সমতুল্য করিল খোদায়।"

এই কাব্যটির অন্যত্র রয়েছে—

সের আলী রচিয়ে বলে   গুরুপদে বিকাইলে
তবে গুরু তুলে কোলে দেখাইবে সারাৎসারা।
নব-গুরু ফজলে হকে   দেখাইয়া দিবে চোকে
তাহা বিনে কেবা আর দেখাইবে চন্দ্রতারা।।

কবি সের আলীর এই কাব্যের রচনাকাল "চন্দ্রপৃষ্ঠে পক্ষ আর সমুদ্রেতে নেত্র" (= ১২৭৩ বঙ্গাব্দ = ১৮৬৬-৬৭ খ্রিঃ)।

ফজলে হক খোন্দকার যদি কোন কাব্য রচনা না করে থাকেন, তাহলেও তিনি সাধক পুরুষ ছিলেন এটা নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। এই ঘটনার দ্বারা বোঝা যায় আঠারো উনিশ শতকে জগৎবল্লভপুরের মুসলমান প্রধান অঞ্চলে বেশ কিছু সুফী সাধকের বসবাস ছিল, যাঁদের নাম-খ্যাতি বালিয়া পরগণার সীমানা ছাড়িয়েছিল।

এক্ষেত্রে ফজলে হক খোন্দকারের নিবাস সম্পর্কে একটা প্রশ্নের সমাধান বাঞ্ছনীয়। জগৎবল্লভপুর থানা-অঞ্চলে বামুনপাড়া (ব্রাহ্মণপাড়া) নামধারী দুটি মৌজা আছে— খড়দা বামুনপাড়া (জে. এল. নং. ১৬) এবং ভুরশুট বামুনপাড়া (জে. এল. নং. ২৫)— দুটি মৌজার মধ্যে দূরত্ব সামান্যই, দুটি গ্রামেরই পূর্বদিক বরাবর প্রাচীন কৌশিকী (কানা দামোদর) বহমান এবং দুটি গ্রামেই মুসলিম বসতিও আছে। খড়দা বামুনপাড়া গ্রামে রয়েছে কতোয়ালী পীরের আস্তানা, অপরপক্ষে ভুরশুট বামুনপাড়ায় রয়েছে মসজিদ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ঃ ফজলে হক খোন্দকার কোন্ বামুনপাড়া-র বাসিন্দা ছিলেন?

(খ) জোনাব আলী—

—এঁর লেখা তিনখানি কাব্যগ্রন্থের নাম জানা যাচ্ছে। যথা—'হকিকাতচ্ছালাত', 'ফজিলতে দরুদ', 'জিয়ারতে করব'। কবি জোনাব আলী, 'জিয়ারতে করব' কাব্যগ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন উদং (বর্তমানে থানা আমতা, জে. এল. নং ১৩৪) নিবাসী কবি জনাব হাফেজ ছফি আবদুল করিম কর্তৃক উর্দু ভাষায় রচিত 'দরুদ কিবরিয়া' নামক কাব্যগ্রন্থ থেকে।

'জিয়ারতে করব' কাব্যগ্রন্থে কবির আত্মপরিচয় ও গ্রন্থ পরিচয় প্রসঙ্গে যে তথ্য

রয়েছে—

"জনাব হাফেজ ছুফি আবদুল করিম
বালিয়া উদঙ্গে যায় বসত কদিম।
দরুদ কিবরিয়া নামে রেছালা উর্দুতে
তালিফ তছনিফ করিলেন খুবি সাতে।
সে কেতাব হৈতে আমি বাঙ্গলা জবানে
রচনা করিনু ঠিক তরজমার মানে।
তাতে খাতা পাও আতা কর দীনদার
সরম না দেহ্ মুঝে লোগের মাঝার।
অধীন জনাব আলি এ হীনের নাম
হাওড়া জেলার বিচে ধসায় মোকাম।
আমীর মরহুম নাম মেরা কেবলেগার
নেক পাক ছিল তিনি মকবুল আল্লার।
দাদা ছাহেবের মাম গোলাম রছুল
তিনি বি ছিলেন অলি খোদার মকবুল।

কবি জোনাব আলীর রচনাসূত্রেই জানা গেছে তাঁর নিবাস ছিল ধসা গ্রাম (বর্তমানে জগৎবল্লভপুর থানাধীন, জে. এল. নং ২৮)।

(গ) এছাড়া আলোচ্য জনপদে মৌজা জালালসী (জে. এল. নং. ৭৩, ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত)-তে আবির্ভূত হয়েছিলেন কবি কমরদ্দীন। কমরদ্দীন লিখিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ বেনজির বদরে মুনির, রচনাকাল ১২৭৯ সাল (= খ্রিঃ ১৮৭২)।

(ঘ) গোবিন্দপুর (জে.এল.নং৬৮) নিবাসী কবি মহম্মদ খাতের মুন্সি রচিত ন'খানি কাব্যাদির মধ্যে গোলে হরমুজ (১২৬১), বনবিবির জহুরানামা (১২৮৭), তুতিনামা (১২৯৭) ইত্যাদি উল্লেখ্য

সংস্কৃত ও বাংলা পুঁথি, পুস্তক

জগৎবল্লভপুর জনপদে একদা সংস্কৃত চর্চার কেন্দ্র ছিল জগৎবল্লভপুর, পাঁতিহাল, প্রতাপপুর ও মাজু প্রভৃতি গ্রামাদিতে।

মাজু গ্রামের ঘোষাল বংশের কালীকৃষ্ণ ঘোষাল রচিত "মুনি বালকের বিদ্যালাভ" গ্রন্থটি শ্রীরামপুরস্থিত খ্রিস্টান মিশনারীদের দ্বারা মুদ্রিত হয়েছিল বলে কথিত হয়।

মাজুর প্রখ্যাত পণ্ডিত রামসদয় পাঠক চূড়ামণি রচিত "সত্যনারায়ণের পাঁচালি" পুঁথিটির পুষ্পিকায় আছে :

'ইন্দু'পরি সিন্ধু শোভে বসু ঋতু শেষে,
শকে সাঙ্গ হল পুঁথি আষাঢ়ের বিশে।"—এই মত হিসাব করলে, বোঝা যায়,
১৭৮৬ শকাব্দের ২০ আষাঢ় তারিখে পুঁথিটির রচনা সমাপ্ত হয়েছিল—(খ্রিঃ ১৮৬৪)।

পুঁথিখানি মাজু পাবলিক লাইব্রেরীতে রক্ষিত ছিল।

মাজুর বরদাপ্রসাদ বসু ও তদীয় ভ্রাতা হরিচরণ বসু সংস্কৃত ভাষায় ও হরফে দেবী ভাগবত, মহাভারত এবং সংস্কৃত অভিধান "শব্দকল্পদ্রুম" মুদ্রিত করেছিলেন। মুদ্রণ কার্যাদি জে.ডব্লিউ. টমাস কর্তৃক ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস, ২৪ নং লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতায় হয়েছিল। শকাব্দা ১৮০৮ (= ১৮৮৬ খ্রিঃ)-তে প্রকাশিত হয়েছিল ৭১ নং পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রীট থেকে। প্রতি খণ্ড দশ টাকা মূল্য ছিল। [চিত্র : ৭]।

এছাড়া সমগ্র ভারতের বিভিন্ন তীর্থের পরিচয় সম্বলিত পাঁচ খণ্ডে "তীর্থ দর্শন" নামে একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন বরদা প্রসাদ বসু। ঐটি সম্পাদিত হয় শকাব্দা ১৮১৩ (= ১৮৯১ খ্রিঃ)-তে। রামনারায়ণ যন্ত্রে কালীপ্রসন্ন বসু দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছিল কলিকাতার ৭১ নং পাথুরিয়াঘাট স্ট্রীট থেকে। সম্পাদনা হরিচরণ বসু।

১৩৪০ বঙ্গাব্দে (= ১৯৩৩ খ্রিঃ) মাজুর বেণীমাধব চক্রবর্তী অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত 'জটায়ু পতন' (পাঁচটি অধ্যায়যুক্ত) কাব্যগ্রন্থটি রচনা করেন।

মাজুর জীবন ঘোষাল (১৯০৫-১৯৭৩ খ্রিঃ) প্রণয়ন করেন 'মাজু গ্রাম' শীর্ষক একটি পুস্তিকা। এছাড়া "মাজুর ঘোষাল বংশের কুলজীনামা" পুস্তিকাটিও রচনা করেন। দুটি পুস্তিকাই মুদ্রিত হয়েছিল। পাণ্ডুলিপি আকারে কয়েকটি পৌরাণিক নাটক জীবনবাবুর পুত্রদ্বয় নারায়ণ ও দিবাকর সযত্নে রক্ষা করছেন পিতৃস্মৃতি হিসাবে। এগুলি হল—(১) ঋষ্যশৃঙ্গ, (২) দশরথ, (৩) দক্ষযজ্ঞ, (৪) সতী [অন্নপূর্ণা বারোয়ারী পূজামণ্ডপে অভিনীত], (৫) পাঞ্চজন্য [মাজু ঘোষপাড়ায় অভিনীত] ; এছাড়া একটি সামাজিক নাটক 'অসবর্ণ' [বল্লাল সেন প্রবর্তিত সামাজিক স্তর বিন্যাস ভিত্তিক নাটক]।

প্রতাপপুর-কৃষ্ণবাটী মৌজা [জে. এল. নং ২৩], একদা ছিল ব্রাহ্মণ প্রধান। তখন শাস্ত্রচর্চা ও জ্যোতিষ চর্চার কেন্দ্র রূপে এর পরিচিতি ছিল। তদানীন্তন কালের ভট্টাচার্য পরিবার ছিলেন এ সকল বিষয়ে অগ্রণী। প্রখ্যাত পণ্ডিত রামব্রহ্ম শিরোমণির পুত্র মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ ("ভট্টাচার্য" কৌলিক পদবী) (খ্রিঃ ১৮৪০ - ১৯৩৬ জীবিতকাল) ছিলেন কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক। অবসর গ্রহণের পর নবদ্বীপে পাকা টোলে অধ্যাপনা করেন (১৯১১-১৯৩৬ খ্রিঃ)। ১৯০০ খ্রিঃ-তে কামাখ্যানাথ "মহামহোপাধ্যায়" উপাধি লাভ করেন।

এছাড়া, ইনি ছিলেন কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির সম্মানিত সদস্য। কামাখ্যানাথ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। এগুলি হল (১) কুসুমাঞ্জলি ব্যাখ্যাবিবৃতি, (২) তত্ত্বচিন্তামণি (ছয় খণ্ডে সমাপ্ত, টীকা সহ), (৩) তত্ত্বচিন্তামণি দীধিতি বিবৃতি (তিন খণ্ড)

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় হল যে, কামাখ্যানাথের মত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের কর্মক্ষেত্র স্বাভাবিকভাবেই ছিল কলিকাতা ও নবদ্বীপ। তবে এই এলাকার অপরাপর সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতবর্গেরও গতায়াত ছিল হুগলী জেলার বিভিন্ন এলাকায়। এর একটা সূত্র পাওয়া যাচ্ছে, মাজু পাবলিক লাইব্রেরীতে রক্ষিত পুঁথিগুলি দৃষ্টে।

নবজাগরণ পর্বে কাশীপ্রসাদ ঘোষ

উনিশ শতকে বাঙ্গলায় নবজাগরণ পর্বে জগৎবল্লভপুরের চৌহদ্দির মধ্যে সাহিত্যচর্চার ধারা কেমন ছিল, তার পরিচয় দান কিংবা আলোচনা আপাততঃ অসম্ভব। তবে এক্ষেত্রে নবজাগরণের পীঠস্থান শহর কলকাতায় কবি ও সাংবাদিক কাশীপ্রসাদ ঘোষ [০৫।০৮।১৮০৯ -- ১১।১১।১৮৭৩ খ্রিঃ]-এর কৃতিত্ব আলোচনার দাবী রাখে। কাশীপ্রসাদ ঘোষের পৈত্রিক নিবাস পাঁতিহাল মৌজা। পাঁতিহালে ঐ ঘোষ পরিবারের নিবাস আজও বর্তমান—তবে এঁরা বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে হাওড়ার শিবপুর অঞ্চল ও কলকাতার নানান স্থানে ছড়িয়ে পড়েছেন। কাশীপ্রসাদ বরাবরই কলকাতাবাসী ছিলেন। এনার পিতামহ ও মাতামহ ছিলেন কোম্পানীর মুন্সী। [চিত্র : ৮]।

কাশীপ্রসাদ ঘোষ হচ্ছেন প্রথম ভারতীয় কবি যিনি ইংরাজীভাষায় কাব্য-কবিতা রচনা করে, তাঁর সমকালে কবিখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এক্ষেত্রে ইনি মাইকেল মধুসূদনেরও পূর্ববর্তী কালের। কাশীপ্রসাদের কবিতার বিষয়বস্তু হচ্ছে স্বদেশচিন্তা। ভারতবর্ষের জনজীবন, হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠানাদি, ভারতবর্ষের ঋতুচক্র, নদ-নদী, প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী মায় পাখ-পাখালি, কাশীপ্রসাদের কবিতায় বর্ণিত হয়েছে। কবি কাশীপ্রসাদের মনোভঙ্গিমার আভাস মিলতে পারে নিম্নোক্ত সূত্রে—

কবিতার নাম	রচনাকাল
দ্য বীণা : দ্য ইণ্ডিয়ান ল্যুট	ফেব্রুয়ারী, ১৮২৮ খ্রিঃ
ইভনিং ইন মে	১৫ মে, ১৮২৮
মর্ণিং ইন মে	১৭ মে, ১৮২৮
টু দ্য মুন	১৯ মে, ১৮২৮
শ্রীপঞ্চমী	১৩ জানুয়ারি, ১৮২৯ খ্রিঃ
সঙ অফ দ্য বোটমেন টু গঙ্গা	সেপ্টেম্বর, ১৮২৯
রাসযাত্রা	১৩ ডিসেম্বর, ১৮২৯
জন্মাষ্টমী	১৯ ডিসেম্বর, ১৮২৯
ঝুলন	২৫ ডিসেম্বর, ১৮২৯
দোলযাত্রা	৪ জানুয়ারী, ১৮২০ খ্রিঃ
দুর্গাপূজা	২৭ জানুয়ারী, ১৮৩০ খ্রিঃ

কাশীপ্রসাদের কাব্যকৃতি সম্পর্কে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচনা করে চলে, যদিও তিনি এদেশের সমালোচকদের দৃষ্টিতে অনুজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত। জনৈক বিদেশী সমালোচকের ভাষায় - Although Kasi Prasad Ghosh was the first Indian to write poetry and essays in English, and the very first Indian to publish a collection of his own poetry in English, he has been almost totally ignored by scholars in the area,' both as a poet and as an early exponent of Indian nationalism.'

কাশীপ্রসাদ রচিত বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ "দ্য শায়ের অ্যাণ্ড আদার পোয়েমস" তাঁর কাব্যমালার অলঙ্কার। কাশীপ্রসাদ ঘোষের খ্যাতি কেবল ইংরাজী কাব্য-কবিতা ও প্রবন্ধ রচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রায় তিনশতাধিক টপ্পাজাতীয় বাংলা গানের রচয়িতা রূপেও তাঁর স্বীকৃতি রয়েছে। তাঁর টপ্পাগানের কথামালার বাঁধনে ধরা পড়েছে বহুবর্ণরঞ্জিত ভালোবাসা ও হৃদয়াবেগের অন্তহীন আকৃতি—

অনেক সাধের ধন, তুমি আমার প্রাণ,
কত ভালোবাসি কি কহিব আর।
হেরিলে বিধুবদন, যে সুখ হয় সাধন,
জানে তা আমার মন, কে জানিবে আর।

সাংবাদিক ও সংবাদপত্র সম্পাদকরূপে কাশীপ্রসাদ ঘোষ ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত, পরিচালিত 'দ্য হিন্দু ইন্‌টেলিজেন্সার' পত্রিকার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাংবাদিক কাশীপ্রসাদের মূল্যায়ন করে বলা হয়েছে ঃ হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, সুসাহিত্যিক ও সুকবি কাশীপ্রসাদ ঘোষ ১৮৪৬ সনে 'হিন্দু ইনটেলিজেন্সার' নামক ইংরাজী সাপ্তাহিক প্রকাশ করিয়া খৃষ্টানী-বিরুদ্ধ আন্দোলনের সহায়তা করিতে থাকেন। পত্রিকাখানির আরও একদিকে কৃতিত্ব ছিল। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল প্রমুখ অব্যবহিত পরবর্তীকালের বিখ্যাত সাংবাদিকগণ ইহাতে রাজনীতি বিষয়ক নিজ নিজ রচনা প্রকাশের সুযোগ পাইয়াছিলেন। (দ্র. সে যুগের পত্র-পত্রিকা ও আমাদের জাতীয়তা ঃ যোগেশ চন্দ্র বাগল। বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৫৮ ; পৃঃ ১০০)

১৮২৩ খ্রিঃ-তে ভারতের অস্থায়ী গভর্ণর জেনারেল জন অ্যাডাম চালু করেন কুখ্যাত প্রেস আইন—এর পর পুনরায় সিপাহী বিদ্রোহ বা জাতীয় মহাবিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৫৭ জুন থেকে ১৮৫৮ জুন চালু ছিল সংবাদপত্র দমন আইন। নতুন আইনে রাজদ্রোহিতার দণ্ড ছিল পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা এবং দুই বছরের অনধিক কারাবাস—এরই মধ্যে বন্ধ হয়েছিল কাশীপ্রসাদ ঘোষের 'হিন্দু ইনটেলিজেন্সার'। [দ্র. তলোয়ার বনাম কলম ঃ প্রথম শতবর্ষে—শ্রীপান্থ ; দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন। সম্পাদনা চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ১৩৭-১৩৮]

'বিজ্ঞান সেবধি' পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদকরূপেও কাশীপ্রসাদ ঘোষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর রচিত প্রবন্ধাবলী· অঙ্ক ও রেখাগণিত, রেখাগণিত বিদ্যার সহিত বস্তুবিষয়ক বিদ্যার বৈলক্ষণ্য ইত্যাদি।

সাঁওতাল বিদ্রোহ (জুন, ১৮৫৫ = ফেব্রু, ১৮৫৬) সম্পর্কে "দ্য হিন্দু ইনটেলিজেন্সার" পত্রিকায় কাশীপ্রসাদ যে সম্পাদকীয় লিখেছিলেন, তাতে তাঁর মুক্তবুদ্ধি ও স্বদেশ হিতৈষণার পরিচয় মেলে। তাঁর মতে, সাঁওতালদের গণ প্রতিবাদ প্রতিরোধ আদপেই কোন প্রকারের সংগঠিত বিদ্রোহ নয়। বহুদিন ধরেই সাঁওতালরা বিভিন্ন উপায়ে অবদমিত অত্যাচারিত হচ্ছিল। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এ সকল বিষয়ের প্রতিকার

করবেন এমন প্রত্যাশাও সরলমতি সাঁওতালরা করেছিল। প্রত্যাশা পূরণ না হওয়ায় সাঁওতালরা নিজেদের হাতে আইন তুলে নেয়, ফলে এই প্রকার দাঙ্গাহাঙ্গামা বেধে যায়। [তাং ৩০/০৭/১৮৫৫ খ্রিঃ]

১৮৩৫ খ্রিঃ তে "দ্য ক্যালকাটা লিটারারি গেজেট" পত্রিকায় 'মেমোয়ার্স অফ নেটিভ ইণ্ডিয়ান ডাইন্যাসটিজ' শিরোনামে কাশীপ্রসাদ সেকালের দেশীয় রাজ্য গোয়ালিয়র, লক্ষ্ণৌ, ইন্দোর, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস বর্ণনা করেছিলেন।

বলা বাহুল্য, কাশীপ্রসাদের কর্মকৃতিত্ব অতি বিচিত্র। ১৬ নভেম্বর, ১৮৪৬ থেকে ১৫ জুন, ১৮৫৭ খ্রিঃ পর্যন্ত "দ্য হিন্দু ইনটেলিজেন্সার" পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশনার সঙ্গে যেমন যুক্ত ছিলেন, তেমনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে তত্ত্ববোধিনী সভার সাথেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। অপরপক্ষে স্যার সিসিল বিডন-এর নেতৃত্বে গঠিত বেথুন স্কুলের প্রথম কমিটিতে বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন কাশীপ্রসাদ ঘোষ ; কমিটির সেক্রেটারী ছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর। উক্ত কমিটির সদস্যদের নাম ২০ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৬ তারিখে "দ্য ক্যালকাটা গেজেট" মারফত ঘোষিত হয়েছিল।

সুকবি কাশীপ্রসাদ ঘোষ-এর স্বদেশপ্রাণতার পরিচয়বহ কবিতা–

("Song of the Boatmen to Ganga" a poem that is exclusively one dedicated to India :)

SONG

of the Boatmen to Ganga.

Gold River! gold river! how gallantly now
Our bark on thy bright breast is lifting her
prow.
In the pride of her beauty how swiftly she flies :
Like a white-winged spirit thro' topaz-paved
skies.
Gold river! gold river! they bosom is calm,
And o'er thee, the breezes are shedding their
balm ;
And nature beholds her fair features pourtrayed,
In the glass of thy bosom–serenely displayed.

Gold river! gold river! the sun to thy waves,
Is fleeting to rest in thy cool, coral caves ;
And thence, with his tiar of light, in the morn,
He will rise, and the skies with his glory adorn.

Gold river! gold river! how bright is the beam,
That lightens and crimsons they soft-flowing stream ;
Whose waters beneath make a musical clashing,
Whose waves as they burst in their bringhtness are flashing.

Gold river! gold river! the moon will soon grace,
The hall of the stars with her light-shedding face ;
The wandering planets will over thee throng ;
And seraphs will waken their music and song.

Gold river! gold river! our brief course is done,
And safe in the city our home we have won!
And as to the bright sun now dropped from our view,
So Ganga! we bid thee a cheerful adieu!

September 17, 1829.

আধুনিক যুগের কবি বিষ্ণু দে (১৮।৭।১৯০৯—৩।১২।১৯৮২)

কবি বিষ্ণু দে-র পিতৃপুরুষের ভিটা জগৎবল্লভপুর থানার পাঁতিহাল মৌজা-য়। পিতা—অবিনাশ চন্দ্র, মাতা মনোহারিণী। পিতামহ—বিমলাচরণ। জ্যেষ্ঠ পিতামহ শ্যামাচরণ দে মহাশয়, সেকালের উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী।

তাঁর প্রথম মুদ্রিত রচনা "পুরাণের পুনর্জন্ম লক্ষণ" নামীয় গল্পটি, "প্রগতি" পত্রিকায় (১৩৩৪ ফাল্গুন / ১৯২৮ খ্রিঃ) প্রকাশিত।

প্রখ্যাত 'কল্লোল' পত্রিকায় (১৩৩৫-৩৬ বঙ্গাব্দ) তাঁর প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প প্রকাশিত হয়েছে। সে সময় তাঁকে 'কল্লোল যুগ'-এর অর্বাচীনতম কবি বলা হত। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকায় তাঁর একাধিক কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যায়।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের জ্ঞানপীঠ পুরস্কার লাভ করেন "স্মৃতি সত্ত্বা ভবিষ্যৎ" কাব্যখানির জন্য। ঐ পুরস্কারটি প্রদান করা হয় ১০/০২/৭৩ তারিখে নির্বাচক কমিটির সভাপতি, ভারত সরকারের মন্ত্রী ডঃ করণ সিং কর্তৃক।

একদা তাঁর পৈত্রিক বসতবাটীতে "বিষ্ণু দে মঞ্চ" নামাঙ্কিত একটি নাট্যশালা স্থাপন করেছিল স্থানীয় নাট্যামোদীগণ। জীবনের এক বিশেষ পর্বে কবি পাঁতিহালে যাতায়াত করতেন, নিয়মিত ভাবে।

বিজ্ঞান সাধক

ডা: মহেন্দ্রলাল সরকার

কেবলমাত্র সাহিত্য-সাধনা নয়, বিজ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রেও জগৎবল্লভপুর জনপদের একাধিক বিজ্ঞান-সাধকের নাম সুপরিচিত। এঁদের মধ্যে প্রথমজন হলেন আধুনিক ভারতবর্ষে বিজ্ঞান-সাধনার জনক-তুল্য ব্যক্তি ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, পরাধীন ভারতবর্ষে যিনি কেবলমাত্র বিজ্ঞান-গবেষণার জন্য মন-প্রাণ-অর্থ সকলি নিয়োগ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর সত্যানুসন্ধানের জন্য বিজ্ঞানচর্চার মানসিকতা, দুর্লভ জ্ঞানানুরাগ এবং সাহসিকতা, পরাধীন জাতির মনে মনুষ্যত্বলাভের আকাঙ্খাকে জাগরুক করে তুলেছিল। [চিত্র : ৯]।

মহেন্দ্রলালের পৈতৃক নিবাস জগৎবল্লভপুর থানার প্রায় মধ্যভাগে অবস্থিত পাইকপাড়া গ্রামে [জে. এল. নং ২৪]। তাঁর জন্ম ২ নভেম্বর, ১৮৩৩ খ্রিঃ এবং প্রয়াণ ২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯০৪ খ্রিঃ।

ডাঃ সরকার, ১৮৬৩ খ্রিঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. ডি. [মেডিসিনে ডক্টরেট্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মহেন্দ্রলাল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় এম. ডি. উপাধিপ্রাপক, [প্রথম এম. ডি.—চন্দ্রকুমার দে]। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের বঙ্গীয় শাখার সূচনাকালেই মহেন্দ্রলাল সম্পাদক পদে বৃত হন। কিন্তু ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ফেব্রুয়ারি উক্ত মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের ৪র্থ বার্ষিক সভায় প্রদত্ত একটি বক্তৃতায় হোমিওপ্যাথির মূলনীতির অনুকূলে মতামত প্রকাশের জন্য ব্রিটিশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন থেকে বিতাড়িত হন। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে নিজের সম্পাদকত্বে "দ্য ক্যালকাটা জার্নাল অফ মেডিসিন" নামীয় মাসিক পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে "আওয়ার ক্রীড" (আমাদের মতবাদ) শিরোনামে মন্তব্য করলেন ঃ যেমন ধর্মের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের বিশ্বাস বর্তমান, চিকিৎসাশাস্ত্রেও সেইরকম। কোন এক ধরণের চিকিৎসা প্রণালী সম্বন্ধে অজ্ঞতা এই বিভেদকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে, যেমনটি ধর্ম্মের ক্ষেত্রেও ঘটে থাকে।"

সেইকালে মহেন্দ্রলালের কর্মধারা ও বিশ্বাস সম্পর্কে অনুদার মনোভাব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্‌টি অফ সায়েন্স-এর সদস্যরাও পোষণ করতেন, যার পরিণতিতে ১৮৭৮ খ্রিঃ ২৭ এপ্রিল তারিখে মহেন্দ্রলালকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। তথাপি মহেন্দ্রলাল বিশ্বাস করতেন, চরক সংহিতার শ্লোকটিতে—

"তদেব যুক্তং ভৈষজ্যং যদা রোগ্যায় কল্পতে।
স চৈব ভিষজাং শ্রেষ্ঠী রোগেভ্যো যঃ প্রমোচয়েত।।"
—অর্থাৎ সেই ঔষধই সঠিক যার দ্বারা রোগমুক্তি ঘটে ;
তিনিই শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক, যিনি রোগমুক্ত করতে পারেন।

যখন সমগ্র ভারতবর্ষে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোথাও বিজ্ঞান গবেষণার কোন সুযোগই ছিল না, সেইকালে (১৮৬৯ খ্রিঃ) ভারতবর্ষীয়দের বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণার জন্য জাতীয় প্রতিষ্ঠানের আবশ্যকতা বিষয়ে

প্রবন্ধ লিখে জনমত সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, দরিদ্রদের অবস্থার উন্নতির প্রয়োজন। আমরা যে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলতে চাই, তার কাজ হবে জনগণকে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া। প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়মিত বিজ্ঞান আলোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুব্যবস্থা থাকবে। বক্তারা বিষয়বস্তুকে পরীক্ষা করে দেখাবেন এবং শ্রোতাদেরও আহ্বান করা হবে সেইসব পরীক্ষা সম্পাদন করার জন্য। আমাদের ইচ্ছা, প্রতিষ্ঠানটি থাকবে সম্পূর্ণভাবে এদেশীয়দের পরিচালনায় এবং নিয়ন্ত্রণাধীনে।

মহেন্দ্রলালের আন্দোলনের ফলেই, ১৮৭৬ খ্রিঃ ২৯ জুলাই "ভারতীয় বিজ্ঞান সভা"-র উদ্বোধন হয় কলেজ স্ট্রীট ও বৌবাজারের সংযোগস্থলে গভর্নমেন্ট থেকে লীজ নেওয়া একটি বাড়িতে। ১৫ জানুয়ারি, ১৮৭৬ খ্রিঃ পূর্বোক্ত প্রতিষ্ঠানটির নূতন নামকরণ হয় "ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স।" এই প্রতিষ্ঠানটিতে গবেষণা করেই সি. ভি. রমন নোবল পুরস্কার লাভ করেছিলেন। প্রতিষ্ঠানটি আজও ভারতবর্ষের গর্ব।

১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক অপমানিত ও বিতাড়িত হবার পর মহেন্দ্রলালের বক্তব্য ছিল : "আমি চাষার ছেলে, না হয় সামান্য কাজ করে খাব, তাতে কিছু এসে যাবে না। তবে যা সত্য, তা অস্বীকার করতে পারব না। সত্য যা, তা বলতেই হবে বা করতেই হবে।"

বিজ্ঞান সম্পর্কেও প্রায় একই কথা অন্যত্র বলেছেন ঃ ...একটা মূল তত্ত্ব সমস্ত বিজ্ঞানের ভিত্তিরূপে দাঁড়াইয়া আছে। বহু লোকের প্রত্যক্ষ প্রমাণ-লব্ধ যে সত্য, বিজ্ঞানের তাহাই একমাত্র সত্য। ...বিজ্ঞানবিদ্যার নিকট প্রত্যক্ষ প্রমাণই একমাত্র প্রমাণ।"

আধুনিক ভারতবর্ষে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানচর্চার পথিকৃৎ রূপে মহেন্দ্রলালের অবদান বা তাঁর কৃতকর্মের মূল্যায়ন আজও হয়েছে কিনা সন্দেহ!

বিগত ২৪ নভেম্বর, ১৯৮৫ খ্রিঃ তারিখে মহেন্দ্রলালের জন্মভিটা পাইকপাড়া গ্রামে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স-এর উদ্যোগে কম্যুনিটি হল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। পাঁতিহাল স্টেশন এলাকা থেকে পাইকপাড়া পর্যন্ত রাস্তাটির নামকরণ করা হয়েছে "ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার সরণি।"

মহেন্দ্রলাল কয়েকটি বাংলা গীত রচনা করেছিলেন, যদ্বারা তাঁর অধ্যাত্মচিন্তা ও বিজ্ঞান ভাবনার পরিচয় মেলে। একটি গীতের উদ্ধৃতি দেওয়া গেল--

[Heavens Declare the glory of God]
।। রাগিণী কেদারা, তাল আড়ঠেকা।।
"দেখ দেখ চেয়ে দেখ গগন মণ্ডলে,
কি শোভা করেছে সেথা গ্রহ তারা দলে।।
যেন প্রকৃতি সাজায়ে রেখেছে জ্যোতির্ময় পুষ্পদলে,
দিতে পুষ্পাঞ্জলি বিধাতার চরণকমলে।।
দূরবীণ সহায়ে বিজ্ঞানের বলে।

দেখ অদ্ভুত রূপ তাদের জ্ঞানচক্ষু মেলে।।
দেখিলে তবে এই অসীম বিশ্বরাজ্য,
চালাইছেন বিশ্বনাথ কি কৌশলে।।
ছড়ায়ে ধূলি একমুষ্টি, তিনি করিয়াছেন সৃষ্টি,
অগণ্য নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ধূলোখেলার ছলে।।.....

বিজ্ঞান-মনস্ক মহেন্দ্রলালের মতো বরেণ্য মানুষের জন্য বহুকাল ধরে জগৎবল্লভপুরবাসী শ্লাঘা অনুভব করতে পারবেন।

ডা: অজিত কুমার মাইতি

ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের জন্মভূমির অদূরে অবস্থিত নিজবালিয়া গ্রামে [জে. এল. নং ৪৬] ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী শারীরবিজ্ঞানী ডাঃ অজিত কুমার মাইতি। অজিতকুমারের জন্ম নিজবালিয়ার সুপরিচিত মাহিয্য পরিবারে, কৃষ্ণধন ও রাধারানীর জ্যেষ্ঠপুত্ররূপে। বাল্যশিক্ষা, সে সময়ে সদ্য প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় গড়বালিয়া রাখাল চন্দ্র মান্না ইনস্টিটিউশনে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে এম. এস. সি (১ম শ্রেণী) এম. বি. বি. এস, ডি. ফিল উপাধি লাভ করে শারীর বিজ্ঞানের গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অধীন ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ মেডিসিন-এর শারীর বিজ্ঞান, জৈব রসায়ন, নিউরো সায়েন্স প্রভৃতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপকরূপে কর্মজীবন অতিবাহিত করেছেন। শারীর বিজ্ঞান গবেষণার স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকার প্রদত্ত "শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার" লাভ করেন। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে ৬১-তম ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে শারীর বিজ্ঞান শাখার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। এছাড়া, ইতালীর রোম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়—সর্বত্র বিশিষ্ট শারীর বিজ্ঞান গবেষকরূপে সুপরিচিত ছিলেন।

জন্মভূমি নিজবালিয়ায় স্থাপন করে গেছেন "সবুজ গ্রন্থাগার" নামীয় প্রতিষ্ঠান।

বিগত ৬ জানুয়ারি, ১৯৯৯ খ্রিঃ তারিখে ডাঃ অজিতকুমার মাইতি প্রয়াত হয়েছেন।

একটি অজ পাড়াগাঁয়ের বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয় থেকেও খ্যাতনামা বিজ্ঞানীর আবির্ভাব অসম্ভব নয়, অজিতকুমার তারই নিদর্শন রেখে গেছেন।

এই প্রসঙ্গে বলা চলে, জগৎবল্লভপুর জনপদে বহু খ্যাতনামা চিকিৎসক, শিক্ষাবিদ, শিল্পী, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, দেশসেবক জন্মগ্রহণ করেছেন। এঁদের কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় "কর্মময় জীবন : বর্ণময় ভূমিপুত্র" শিরোনাম-অংশে বর্ণিত হয়েছে।

শিক্ষাচিন্তা

টোল চতুষ্পাঠী

আলোচ্য এলাকায় অষ্টাদশ শতকে তো বটেই, এমনকি বিংশ শতকের প্রথমার্ধেও পাঠশালার অস্তিত্ব ছিল। প্রকৃতপক্ষে দরিদ্র জনগণের শিক্ষার প্রয়োজনটুকু মেটাত

পাঠশালা। পাঠশালা শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত ছিল লোকশিক্ষা অর্থাৎ কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত সহ নানান ধরণের ধর্মগ্রন্থ পাঠের আসরের মধ্য দিয়ে জনসাধারণের শিক্ষা-তৃষ্ণা মিটত। আলোচ্য এলাকায় ঐ প্রকারের পাঠশালার বিস্তৃত বিবরণ না পাওয়া গেলেও অস্তিত্ব অস্বীকার করা চলে না, কারণ এ ছবি হচ্ছে সমকালের বাংলার। হাঁটাল পাঠশালার গুরুমশায় নিবাস পাখিরা, লোকমানসে আজও জীবিত।

অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকে জগৎবল্লভপুর অঞ্চলে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য মৌজা উত্তর মাজু ও মধ্য মাজু এবং জগৎবল্লভপুর ও পাঁতিহালে টোল-চতুষ্পাঠীর অস্তিত্বের কথা জানা যাচ্ছে।

উত্তর মাজুর ঘোষাল ও পাঠক বংশের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত টোল-চতুষ্পাঠীর খ্যাতি ছিল। ঘোষাল বংশের রমানাথ ঘোষাল, নিমাই চরণ কবিরত্ন, চুনীলাল বিদ্যাভূষণ, মহামহোপাধ্যায় টীকারাম ঘোষাল প্রমুখের বিদ্যাবত্তা ছিল কিংবদন্তী প্রায়। কথিত হয়, রমানাথ ঘোষাল মাজুতে প্রথম চতুষ্পাঠী স্থাপন করেছিলেন। অপরপক্ষে শর্মা ও দেবশর্মা উপাধিক পাঠক বংশীয়দের মধ্যে বামাপদ শর্মা, রামসদয় দেবশর্মা, রামতনু দেবশর্মা, রামব্রহ্ম দেবশর্মা, ধরণীধর দেবশর্মা প্রমুখের খ্যাতি ছিল যথেষ্ট। প্রকৃতপক্ষে টোল-চতুষ্পাঠী ও সংস্কৃত শিক্ষাকে কেন্দ্র করে মাজুর ঘোষাল ও পাঠক বংশের সুনাম ও কৃতিত্ব, প্রভাব-প্রতিপত্তি উনিশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত বজায় ছিল বলে জানা গেছে।

১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে জগৎবল্লভপুর মৌজায় (মাঝের গাঁ বন্দর অঞ্চল) একটি চতুষ্পাঠী স্থাপিত হয়েছিল কাশ্মীর নরেশ সভাপণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার কর্তৃক। তখনও কৌশিকী (অধুনা কানা দামোদর) তীরবর্তী এ অঞ্চলটি জনসমাগমে পরিপূর্ণ ছিল। এই চতুষ্পাঠী পরবর্তী প্রায় চার দশক ধরে বর্তমান ছিল। কিন্তু এখানকার অপরাপর কোন অধ্যাপকের নাম জানা যায়নি।

বিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত পাঁতিহাল পূর্বপাড়ায় ঘোষাল বংশের দ্বারা পরিচালিত একটি চতুষ্পাঠী ছিল—এটি পাঁতিহাল চতুষ্পাঠী নামেই পরিচিত। এই চতুষ্পাঠীর শেষতম অধ্যাপক হচ্ছেন পশুপতি পণ্ডিত। পাঁতিহাল চতুষ্পাঠীটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক সাহায্যপ্রাপ্ত এবং বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত ছিল।

এখানে একটা বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের ২৪ জুলাই বর্দ্ধমানের বিভাগীয় কমিশনার দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা (পাঠশালা সম্পর্কে) জানাচ্ছেন যে, প্রায় প্রতিটি গ্রামেই পাঁচ থেকে আট বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের মাসিক দু'আনা থেকে চার আনার [আজকের ১২ থেকে ২৫ পয়সা] বিনিময়ে লিখতে, পড়তে এবং অঙ্ক শেখানোর 'বিদ্যালয়' আছে। (বিদ্যালয় অর্থে পাঠশালা।--গ্রন্থকার)। সুতরাং জগৎবল্লভপুর জনপদও ব্যতিক্রম ছিল না।

১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ মহেশ চন্দ্র ন্যায়রত্ন একটি সরকারী রিপোর্টে জানাচ্ছেন যে, হাওড়া-অধীন উত্তরমাজু, মধ্যমাজু, মাকড়দহ,

আঁদুল, খালোড়, কল্যাণপুর, বালি, শিবপুর, বেতোড়, খুরুট, সালিখা অঞ্চলে সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার ভালো ব্যবস্থা আছে। ঐ সময় টোল-চতুষ্পাঠীতে পাঠ্য বিষয় ছিল হিন্দু আইন (যথা, দায়ভাগ, শ্রাদ্ধ বিবেক, তিথিতত্ত্ব, প্রায়শ্চিত্ত বিবেক, মলমাসতত্ত্ব, শুদ্ধিতত্ত্ব, শ্রাদ্ধতত্ত্ব, উদ্বাহতত্ত্ব ইত্যাদি), তৎসহ মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, ভট্টিকাব্য, কুমারসম্ভব, রঘুবংশ, ভাগবত ইত্যাদি।

প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থায় আয়ুর্বেদ চর্চার গুরুত্ব ছিল যথেষ্ট—বাঁকুল মৌজায় (জে. এল. নং ৭) গুপ্ত বংশীয়দের দ্বারা পরিচালিত আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ পাওয়া যায় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন প্রদত্ত একটি প্রতিবেদনে। ন্যায়রত্ন মন্তব্য করেছেন : "The Hindu system of Medicine is taught in several places in Bengal, notably in Calcutta, Mankar (in the Bardhawan district), Jangalpara (in the Hugly district), Bankul (in the Howrah district) and Bikrampur (in the Dacca district)."

বর্তমান কালে জগৎবল্লভপুর অঞ্চলে নেই কোন আয়ুর্বেদ শিক্ষাকেন্দ্র, পাঠশালা, টোল-চতুষ্পাঠী ইত্যাদি। পরিবর্তে রয়েছে অজস্র অঙ্গনাদি, বোধোদয় জাতীয় প্রাক প্রাথমিক স্তরের শিক্ষালয়, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয়াদি, স্নাতক (পাস ও অনার্স) স্তরের একটি মহাবিদ্যালয় এবং একটি প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান।

আলোচ্য এলাকায় ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের জনগণনা সূত্রে জানা যাচ্ছে যে, পুরুষ ১,০১,৯৪১ জন এবং নারী ৯৫,৪৮৪ জনের মধ্যে যথাক্রমে সাক্ষর পুরুষ ৭৪.৮১% এবং নারী ৫২.৫৭% [উভয়ের গড় ৬৪.০৯%]

বিদ্যালয়

জগৎবল্লভপুর অঞ্চলে অবস্থিত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয় সমূহের তালিকাটি এবার দেখা যাক—(১) জগৎবল্লভপুর উচ্চ বিদ্যালয়, (২) বড়গাছিয়া ইউনিয়ন প্রিয়নাথ পাঠশালা, (৩) বড়গাছিয়া অঞ্চল পান্নালাল সীট বালিকা বিদ্যালয়, (৪) হাঁটাল বিশালাক্ষ্মী হাইস্কুল, (৫) সুফী আবদুল মোমেন জুনিয়র হাই মাদ্রাসা, (৬) পাঁতিহাল দামোদর ইনস্টিটিউশন, (৭) গড়বালিয়া রাখাল চন্দ্র মান্না ইনস্টিটিউশন, (৮) গড়বালিয়া গার্লস হাইস্কুল, (৯) পাঁতিহাল বালিকা বিদ্যালয়, (১০) ব্রাহ্মণপাড়া চিন্তামণি ইনস্টিটিউশন (১১) ব্রাহ্মণপাড়া চিন্তামণি বালিকা বিদ্যালয়, (১২) ব্রাহ্মণপাড়া হাইস্কুল, (১৩) মাজু রামনারায়ণ বসু হাইস্কুল, (১৪) মাজু রামনারায়ণ বসু গার্লস হাইস্কুল, (১৫) রবীন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়, জালালসী, (১৬) পোলগুস্তিয়া নজরুল শিক্ষানিকেতন, (১৭) ইসলামপুর আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, (১৮) গোবিন্দপুর অনুবাজ বিদ্যামন্দির, (১৯) নওয়াপাড়া নীলকমল হাইস্কুল, (২০) ফটিকগাছি শ্রীশ্রী সারদা বিদ্যামন্দির, (২১) সিদ্ধেশ্বর শঙ্কর পাঠশালা (২২) একব্বরপুর গোবিন্দ পাঁজা হাইস্কুল, (২৩) একব্বরপুর

জে. এন. পাঁজা বিদ্যানিকেতন [কেবলমাত্র উচ্চমাধ্যমিক বিভাগ]

[কেবল মাত্র মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট কোন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় নেই। সবকটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় সহশিক্ষামূলক]

মহাবিদ্যালয় (উচ্চমাধ্যমিক, পাশ ও অনার্স সহ) :

জগৎবল্লভপুর শোভারানী কলেজ। প্রতিষ্ঠা : ১ ডিসেম্বর, ১৯৭১ খ্রিঃ। প্রতিষ্ঠাতা : সত্যনারায়ণ খাঁ।

অন্যদিকে ১৯৯৬-৯৭ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৪২টি। ছাত্র ১৩,৭৬৪, ছাত্রী ১২,৯৪২ [মোট ২৬,৭০৬ জন]।

প্রাক্-স্বাধীনতাযুগে প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি নির্বাচিত বিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস--

জগৎবল্লভপুর উচ্চ বিদ্যালয় (১৮৪৬ খ্রিঃ) :

জগৎবল্লভপুর উচ্চবিদ্যালয় তথা হাইস্কুল হাওড়া জেলার প্রাচীনতম বিদ্যালয়গুলির মধ্যে অন্যতম।

১ মার্চ, ১৮৪৩ খ্রিঃ, ক্যালকাটা গেজেটে প্রদত্ত ২৬৭নং বিজ্ঞপ্তি অনুসারে হাওড়া জেলা গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ের সূত্রপাত হয়েছিল। অপরপক্ষে ১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দে জগৎবল্লভপুর থানা হাওড়া জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এর অর্থ, জগৎবল্লভপুর উচ্চ বিদ্যালয়টি যখন স্থাপিত হচ্ছে, তখনও সেটি জেলা হুগলীর অধীনস্থ ছিল।

১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে কাশ্মীর নরেশের প্রাক্তন সভাপণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার স্থানীয় বিদ্যোৎসাহীর দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে জগৎবল্লভপুরে একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু ইতিপূর্বে ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় সুপ্রীম কোর্ট স্থাপন এবং পরবর্তীকালে ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দের ২৯ আইনানুসারে ফার্সীর পরিবর্তে আদালতে ইংরাজী ভাষার প্রবর্তন ঘটার ফলে উৎসাহ বাড়ল ইংরাজী শিক্ষাগ্রহণের প্রতি। এই পরিবর্তনের ফলে ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে পুরাতন সংস্কৃতপন্থী চতুষ্পাঠীর পরিবর্তে আধুনিক ইংরাজী শিক্ষার বিদ্যালয় গড়ে ওঠে ঐ চতুষ্পাঠীর প্রাঙ্গণেই। এই বিদ্যালয় স্থাপনের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন উত্তরপাড়া (হুগলী) নিবাসী রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, জমিদার ও বিদ্যোৎসাহী।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ স্থাপিত হয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। সে সময় আলোচ্য বিদ্যালয়টির নাম ছিল "জগৎবল্লভপুর এডেড হাই ইংলিশ স্কুল।"

১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত পরীক্ষায় জগৎবল্লভপুর এলাকার প্রথম শিক্ষার্থীরূপে পরীক্ষোত্তীর্ণ হয়েছিলেন মধুসূদন বর্মণ। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রাজকুমার ভড় এবং শশাঙ্ক মজুমদার বিভিন্ন বছরে যথাক্রমে প্রথম ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বিদ্যালয়ের সুনাম বাড়িয়েছিলেন। বিদ্যালয়ের বিশিষ্ট প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে আছেন বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী (স্বাধীনতা সংগ্রামী), হরিপদ চট্টোপাধ্যায় (স্বামী বিবেকানন্দ শিষ্যরূপে খ্যাত স্বামী বোধানন্দ), খগেন্দ্রনাথ

চট্টোপাধ্যায় (স্বামী বিবেকানন্দ শিষ্যরূপে খ্যাত স্বামী বিমলানন্দ), উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি) প্রমুখ।

প্রখ্যাত প্রধান শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছেন—শশীভূষণ দত্ত, সতীশ চন্দ্র শেঠ, সত্যপ্রসন্ন গুহ, মথুরামোহন দে, গিরীশ দাশগুপ্ত, ডঃ সুধীর রায়চৌধুরী, ডি. এস. সি., জটাধারী চক্রবর্তী, মাণিক চন্দ্র সীট প্রমুখ। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে শশীভূষণ দত্ত পরবর্তীকালে পাঁতিহাল দামোদর ইনস্টিটিউশন এবং মাণিক চন্দ্র সীট বড়গাছিয়ায় দুটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন।

খ্যাতনামা শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছেন—রামচন্দ্র ভট্টাচার্য, ইন্দুভূষণ নিয়োগী, অনাদি বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্মথ নাথ ভট্টাচার্য, হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়, মাখনলাল দত্ত, যুগল কিশোর রায়, ললিত মোহন চক্রবর্তী, অমূল্যভূষণ সামন্ত, প্রসাদ চন্দ্র দাস, হারাধন মুখোপাধ্যায়, কিশোরী মোহন মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীব চন্দ্র ভট্টাচার্য, মধুসূদন সাহা, অসিত ভট্টাচার্য, চিত্তরঞ্জন ঘোষ, তুষ্টুপদ ভট্টাচার্য, পণ্ডিত নারায়ণকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। অনাদিবাবু পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণপাড়া চিন্তামণি ইনস্টিটিউশনের সাথে যুক্ত হয়ে যান প্রধান শিক্ষকরূপে।

সন ১২৪০ সাল ২০ ভাদ্র (৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৩৩ খ্রিঃ) 'সুধাকর' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল—"সংস্কৃত বিদ্যালয়েতে গভর্নমেণ্টের খরচ সত্য বটে কিন্তু তদ্দারা সর্বসাধারণের বিশেষ উপকার নাই...আর এখনও দেশে সংস্কৃত বিদ্যাভাসের চতুষ্পাঠী আছে। ...অতএব যে বিদ্যাশিক্ষাতে লোকের অন্ধকার দূর হইয়া রাজ্যশাসনাদিতে নৈপুণ্য জন্মে তাবদ্দেশ ব্যাপিয়া সেই বিদ্যার বীজ রোপণ করাই ধার্মিক দয়ালু রাজার উচিত কর্ম...কিন্তু গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন না করিলেও তাহা দূর হইবেক না।"

প্রায় অনুরূপ বক্তব্য প্রকাশ করেছিল জগৎবল্লভপুর ইংরাজী বিদ্যালয়ের কস্যচিৎ প্রথম শ্রেণীর ছাত্র, যদ্দারা পাশ্চাত্য শিক্ষাগ্রহণের প্রতি আগ্রহের প্রমাণ মেলে। উক্ত পত্রটি "উত্তরপাড়া পাক্ষিক পত্রিকা" (৩২ শ্রাবণ, ১২৬৪ সাল, সপ্তদশ সংখ্যা)-তে প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রটির সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অংশটি নিম্নে পরিবেশিত হল। কেবলমাত্র শহর কলকাতা নয়, গ্রামাঞ্চলেও আধুনিক শিক্ষালাভের জন্য সেকালে যে ব্যগ্রতা দেখা দিয়েছিল, পত্রখানি তারই উজ্জ্বল নিদর্শন। এই সাথে বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাতার পরিচয় সম্পর্কেও নিঃসংশয় হওয়া যায়। উক্ত পত্রের উদ্ধৃতি—

"সম্পাদক মহাশয়!......

বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে গবর্নমেনট সাহায্যকৃত অভিনব ইংরাজী ও বাঙ্গলা বিদ্যামন্দির স্থাপন হওয়াতে প্রজাবর্গের যে কি পর্যন্ত উপকার দর্শিয়াছে, তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না।......

অস্মদাদির গ্রামে (জগদ্বল্লভপুর গ্রামে) মহামান্য জমিদারাগ্রগণ্য শ্রীযুত্ বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রযত্নে ও গবর্নমেন্টের সাহায্যে, একটা ইংরাজী-বাঙ্গালা বিদ্যামন্দির সংস্থাপিত হওয়াতে গ্রামবাসী ও তন্নিকটস্থ লোকের অতীব উপকার

দর্শিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। বিদ্যালয়ের অধ্যাপনাতে ছাত্রদিগের প্রতিপালকেরা যথেষ্ট প্রীতি প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং বালকেরা যেরূপ উপদিষ্ট হইতেছে, যেরূপ তাহাদের স্বভাব পরিশোধিত হইতেছে তাহাতে যে অনতিবিলম্বে এতদ্দেশে বণিকদিগের বদ্ধমূল কুসংস্কার (ইস্কুলে পড়িলে কি হবে গুরুমহাশয়ের কাছে সুদকষা শিক্‌লে হরপ হলে করে খেতে পারিবে) দূরীকৃত হইবে, সংশয় নাই। যখন কুসংস্কার তিমির নাশ করিয়া এতদ্দেশে জ্ঞানসূর্য্যের প্রকাশ হইতে থাকিবে, তখন আনন্দের আর সীমা থাকিবে না, বিদ্যালয়ের সমুন্নতির আর অপেক্ষা থাকিবে না এবং সদ্বিদ্যান সভ্যজনেরও অভাব থাকিবে না।

... ...

অতএব সম্পাদক মহাশয়! অন্ধের চক্ষুদান দিলে যত পুণ্য হয়, বারিশূন্য মরুদেশে সরোবর দান করিলে যত পূণ্য হয় এবং পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ কাতর ব্যক্তিকে জলদান করিলে যত পূণ্য হয়, আমাদিগের বিদ্যাবিহীন তিমিরাবৃত দেশে, জ্ঞানোদ্দিপক বিদ্যামন্দির স্থাপিত করাতে তদপেক্ষা পুণ্যানুষ্ঠান করা হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। এতদ্দেশস্থ ব্যক্তিরা ভুবন বিখ্যাত কৃপালু মহামান্য শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে কায়মনোবাক্যে কত ধন্যবাদ করিতেছে ও যে অনন্তকাল করিবে তাহার সন্দেহ বিরহ।......

হে সর্ব্বনিধান! সর্ব্বাশ্রয়! সর্ব্বমঙ্গলালয় পরমেশ্বর!

আমাদের চতুষ্পাটির মঙ্গল করুন।

কস্যচিৎ জগদ্বল্লভপুরের ইংরাজী স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রস্য।"

ব্রাহ্মণপাড়া হাইস্কুল (১৮৭৫ খ্রিঃ)

জগৎবল্লভপুর অঞ্চলে দুটি গ্রাম ব্রাহ্মণপাড়া (বামুনপাড়া) নামে পরিচিত—প্রথমটি ভুরশুট ব্রাহ্মণপাড়া (জে. এল. নং ২৫), দ্বিতীয়টি খড়দা ব্রাহ্মণপাড়া (জে. এল. নং ১৬)—দুটি গ্রামে রয়েছে মোট তিনটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়। আলোচ্য বিদ্যালয়টি প্রথমোক্ত ভুরশুট ব্রাহ্মণপাড়া মৌজায় অবস্থিত। এই গ্রামের অন্যতম প্রাচীন ও অভিজাত পরিবার হলেন "সর্বাধিকারী" পরিবার, যাঁদের মূল রয়েছে হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে।

বিদ্যালয়ের প্রাচীন ইতিহাস প্রসঙ্গে শতবার্ষিকী উৎসবের কালে সুবল চন্দ্র সর্বাধিকারী বলেছিলেন : "বিগত ১৮৭৫ সালে স্থানীয় অধিবাসী গৌরকিশোর সরকার মহাশয় বিদ্যালয়টি স্থাপন করেন...তপশিলী অধ্যুষিত এই সুদূর পল্লীপ্রান্তে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যাঁরা যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন, নিরক্ষরতা দূরীকরণের তাঁরাই ছিলেন পথিকৃৎ।"

গৌরকিশোর সরকারের গোলাবাড়ীতে একটি পর্ণকুটিরে বিদ্যালয়টির সূচনা হয়েছিল। দশ বছর পরে নিজস্ব ভবন নির্মিত হয় শরৎচন্দ্র সরকার প্রদত্ত ষাট শতক জমির কেন্দ্রে। নবতন কলেবরে বিদ্যালয় উন্নীত ও নামাঙ্কিত হয় "ব্রাহ্মণপাড়া মিডল

ইংলিশ স্কুল।"

[এক্ষেত্রে দুটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন বলে মনে করছি :

(১) ২৬ জুলাই, ১৮৫৬ খ্রিঃ—ইংরাজ সরকার প্রবর্তিত শিক্ষাদান পদ্ধতির সুপারিশ ছিল (ক) ইংলিশ স্কুল (খ) অ্যাংলো-ভার্নাকুলার স্কুল (গ) ভার্নাকুলার স্কুল। আলোচ্য সময়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলির নামকরণ ছিল মিডল ইংলিশ, হায়ার ক্লাস ইংলিশ, হাই ইংলিশ স্কুল ইত্যাদি। এসব বিদ্যালয়ে ইংরাজী ব্যতিরেকে অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষাদান হত বাংলা ভাষায়।

(২) শ্রীরামপুর খ্যাত মিশনারী উইলিয়ম কেরী অধুনা কালের জেলা হাওড়ার বিভিন্ন গ্রামে যথা—বালি, শিবপুর, ডোমজুড়, ঝাপড়দহ, নারনা, ব্রাহ্মণপাড়া, ঝিকিরা, জয়নগর, দফরপুর, বলুহাটি-তে বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে শ্রীরামপুরকে কেন্দ্র করে উইলিয়ম কেরী, জোশুয়া মার্শম্যান ও উইলিয়ম ওয়ার্ড ১৮১৭ খ্রিঃর মধ্যে কমপক্ষে ৪৫টি পাঠশালা স্থাপন করেছিলেন।--গ্রন্থকার]

প্রথমপর্বে আলোচ্য বিদ্যালয়টির সাথে বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন মন্মথপ্রসাদ সর্বাধিকারী, মোহিতমোহন সরকার, হরিশচন্দ্র দত্ত, ব্রহ্মমোহন সরকার, ডাঃ তিনকড়ি মিত্র, রাধানাথ সরকার, ডাঃ আবুল বারি মুফতি, কাজি আবদুল ওদুদ প্রমুখ।

দ্বিতীয় পর্যায়ে জড়িত ছিলেন স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার), ভূপেন্দ্রনাথ বসু (তৎকালীন পাবলিক প্রসিকিউটর), কিরণচন্দ্র দত্ত (বিশিষ্ট ব্যবহারজীবি), রসায়নাচার্য ডাঃ চুনীলাল বসু, ফকিরচন্দ্র চৌধুরী, ননীগোপাল চৌধুরী, প্রভাসচন্দ্র মল্লিক, চণ্ডীচরণ দে, সতীশচন্দ্র দে, অনিলপ্রসাদ সর্বাধিকারী, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রমুখ।

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে শিশুশ্রেণী থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীর যে অনুমোদন ছিল তার পরিবর্তন হয় ১৯৪৯ খ্রিঃ সপ্তম শ্রেণী, ১৯৫৪ খ্রিঃ অষ্টম শ্রেণী এবং ১৯৯৬ খ্রিঃ নবম-দশম শ্রেণীতে উন্নীত হবার মাধ্যমে।

১৯৪৫ খ্রিঃ থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত যাঁরা বিদ্যালয়টির উন্নয়নের সাথে জড়িত, তাঁদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য--ডাঃ কানাইচন্দ্র সর্বাধিকারী, সুবলচন্দ্র সর্বাধিকারী, অসিতচন্দ্র সর্বাধিকারী, অচিন্ত্যরাম অধিকারী, ডাঃ পাঁচুগোপাল চক্রবর্তী, তারকচন্দ্র চৌধুরী, অমলচন্দ্র মিত্র, আশুতোষ ঘোষ, নন্দদুলাল সরকার প্রমুখ। প্রধান শিক্ষক দুলাল চন্দ্র শাসমল সহ অনেকানেক বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির বহুদিনের প্রচেষ্টায় মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত হয়েছে।

বিদ্যালয়ের ইতিহাস তো কেবল সাংগঠনিক ইতিহাস নয়, নয় কেবল পৃষ্ঠপোষক-প্রতিষ্ঠাতাদের সংগ্রাম। সেখানে শিক্ষকদের রক্ত-ঘর্ম-অশ্রুজলের কথাও যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, তা কি অস্বীকার করা চলে?

একসময় ব্রাহ্মণপাড়া এম. ই স্কুল বলতে যে দুজন আদর্শ শিক্ষককে বোঝাত তাঁরা হলেন সেকেণ্ড মাস্টার জনাব হবিবুল্লা মুফতি এবং থার্ড পণ্ডিত জিতেন্দ্র নাথ দত্ত।

জনাব হবিবুল্লা মুফতি এবং শ্রদ্ধেয় জিতেন্দ্র নাথ বাবু সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে কেবল শিক্ষকতা নয়, বিদ্যালয়ের সুদিনে দুর্দিনে, সুখে-দুখে ছিলেন চিরসাথী। যথার্থ বিদ্যালয়-বান্ধবরূপে ছিলেন শিক্ষক আশুতোষ ঘোষ, তারাপদ চক্রবর্তী, পণ্ডিত হীরালাল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। বিদ্যালয়ের প্রাচীন যুগের ছাত্র এবং পরবর্তী কালের শিক্ষক গিরীন্দ্রনাথ সরকার-এর নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। গিরীন্দ্রনাথ সরকার রূপান্তরিত হয়েছিলেন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীতে, পরম শ্রদ্ধেয় ত্রিদণ্ডী স্বামী গভস্তীনেমী মহারাজ, ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠের প্রতিষ্ঠাতা। এই প্রসঙ্গে অনুরূপ একজন শিক্ষার্থীর নাম স্মরণযোগ্য। তিনি হলেন রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী স্বামী চিৎসুখানন্দ মহারাজ—গৃহীজীবনে যাঁর নাম ছিল পরিতোষ ঘোষ, পার্শ্ববর্তী পাইকপাড়া গ্রামে পৈত্রিক আলয়।

এই বিদ্যালয় সম্পর্কে কবির ভাষায় বলতে হয়—রাত্রি শেষ হয় / তরুণ সূর্যের আলো মসৃণ গতিতে / সহস্র বর্ষের অজ্ঞানতার অন্ধকার / আর অবিশ্বাসের অচলায়তনকে চূর্ণ করে / ইতিহাস রচনা করে চলে।......

শতবর্ষব্যাপী সাধনার সৌধ / রচিত হয় অজ্ঞাতে /

গুপ্ত সাধকের মৌনতায়, / প্রবুদ্ধ হয়ে ওঠে নিঃশব্দে।" [শতাব্দীর বন্দনা : অজয় দত্ত]।

মাজু রামনারায়ণ বসু উচ্চ বিদ্যালয় (১৮৮৩ খ্রিঃ)

"প্রবাহিত কৌশিকীতটে অশ্বত্থের ছায়ায় / অশোকের ঘ্রাণে আম্র কাননে / মহানিমের স্বমহিমচ্ছায়া স্মৃতি রেখে গেছে / জীবনের অসংবৃত কিশোর বেলায়। হে বিদ্যানিকেতন! // সময়ের উজান বেয়ে কত গুণীজন/জ্ঞানালোকে চলে গেছে উদ্ভাসিত জীবন ;/পদচিহ্ন ধরে তার প্রবাহিত সাধন/স্মৃতিচিহ্ন রেখে গেছে কালের জয়যাত্রায়।"

[জয়যাত্রা : নারায়ণ ঘোষাল]

প্রাচীন কৌশিকী অধুনাকালের কানা দামোদরের তীরে তীরে একদা গড়ে উঠেছিল কত শত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের আবাসগৃহ। এঁদেরই দৌলতে একদিন জগৎবল্লভপুর অঞ্চলে দেখা দিয়েছিল নবজাগরণের আলোকরেখা। সেই আলোকরেখার উৎসে ছিল কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান—এমনই একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হচ্ছে "মাজু রামনারায়ণ বসু এন্ট্রাস ক্লাশ স্কুল"। ঐরূপ আলোকরেখার সৃষ্টিকর্তা ছিলেন ঋষিকল্প ব্যক্তি মহাপ্রাণ বরদাপ্রসাদ বসু মহাশয়।

পরাধীন ভারতবর্ষে, স্বাধীনচেতা এবং উচ্চশিক্ষিত বরদাপ্রসাদ বুঝেছিলেন, অশিক্ষা হচ্ছে দেশবাসীর প্রধান শত্রু। সুতরাং দেশগঠন তথা জাতিগঠনের জন্য সর্বাধিক প্রয়োজন শিক্ষার। শিক্ষার প্রসার যদি গ্রামে গ্রামে না ঘটে তাহলে দেশের মুক্তি, মনের মুক্তি অসম্ভব। কর্মসূত্রে প্রায় সারাভারত পরিক্রমার সুযোগ যেমন তিনি পেয়েছিলেন, তেমনিভাবে বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলাগুলিও পরিক্রমা করেছিলেন। রাজসাহী জেলায় সরকারী কাজে পরিক্রমাকালে তিনি সাগ্রহে লক্ষ্য করেছিলেন সেখানকার শিক্ষাব্যবস্থা।

সেই চিন্তাবীজ রোপিত হয়েছিল ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারী-তে স্ব-গ্রাম মাজুর বুকে। স্বর্গত পিতৃদেবের নামানুসারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করেছিলেন "মাজু রামনারায়ণ বসু এন্ট্রাস ক্লাশ স্কুল"। প্রথমাবধি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়টি অনুমোদিত হয়েছিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক।

বাইরে থেকে পাওয়া অর্থ সাহায্যের ওপর ভরসা না রেখে, নবগঠিত বিদ্যালয়ের আর্থিক নিরাপত্তা সুদৃঢ় করার জন্য সৃষ্টি করেছিলেন "মাজু রামনারায়ণ বসু ট্রাস্ট ফাণ্ড" নামীয় আর্থিক তহবিল। বরদাপ্রসাদ ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর দেওঘরের (বিহার প্রদেশ) বসতবাড়ি সমেত সমস্ত সম্পত্তি এই 'ট্রাস্ট'-কে দান করে দিয়েছিলেন। পদাধিকার বলে হাওড়ার জেলাশাসক হচ্ছেন উক্ত "বোর্ড অফ ট্রাস্টি"-র সভাপতি।

১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত শিক্ষাধারা অনুসারে বিদ্যালয়টি একাদশ শ্রেণীযুক্ত উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়েছিল। কিন্তু নব-প্রবর্তিত দ্বাদশ শ্রেণীযুক্ত (১০+২) উচ্চমাধ্যমিক স্তর প্রবর্তনের প্রথম সুযোগে বিদ্যালয়টি দ্বাদশ শ্রেণীযুক্ত বিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভে ব্যর্থ হবার ফলে কেবলমাত্র দশম শ্রেণীর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল সুদীর্ঘকালের জন্য। অবশেষে বহু প্রচেষ্টার পর ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে বিদ্যালয়টিতে উচ্চমাধ্যমিক (+২) বিভাগ চালু করা সম্ভব হয়েছিল।

বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হবার পর বহু দূরবর্তী গ্রাম থেকে ছাত্র আসতে শুরু করেছিল। কিন্তু তখন না ছিল ভালো রাস্তাঘাট, না ছিল উন্নত শিক্ষার পরিবেশ। অবশেষে বরদা প্রসাদের ভ্রাতা হরিচরণ বসুর উদ্যোগে ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো মায়ের স্মৃতিতে উৎসর্গীকৃত 'বামাসুন্দরী ছাত্রাবাস'। অনেক ছাত্র বিদ্যালয়-পরিবেশেই থাকা-খাওয়ার সুযোগ পেত। সেকালে এই প্রকার সুযোগ সুবিধা যথেষ্ট দুর্লভ ছিল।

১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত একাদশ শ্রেণীযুক্ত হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় আলোচ্য বিদ্যালয়ের ছাত্র ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নবম স্থান অধিকার করে এলাকার শিক্ষাক্ষেত্রে একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

পাঁতিহাল দামোদর ইনস্টিটিউশন (১৯১৮ খ্রিঃ)

একজন সংগ্রামশীল এবং সফল ব্যক্তির মতই একটি প্রতিষ্ঠানেরও রয়েছে সংগ্রামশীলতা এবং সাফল্যের ইতিহাস। বহু বন্ধুর পথ অতিক্রম করেছে পাঁতিহাল. দামোদর ইনস্টিটিউশন।

বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের মাঝামাঝি সময়। পাঁতিহাল এলাকার খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ শশিভূষণ দত্ত মহাশয়, তখন অদূরবর্তী জগৎবল্লভপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। শশিভূষণ বাবু যখন বিদ্যালয়ে যেতেন তখন তাঁকে অনুসরণ করত ছাত্রের দল। কিন্তু বর্ষায় পথ দুরধিগম্য হয়ে উঠত। তাছাড়া বহু ছাত্র মাঝপথেই পড়াশোনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হতো আরো নানান কারণে। এই রকম এক অবস্থায় শশিভূষণ বাবু সচেষ্ট

হলেন পাঁতিহাল গ্রামে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য। বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে পাঁতিহাল গ্রামে, বহু প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও, যথেষ্ট সুপরিবেশ ছিল। কারণ পাঠশালা ও সংস্কৃত টোল ছিল এই গ্রামে। [পাঁতিহাল চতুষ্পাঠী বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত এবং সরকার কর্তৃক অনুদানপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানরূপে দীর্ঘকাল জীবিত ছিল।] তাছাড়াও, ১৮৮২-৮৩ খ্রিষ্টাব্দে পাঁতিহালের গুমোতলায় কৃষ্ণচন্দ্র সাহার বদান্যতায় এবং গ্রামস্থ শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের উদ্যোগে "পাঁতিহাল বোর্ডস্ মডেল মিডল ইংলিশ স্কুল" নামে একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিল। এইরকম এক পরিবেশে এলাকার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শশিভূষণ দত্ত মহাশয়ের নেতৃত্বে এবং অপরাপর বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গ, যথা জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল, নদের চাঁদ মণ্ডল, দেবেন্দ্র নাথ মণ্ডল প্রমুখের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে স্থানীয় জমিদার ও বিত্তশালী ব্যবসায়ী প্রয়াত দামোদর মণ্ডলের পুত্রত্রয় ননীলাল, মাখমলাল ও মণিলাল মণ্ডল তাঁদের স্বর্গত পিতৃদেবের স্মৃতি রক্ষার্থে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য বাহাত্তর শতক জমি এবং গৃহাদি নির্মাণের জন্য লক্ষাধিক পাকা ইট দান করেন।

অবশেষে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে পাঁতিহাল দামোদর ইনস্টিটিউশন নামীয় বিদ্যালয়-গৃহের ভিত্তি স্থাপিত হয়, গৃহাদি নির্মাণের কাজ শুরু হয়।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী তারিখে বিদ্যালয়ে কর্মারম্ভ ও পঠন-পাঠনের সূচনা হয়। প্রথম দিনে প্রধান ঋত্বিকরূপে ছিলেন এলাকামধ্যে সুপরিচিত শিক্ষাবিদ অনাদি চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি. এ. মহাশয়। [ইনি পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণপাড়া চিন্তামণি ইনস্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক পদে আসীন হয়েছিলেন]। আলোচ্য বিদ্যালয়ে ১৯১৯ থেকে ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রধান শিক্ষকের পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন শিক্ষাবিদ শশিভূষণ দত্ত, বি. এ. মহাশয়। শশিভূষণ বাবুর বহু ছাত্র পরবর্তী জীবনে সুনাম ও সম্মানের অধিকারী হয়েছেন। যাহোক, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালে মণ্ডল ভ্রাতৃত্রয় এবং শশিভূষণ বাবুর প্রচেষ্টার সঙ্গে যাঁরা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত হয়েছিলেন, তাঁরা হলেন শিক্ষাবিদ অনাদি চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র চৌধুরী, নলিনীকান্ত চক্রবর্তী, সৌরীন্দ্রনাথ মণ্ডল, মাণিক চন্দ্র সিট, মৌলভী দেরুদ্দিন প্রমুখ।

১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আলোচ্য বিদ্যালয়টি দশম শ্রেণীরূপে অনুমোদিত হয়। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ব্যাচের যে শিক্ষার্থীরা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তাঁরা হলেন—আশুতোষ চ্যাটার্জী (১ম বিভাগ), পশুপতি দাস (১ম বিভাগ), কৃষ্ণচন্দ্র গোলুই, সাতকড়ি ভট্টাচার্য, রাধাকান্ত চক্রবর্তী, ইন্দ্রনাথ ঘোষ (সকলেই ২য় বিভাগ)।

১৯১৯-২০ খ্রিষ্টাব্দে যাঁরা ছিলেন শিক্ষার্থী গড়ার স্থপতিরূপে—

১। বাবু শশিভূষণ দত্ত, বি. এ. — প্রধান শিক্ষক
২। " অনাদিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি. এ. — সহ প্রধান শিক্ষক
৩। " হেমচন্দ্র চৌধুরী, বি. এ. — সহ-শিক্ষক

৪।	” নলিনীকান্ত চক্রবর্তী, আই. এ.	—	”
৫।	” সৌরীন্দ্রনাথ মণ্ডল, আই. এস. সি.	—	”
৬।	” মনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, আই. এ.	—	”
৭।	” মাণিকচন্দ্র সীট, আই. এ.	—	”
৮।	” নিতাই চরণ ঢ্যাং, ম্যাট্রিক	—	”
৯।	” রামচরণ সেনগুপ্ত, কাব্যতীর্থ	—	হেড পণ্ডিত
১০।	” মৌলভী দেরুদ্দিন, ম্যাট্রিক	—	সহঃ শিক্ষক
১১।	” বামাচরণ দত্ত, ভি. এম.	—	”

ঐ কালে বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দের সর্বাধিক বেতন ছিল মাসিক পঁচাত্তর টাকা (প্রধান শিক্ষক) এবং সর্বনিম্ন মাসিক কুড়ি টাকা (ম্যাট্রিক, ভি. এম., হেড পণ্ডিত প্রমুখের)।

[আজকের দিনের শিক্ষকরা টাকার অঙ্কে ওঁদের তুলনা করবেন না! বরং তাঁদের কর্মপ্রচেষ্টার কথাই ভাবুন।]

ব্রাহ্মণপাড়া চিন্তামণি ইনস্টিটিউশন (১৯২৩ খ্রিঃ)

ব্রাহ্মণপাড়া চিন্তামণি ইনস্টিটিউশন গড়ে উঠেছে ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯২৩ খ্রিঃ, —ঐ এলাকার শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি সাতকড়ি কুণ্ডু মহাশয়ের পিতৃদেবের নামাঙ্কিত হয়ে।

সাতকড়িবাবুর বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়েছিল নিদারুণ কষ্টের মধ্য দিয়ে—সুযোগ-সুবিধার অভাব, অনটন ইত্যাদির কারণে মনের আশা পূরণ করে শিক্ষালাভ করতে পারেননি। পরিণত বয়সে ব্যবসা-সূত্রে ধনাগম হওয়া মাত্র নিজ বাসভূমে সাতকড়িবাবু প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিদ্যালয়টি। এ বিষয়ে তাঁর প্রধান পরামর্শদাতা ও সহায়ক ছিলেন নবাসন গ্রামের ডাঃ বরদাপ্রসাদ নন্দী।

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতা সাতকড়ি কুণ্ডু কর্তৃক সম্পাদিত অর্পণনামা দলিল-সূত্রে জানা যায় যে, উক্ত বিদ্যালয়ের প্রথম পরিচালক সমিতির সদস্যবৃন্দ ছিলেন—

ডাঃ প্রমথনাথ নন্দী, এম. ডি. — সভাপতি, [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সদস্য]

বাবু সাতকড়ি কুণ্ডু — প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক,
” দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বি. এল. - সহ সম্পাদক
” মাণিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সহ সম্পাদক,
” পঞ্চানন চক্রবর্তী,
” কবিরাজ তারাপদ চক্রবর্তী — সদস্য
” হাজী বাঁকাউল্লা মল্লিক ”
” ভুবনচন্দ্র মজুমদার ”
” বাবু বরদাপ্রসাদ নন্দী ”

" শীতলচন্দ্র মল্লিক

" তুলসীচরণ মুখোপাধ্যায়, এম. এ. (প্রধান শিক্ষক)

" আবদুল আজিম মোল্লা, বি. এ. বি. টি. (শিক্ষক প্রতিনিধি)

বিদ্যালয় ভবন গঠনের প্রথম পর্যায়ে প্রতিষ্ঠাতা সাতকড়ি কুণ্ডু প্রদত্ত আড়াই বিঘা জমির ওপর একতলা গৃহাদি, পরবর্তী পর্যায়ে কৃষ্ণচন্দ্র শীট প্রদত্ত দেড় বিঘা জমির ওপর আর একটি একতলা বাটী ও শিক্ষকাবাস নির্মিত হয়। ছাত্রদের খেলার মাঠের অভাব পুরণ করে দেন হাজী বাঁকাউল্লা দেড় বিঘা জমি দানের মাধ্যমে।

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার পর সরকারী অর্থ সাহায্য না পাবার কারণে সুদীর্ঘ ১৫-১৬ বৎসর বিদ্যালয়ের যাবতীয় ব্যয়ভারের অধিকাংশ বহন করেছিলেন সাতকড়ি কুণ্ডু স্বয়ং। অবশ্য তাঁর অন্যান্য সহযোগীরাও যথেষ্ট সহায়তা করেছিলেন আর্থিক সঙ্কট দূর করার জন্য। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি এমন হলো যে, বিদ্যালয় পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে বেশী সময় ব্যয়িত হবার ফলে সাতকড়ি বাবুর নিজস্ব ব্যবসায়-বাণিজ্যে সঙ্কট দেখা দিয়েছিলো এবং নিজের আর্থিক অবস্থাও ক্রমে শোচনীয় আকার ধারণ করেছিলো। তবুও বিদ্যালয়ের কার্যভার ত্যাগ করেননি। এই রকম অবস্থায় সাতকড়িবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র মনোরঞ্জন কুণ্ডুর অকাল মৃত্যু ঘটে। এই ঘটনার তিন-চার বছর পরেই ১৪ আগষ্ট, ১৯৩৮ খ্রিঃ সাতকড়িবাবুও প্রয়াত হয়ে যান।

প্রতিষ্ঠাতা সাতকড়িবাবুর প্রয়াণের পর বিদ্যালয়টির আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। মাসের পর মাস শিক্ষকদের বেতনদান বন্ধ হয়ে যায় এবং বিদ্যালয় গৃহের ছাদও ভেঙ্গে পড়ে। এই চরমতম সঙ্কটের সময় পণ্ডিত নিত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায় বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বিদ্যালয় গৃহের পুনর্গঠন সম্ভব হয় কতিপয় দাতার অর্থসাহায্যের বিনিময়ে। এঁদের মধ্যে শীতলচন্দ্র মল্লিক — ৫০০ টাঃ, বিহারীলাল দে অ্যাণ্ড কোং — ৫০০ টাঃ, পান্নালাল দে ও সতীশচন্দ্র দে ৫০০ টাঃ প্রদত্ত অর্থ সাহায্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য কাজকর্মের তদারকি ভার গ্রহণ করেছিলেন—ডাঃ অনাদি চরণ সরকার, সতীশচন্দ্র দে, পান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ দেশহিতৈষীগণ।

প্রতিষ্ঠাতা সাতকড়ি কুণ্ডু মহাশয় ইতিপূর্বে তিন হাজার টাকা সংগ্রহ করে বিদ্যালয়ের রিজার্ভ ফাণ্ড সৃষ্টি করেছিলেন। ঐ রিজার্ভ ফাণ্ড সৃষ্টির জন্য অর্থ দান করেছিলেন রায়সাহেব অনুকূলচন্দ্র মান্না (গড়বালিয়া) ৫০০ টাঃ, রজনীকান্ত মল্লিক ৫০০ টাঃ, মণিভূষণ মল্লিক ৫০০ টাঃ, ডাঃ প্রমথনাথ নন্দী ৩০০ টাঃ, পঞ্চানন চক্রবর্তী ৩০০ টাঃ, হাজী বাঁকাউল্লা মল্লিক ৩০০ টাঃ, তিনকড়ি ঘোষ ৫০০ টাঃ। তৎসহ আরো অনেকে অল্পবিস্তর অর্থ সাহায্য করেছিলেন। এতৎসহ মাসিক অর্থ সাহায্য করেছেন অনেকেই।

১৯৪১ খ্রিঃ ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে একটি জনসভা হয় জনাকয় শিক্ষক ও প্রাক্তন ছাত্রের উদ্যোগে। ঐ জনসভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন কালীপদ সেন (মাতো নিবাসী)। সভাস্থলেই বিদ্যালয়ের কার্যকরী সমিতির সভাপতি বিধুভূষণ পালচৌধুরী — ২০০০ টাঃ

এবং কালীপদ সেন ২০০০ টাঃ দান করার ফলে সভাস্থ সুধীবৃন্দের কাছ থেকে আরও ৬০০ টাঃ দান হিসাবে পাওয়া যায়। এইভাবে আদায়ীকৃত ১০,০০০ টাকার মধ্যে ৬,০০০ টাকা রিজার্ভ ফাণ্ড এবং বাকী ৪,০০০ টাকায় তিনকামরা বিশিষ্ট গৃহ নির্মিত হয়। শেষোক্ত ৬,০০০ টাকা রিজার্ভ ফাণ্ডে সংযোজিত হবার ফলে তার মোট পরিমাণ হয় ৯,০০০ টাকা।

১৯৪৮ খ্রিঃ হতে বিদ্যালয়টি সরকারী অনুদান লাভ করতে থাকায় ক্রমেই আর্থিক সঙ্কট দূরীভূত হয়ে যায় এবং শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। পঃ.বঙ্গ সরকার প্রদত্ত ব্লক গ্র্যাণ্ট এবং স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের দ্বারা প্রদত্ত দানের ফলে গৃহাদির সংযোজন হয় প্রয়োজন মতো। স্থানীয় দাতাদের মধ্যে এই পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন প্রাক্তন ছাত্র মৃণাল কান্তি মল্লিক ও তার ভ্রাতাগণ। ১৯৬৬ খ্রিঃ খোদনময়ী বেজ নিজনামে ১৬,০০০ টাকা ব্যয়ে বালিকা বিভাগের ব্যবহারের জন্য একটি ভবন নির্মাণ করে দিয়েছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে বিগত ৭৫ বৎসরের অধিককাল ধরে বহু বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে চলেছে বিদ্যালয়টি এবং ইতিমধ্যেই সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রী এই বিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে বহিঃস্থ পরীক্ষায়। এঁদের মধ্যে অনেকেই খ্যাতকীর্তি হয়েছেন।

আলোচ্য বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বারোটি স্মৃতি বৃত্তি কিংবা স্মৃতি পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা আছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে শিবানন্দবাটী নিবাসী ডাঃ মনীন্দ্রনাথ দে প্রদত্ত "মহাদেব চন্দ্র দে এনডাউমেণ্ট"। বলা বাহুল্য, ডাঃ দে ছিলেন কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ অ্যাণ্ড হসপিটালের প্রধান অধ্যক্ষ এবং বিশিষ্ট চিকিৎসা-বিজ্ঞানী। ইনি দীর্ঘকাল বিদ্যালয়ে নিয়মিত অর্থসাহায্যের সাথে সাথে উন্নতির চেষ্টা করে গেছেন।

গড়বালিয়া রাখাল চন্দ্র মান্না ইনস্টিটিউশন (১৯৩৭ খ্রিঃ)

৪ জানুয়ারি, ১৯৩৭ খ্রিঃ।

জগৎবল্লভপুর থানার প্রায় মধ্যভাগে অবস্থিত অনুন্নত, শিক্ষাদীক্ষায় অবহেলিত জনপদের অভ্যন্তরে স্থাপিত হয় "গড়বালিয়া রাখাল চন্দ্র মান্না ইনস্টিটিউশন" নামীয় একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্থাপন-কর্তাগণ হলেন গড়বালিয়া নিবাসী "পঞ্চভ্রাতা" যথাক্রমে অনুকূল চন্দ্র মান্না, খগেন্দ্র নাথ মান্না, কানাইলাল মান্না, বলরাম মান্না ও কৃষ্ণধন মান্না। বলা বাহুল্য, অনুকূল চন্দ্র ও খগেন্দ্রনাথের পিতার নাম রাখালদাস মান্না, এবং কানাইলাল, বলরাম ও কৃষ্ণধনের পিতার নাম চন্দ্রকান্ত মান্না। স্থাপয়িতাগণ তাঁদের স্বর্গতঃ নিজ নিজ পিতৃদেবের নাম সংযুক্ত করে বিদ্যালয়টির নামকরণ করেন।

প্রতিষ্ঠাকালীন সময়েই প্রতিষ্ঠাতাগণ প্রত্যেকে নগদ দশ হাজার টাকা হিসাবে দান করে মোট পঞ্চাশ হাজার টাকার মূলধনে সৃষ্টি করে গেছেন 'রাখাল চন্দ্র মান্না ট্রাস্ট', যার বেনিফিসিয়ারী হচ্ছে আলোচ্য বিদ্যালয়টি। কেবল তাই নয়, প্রতিষ্ঠার পর থেকে

১৯৮৩-৮৪ খ্রিঃ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠাতাদের পরবর্তী প্রজন্মও বিদ্যালয়টির সমুন্নতির জন্য শ্রম ও অর্থ অকাতরে দান করেছেন।

এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির প্রথম যুগের ইতিহাস বর্ণনা করে এলাকার প্রবীণতম বিদ্যালয়-শিক্ষক বিজয় কৃষ্ণ ভট্টাচার্য (১৩০৫-১৩৯৫ সাল) লিখেছেন : "বিদ্যালয়ের প্রথম পর্যায়ে, প্রধান ঋত্বিক ছিলেন অনুকূল চন্দ্র মান্না। বিদ্যালয় গঠনের জন্য অর্থ আসত তাঁদের বড়বাজারস্থিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান থেকে, আর অর্থের প্রধান যোগানদার ছিলেন খগেন্দ্রনাথ মান্না মহাশয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে, বিদ্যালয়ের উন্নয়নমূলক কর্মের প্রধান পুরোহিত ছিলেন ডাঃ বলরাম মান্না (বি. এস. সি, এম. বি), আর ব্যবসায় সূত্রে অর্জিত অর্থ যোগানের ভার ছিল কানাইলাল মান্না মহাশয়ের ওপর। অবশ্য প্রয়োজনে স্বোপার্জিত বহু অর্থ বলরাম বাবু অকাতরে বিদ্যালয়ের জন্য ব্যয় করে গেছেন। সুদীর্ঘ বার বৎসর কাল তিনি বিদ্যালয় সচিবের গুরু দায়িত্ব বহন করে গেছেন।" (দ্র. একটি বিদ্যোৎসাহী পরিবার ও একটি বিদ্যামন্দির। সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারক পত্রিকা, ১৯৮৭ খ্রিঃ)।

বিজয়কৃষ্ণ বাবুর মন্তব্য থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, গড়বালিয়ার মান্না পরিবারের যৌথ ব্যবসা কেন্দ্র [বর্তমানে "চন্দ্রকান্ত মান্না অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ"] থেকেই বিদ্যালয়ের খরচাদির জোগান দেয়া হত। এ ব্যবস্থা বজায় ছিল ত্রিশের দশক তো বটেই আরও অনেক পরবর্তীকাল পর্যন্ত। প্রয়োজন অনুসারে ডাঃ বলরাম মান্না, কানাইলাল মান্না, প্রভাতকুসুম মান্না, ডাঃ বিভূতিভূষণ মান্না [এম. আর. সি. পি., / এফ. আর. সি.পি] ব্যক্তিগতভাবে ঐ প্রকার গুরু দায়িত্ব বহন করেছেন বহুবার।

সরকারী হিসাবানুসারে বিদ্যালয়ের কর্মারম্ভ ৪ জানুয়ারি, ১৯৩৭ খ্রিঃ, কিন্তু ১৯৩৬ খ্রিঃ পঞ্চম শ্রেণীতে বারজন ছাত্র এবং একজন শিক্ষক নিয়ে বিদ্যালয়ের সূচনা হয়েছিল। ঐ শিক্ষকের নাম বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য। তারপর ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত চালু হয়ে, প্রথমাবধি দশম শ্রেণীযুক্ত বিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, ১২ এপ্রিল ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে। ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থীগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেয়। খ্রিঃ ১৯৪২ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণের হার ছিল ১০০%।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "স্কুল কোড" অনুসারে ১০ এপ্রিল, ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতি গঠিত হয়। প্রথম পরিচালক সমিতির সদস্যবৃন্দ হলেন—

১। বাবু অশোকনাথ ভট্টাচার্য, শাস্ত্রী, এম. এ., পি. আর. এস - সভাপতি [প্রতিষ্ঠাতা প্রতিনিধি]

২। রায় সাহেব অনুকূলচন্দ্র মান্না, সহ-সভাপতি [প্রতিষ্ঠাতা প্রতিনি

৩। বাবু খগেন্দ্রনাথ মান্না — সদস্য

৪। বাবু বলরাম মান্না — সদস্য [দাতা প্রতিনিধি]

৫। বাবু কৃষ্ণধন মান্না — সদস্য

৬। বাবু ফনীন্দ্রনাথ মান্না — সেক্রেটারী [শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি]

৭। ডাঃ শচীন্দ্রনাথ মাইতি, এল. এম. এফ — সদস্য [চিকিৎসক]
৮। বাবু সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী — সদস্য
৯। বাবু শরৎচন্দ্র কর — সদস্য [অভিভাবক প্রতিনিধি]
১০। বাবু পুলিনবিহারী চক্রবর্তী, এম. এ., বি. টি. — প্রধান শিক্ষক
১১। বাবু আশুতোষ দ্বারী, সদস্য
১২। বাবু বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি. এ. [শিক্ষক প্রতিনিধি]

১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে নবপ্রবর্তিত বহুমুখী সর্বার্থসাধক একাদশ শ্রেণীযুক্ত বিদ্যালয়ে রূপান্তর ঘটে। ওয়েষ্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেণ্ডারী এডুকেশন প্রদত্ত পত্র নং ৮৪১/জি তাং ৭-১-১৯৫৭ সূত্রে হিউম্যানিটিজ গ্রুপ, পত্র নং ৮১২৯/জি তাং ২১-২-১৯৫৭ সূত্রে সায়েন্স গ্রুপ অনুমোদিত হয়েছিল। কমার্স গ্রুপ অনুমোদিত হয়েছিল পত্র নং ২৫৬৭/৯/জি তাং ২৫-৯-১৯৬৭ সূত্রে।

১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে আবার রূপান্তর ঘটে। বর্তমানে প্রচলিত একাদশ-দ্বাদশ (+ ২) শ্রেণীতে পঠন-পাঠনের অনুমোদন দেন ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ হায়ার সেকেণ্ডারী এডুকেশন, পত্র তাং ১৮ জুন, ১৯৭৬। কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য তিনটি বিভাগেই বর্তমানে পঠন পাঠনের সুচারু ব্যবস্থা আছে। উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগটি সহ-শিক্ষামূলক হলেও, মাধ্যমিক বিভাগটি কেবল বালকদের জন্য।

বিদ্যালয়ের প্রথম সভাপতি ছিলেন সংস্কৃতের প্রখ্যাত অধ্যাপক অশোকনাথ ভট্টাচার্য, শাস্ত্রী মহোদয়। অশোকনাথ বাবুর প্রয়াণের পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী, পি. আর. এস., ডি. লিট মহোদয়। গৌরীনাথজী ১৯৮৩-৮৪ খ্রিঃ পর্যন্ত বিদ্যালয়ের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করে গেছেন। তারপরে বেশ কিছুকাল সভাপতির কার্যভার গ্রহণ করেছিলেন ডাঃ বিভূতিভূষণ মান্না, এম. আর. সি. পি, / এফ. আর. সি. পি মহোদয়।

বিদ্যালয়ের প্রথম সেক্রেটারী ফণীন্দ্রনাথ মান্নার নিকট হতে কার্যভার গ্রহণ করেন ডাঃ বলরাম মান্না, এম. বি, মহোদয়। কর্মযোগী ডাঃ বলরাম মান্না-র আমলে নির্মিত হয়েছে উন্নতমানের বিজ্ঞান পরীক্ষণাগার সমূহ, ছাত্রাবাস, শিক্ষকাবাস, শ্রেণীকক্ষে প্রতিটি ছাত্রের জন্য চেয়ার টেবিল ইত্যাদি। প্রচলিত হয়েছিল এন. সি. সি ও ব্রতচারী ট্রেনিং। জল সরবরাহের জন্য নিজস্ব জেনারেটর ও পাইপ লাইন স্থাপিত হয়েছিল। সর্বতোমুখী উন্নয়নের সূচনা করেছিলেন তিনি।

ডাঃ বলরাম মান্না-র কর্মকালেই বুনিয়াদী ট্রেনিং সেন্টার (প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য) তৎসহ আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট ট্রেনিং সেন্টার (মাধ্যমিক শিক্ষকদের জন্য)—এই দুটি প্রতিষ্ঠানের সূচনা হয়েছিল বিদ্যালয় ক্যাম্পাসেই। পরবর্তীকালে বুনিয়াদী ট্রেনিং সেন্টারটি পাকাপাকিভাবে প্রখ্যাত সমাজসেবী সত্যনারায়ণ খাঁ-র উদ্যোগে জগৎবল্লভপুরে চালু হয়। অপর শিক্ষাকেন্দ্রটি অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়ে যায়, প্রয়োজনীয় অর্থ ও উদ্যোগের অভাবে।

এছাড়া, ১৯৫২-৫৩ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ গড়বালিয়া গার্লস স্কুলের সূচনা হয়েছিল বিদ্যালয় ভবনেই ডাঃ বলরাম মান্না-র নেতৃত্বে। ঐ সময়ে তাঁর সহযোগী ছিলেন রণমহল নিবাসী রাজেন্দ্রনাথ মাইতি, ভূদেবচন্দ্র মাইতি এবং বলরামবাবুর ভ্রাতা কানাইলাল, তৎসহ ভ্রাতুষ্পুত্রগণ আদিনাথ মান্না, প্রভাতকুসুম মান্না, ডাঃ বিভূতি ভূষণ মান্না, নির্মলেন্দু মান্না এবং বিদ্যালয়ের প্রবীণ শিক্ষক বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য, অমরেন্দ্র ঘোষ প্রমুখ।

বলরাম বাবুর পর বিদ্যালয় সচিবের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ডাঃ বিভূতিভূষণ মান্না, এম. আর. সি পি (এডিন) মহোদয়। বিভূতিবাবুর আমলে বিদ্যালয় গৃহাদির সম্প্রসারণ ছাড়াও পূর্ণ সময়ের জন্য বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকের পদ অনুমোদিত হয়। এতৎসহ সেন্ট জন অ্যাম্বুলেন্সের সহায়তায় প্রাথমিক চিকিৎসা শিক্ষণ কেন্দ্র চালু হয়। সুদীর্ঘকাল সহকারী শিক্ষক শ্রী সমীররঞ্জন সরকার বি. এ. (অনার্স), বি. টি. মহাশয় প্রাথমিক চিকিৎসা শিক্ষণ কেন্দ্রটি পরিচালনা করে গেছেন দক্ষতার সঙ্গে, সেন্ট জন অ্যাম্বুলেন্সের সহায়তায়।

বিভূতিবাবুর পর বিদ্যালয় সচিবপদে বৃত হন নির্মলেন্দু মান্না, এম. এ. (কমার্স) মহাশয়। এঁর আমলে বিদ্যালয়ে একাদশ-দ্বাদশ (+ ২) শ্রেণীযুক্ত উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগ অনুমোদিত হয়। এছাড়া, পূর্ববৎ বিদ্যালয় গৃহের সম্প্রসারণ ও সংস্কার সাধন সহ পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগ এবং সহপাঠ্য কর্মসূচী, বিদ্যালয় পত্রিকা প্রকাশ, বিদালয় গ্রন্থাগারের উন্নতিসাধন সহ বহুবিধ অগ্রগতি সাধিত হয়। ১৯৮৪ খ্রিঃ, বিদ্যালয় মিউজিয়ম স্থাপনের জন্য একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হবার পথে, রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের কারণে, অ্যাড হক কমিটি নিযুক্ত হয় এবং উক্ত প্রকল্প শেষতক পরিত্যক্ত হয়।

প্রকৃতপক্ষে, ইং ১৯৮৪-৮৫ সালের পর থেকে বিদ্যালয়ের উন্নতি ক্রমেই রুদ্ধগতি, স্তিমিত হতে থাকে। এই ক্ষেত্রে স্থানীয় অভিভাবক, শিক্ষার্থী, শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের নিস্ক্রিয়তাও কম দায়ী নয়।

বিদ্যালয়টির নামকরণ নিয়ে সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের কালে কতকটা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ধোঁয়াশা ও বিতর্কের সৃষ্টি করা হয়। ঐ ভ্রান্ত ধারণার অবসানকল্পে রাখালদাস মান্না ও চন্দ্রকান্ত মান্নার জীবিত অবস্থায় সম্পাদিত দুটি দলিলের সংশ্লিষ্ট অংশের প্রতিলিপি মুদ্রিত করে দেয়া গেল, যার দ্বারা বোঝা সম্ভব উভয়ের নামের আদ্য অংশটুকু সংযুক্ত করে বিদ্যালয়ের নামকরণ করা হয়েছে "রাখাল চন্দ্র মান্না ইনস্টিটিউশন"। উভয় ভ্রাতা পরলোকগমন করেন সন ১৩৩১ সালে। চন্দ্রকান্ত মান্না-র তৈলচিত্র মান্না পরিবারে যেমন আছে, তেমনি আছে বিদ্যালয়ের উত্তর-পার্শ্বে অবস্থিত "চন্দ্রকান্ত মান্না চ্যারিটেবল ডিসপেনসারী" নামীয় চিকিৎসালয়ে। রাখালদাস মান্নার বৃহৎ আলোকচিত্র রক্ষিত আছে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কক্ষে।—এই ঘটনাও হয়ত জনমানসে বিভ্রান্তি সৃষ্টির একটা কারণ হতে পারে। [রাখালদাস ও চন্দ্রকান্ত এবং তাঁদের

বংশধরদের আমলে সম্পাদিত দলিল—পরিশিষ্ট : পাঁচ দ্রষ্টব্য]।

সুদীর্ঘ ছয় দশকের বেশী সময় ধরে আলোচ্য বিদ্যালয়টি বহু কৃতবিদ্যকে বাল্যকালে লালন করেছেন। এঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ও শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার প্রাপ্ত শারীরবিজ্ঞানী ডঃ অজিতকুমার মাইতি, এম. এস. সি., এম. বি. বি. এস, ডি. ফিল (ক. বি.)। বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ দুলাল দলুই, ডাঃ শৈলেন চ্যাটার্জী, ডাঃ ললিতমোহন চ্যাটার্জী, ডাঃ কাশীনাথ মাইতি, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার পদস্থ অফিসার প্রদোষ ব্যানার্জী প্রমুখ। এছাড়া, প্রখ্যাত বাস্তুবিদ ও কলিকাতা ইনপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের চীফ ইঞ্জিনীয়ার (প্রাক্তন), সিদ্ধেশ্বর মণ্ডল এবং অধ্যাপক দিলীপ কুমার মান্না, বি. এস. সি. (ইঞ্জিনীয়ারিং), গৌতম সরকার, বি. ই. (ক্যাল) সহ আরও অনেকেই ছিলেন এই বিদ্যালয়ের ছাত্র। এখানে সকল কৃতবিদ্য ছাত্র ছাত্রীর নাম উল্লেখ সম্ভব নয়।

পাঁতিহাল বালিকা বিদ্যালয় (১৯১০ খ্রিঃ)

১৮৫৪ খ্রিঃ ২৪ মার্চ, বঙ্গদেশে শিক্ষা পরিষদের সদস্যরূপে স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে মন্তব্য করেছিলেন—"বঙ্গদেশে অসংখ্য দেশীয় ধরণের পাঠশালা আছে... অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি যে, পাঠশালাগুলির অবস্থা অতি শোচনীয়...। পাঠশালাগুলির আদর্শ স্বরূপ কতকগুলি মডেল স্কুলের ব্যবস্থা করা দরকার।... [সিলেকশনস ফ্রম দ্য রেকর্ডস অফ দ্য বেঙ্গল গভর্নমেণ্ট, নং ২২] এই সূত্র ধরে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ২১ মে, ১৮৫৪ খ্রিঃ থেকে ১১ জুন, ১৮৫৪ খ্রিঃ পর্যন্ত তৎকালীন হুগলী জেলার শিয়াখালা, রাধানগর, কৃষ্ণনগর, ক্ষীরপাই, চন্দ্রকোণা, শ্রীপুর, কামারপুকুর, রামজীবনপুর, মায়াপুর, কেশবপুর এবং পাঁতিহাল গ্রামসমূহ পরিভ্রমণ করে মডেল স্কুল [অর্থাৎ পাঠশালার উন্নত সংস্করণ] স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। বলা বাহুল্য, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরিদর্শন কৃত গ্রামসমূহ বর্তমানে তিনটি জেলার অধীনস্থ—মেদিনীপুর, হুগলী ও হাওড়া। পাঁতিহাল, ১৮৭৮ খ্রিঃ-তে—জগৎবল্লভপুর থানার একটি মৌজারূপে হাওড়া জেলাধীন হয়।

পাঁতিহাল গ্রামের কোথায় এবং কাদের পৃষ্ঠপোষকতায় উক্ত মডেল স্কুলটি স্থাপিত হয়েছিল তার ইতিহাস বিশেষ জানা যায় না। তবে বহু লোকের ধারণা বর্তমান কালের পাঁতিহাল বালিকা বিদ্যালয়টি বুঝিবা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্যোগের একটি ফসল। অপরপক্ষে সাম্প্রতিককালের একটি তথ্যসূত্রে জানা যাচ্ছে, ১৯১০ খ্রিঃ-তে পাঁতিহাল গ্রামের যোগেশচন্দ্র মজুমদার, রমেশচন্দ্র মজুমদার, শিক্ষাবিদ শশীভূষণ দত্ত, কালোশশী ঘোষাল প্রমুখের উদ্যোগে পাঁতিহাল বালিকা বিদ্যালয়ের সূচনা হয়।

প্রথমাবস্থায়, মাত্র পাঁচজন ছাত্রী নিয়ে ডাঃ যোগেশচন্দ্র মজুমদারের ডাক্তারখানার একাংশে বিদ্যালয়টির কর্মারম্ভ হয়। সূচনাকাল থেকে অর্থাৎ ১৯১০ খ্রিঃ থেকে ১৯১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত হরিদাস মুখোপাধ্যায় এককভাবে শিক্ষকতার দায়িত্ব বহন করেন। তারপর

যুক্ত হন মাখনলাল কোলে এবং অজিত সরকার। পাঁতিহালের প্রখ্যাত দে-বিশ্বাস পরিবারের বাটীতে একদা বিদ্যালয়টি আশ্রয় লাভ করেছিল। সুতরাং বর্তমানকালের পাঁতিহাল বালিকা বিদ্যালয়টি স্থাপনের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয় অথবা শ্যামাচরণ দে বিশ্বাসের ভূমিকা থাকা সম্ভব নয়, কারণ বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রয়াত হয়েছেন ২৪ জুলাই, ১৮৯১ খ্রিঃ এবং শ্যামাচরণ প্রয়াত হন জুলাই, ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে। তবে এঁদের চিন্তা-বীজ, কর্মোদ্যোগ বিফল হয়নি। পাঁতিহাল বালিকা বিদ্যালয়ের অর্থসঙ্কট মেটানোর জন্য, ইং ১৯৪৬ সালে প্রখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা দেব সাহিত্য কুটিরের মালিক সুবোধচন্দ্র মজুমদার এবং তাঁর ভাইয়েরা দুজন শিক্ষকের বেতনের আর্থিক দায়ভার গ্রহণ করেন।

১৯৫০-এর দশকে মাধ্যমিক স্তরের পঠন-পাঠনের জন্য বহু গ্রামবাসী আর্থিক অনুদান দেন। ১৯৫৫ খ্রিঃ পঞ্চম শ্রেণী, দু'বছর পরে সপ্তম শ্রেণী, ১৯৫৮ খ্রিঃ তে অষ্টম শ্রেণী, ১৯৬৪ খ্রিঃ প্রচলিত একাদশ শ্রেণীতে উন্নীত হলেও বর্তমানে দশম শ্রেণীযুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়। [দ্র. গণমুখ, জগৎবল্লভপুর, মার্চ, ৮৪]

আলোচ্য বালিকা বিদ্যালয়টি এলাকা মধ্যে যথেষ্ট প্রাচীন, তথাপি এর উন্নতির হার আশানুরূপ নয়। প্রয়োজনীয় ক্লাসরুমের অভাব, খেলাধুলার মাঠের অভাব, উন্নত মানের গ্রন্থাগারের অভাব অত্যন্ত পীড়াদায়ক। বহু অসুবিধা সত্ত্বেও পাঁতিহাল, বাঁকুল, যদুপুর, এবং নিকটবর্তী অন্যান্য অঞ্চল থেকেও বহু বালিকা পাঠগ্রহণের জন্য বিদ্যালয়টিতে আসে। এলাকার বালিকাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে পাঁতিহাল বালিকা বিদ্যালয়ের ভূমিকা আজও নিতান্ত নগণ্য নয়। ছাত্রীদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তী জীবনে কৃতিত্বের সঙ্গে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছে।

রুরাল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, মাজু

১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে মাজুতে স্থাপিত হয়েছিল "রুরাল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ"। কলেজটি উদ্বোধন করেছিলেন কাশিম বাজারের মহারাজা শ্রীশ চন্দ্র নন্দী। কলেজটি স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রধানতম উদ্যোক্তা ছিলেন মাজুর সুসন্তান অধ্যাপক সুধাংশু কুমার বসু। বলা বাহুল্য, অধ্যাপক বসু হচ্ছেন ধানবাদস্থিত (বিহার) "ইণ্ডিয়ান কলেজ অফ মাইনস্"-এর প্রথম ভারতীয় অধ্যাপক এবং প্রথম ভারতীয় অধ্যক্ষ। দুঃখের বিষয়, সেদিন গ্রাম বাঙলার বুকে স্থাপিত রুরাল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজটির গুরুত্ব বিশেষ কেউ বুঝতে পারেনি, তাই প্রয়োজনীয় সংখ্যক ছাত্রের অভাবে অল্প কয়েক বৎসর পরেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি চিরতরে বন্ধ হয়ে যায় এবং একটি মহতী উদ্যোগ অকালে বিনষ্ট হয়। অথচ পিতল ঢালাইয়ের কাজ শেখাবার জন্য বেঙ্গল গভর্নমেণ্টের সহায়তায় এই কলেজে একটা কারখানা স্থাপন করাও হয়েছিল।

অনুরূপ উদ্যোগ এই অঞ্চলে আর কখনও দেখা যায়নি, অথচ তার প্রয়োজনীয়তা বর্তমানে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

গ্রন্থাগার

মাজু পাবলিক লাইব্রেরী (১৯০২ খ্রিঃ)

'শিক্ষা' হচ্ছে সমগ্র জীবন ব্যাপী এক বিশেষ প্রক্রিয়া। স্বাধীনভাবে জ্ঞান অর্জনের অন্যতম সহায়ক প্রতিষ্ঠান হচ্ছে গ্রন্থাগার।

১৮৪১ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার বিদ্যালয়ে পাঠাগার স্থাপন, গ্রন্থাগারিক নিয়োগ বিষয়ে কিছুটা আগ্রহ দেখায়। ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে সীমিতভাবে, চাঁদার বিনিময়ে জনসাধারণের ব্যবহারের কথা ভাবলেও, কিন্তু এসব প্রচেষ্টার কোন প্রভাব গ্রামাঞ্চলে তখনও পড়েনি। উনিশ শতকের সত্তর দশকের প্রায় মধ্যভাগ থেকে হাওড়া জেলার বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় উদ্যোগীদের দ্বারা গ্রন্থাগার স্থাপিত হতে শুরু করে। আলোচ্য এলাকায় তার প্রভাব পড়ে বিংশ শতকের সূচনায়।

একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রন্থাগার স্থাপনের বিষয়টি বিচার করা যেতে পারে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে হাওড়া জেলায় গ্রামের সংখ্যা ছিল ১,৪৪১ (দ্র. ভিলেজ ডাইরেক্টরী অফ দি প্রেসিডেন্সী অফ বেঙ্গল, ভল্যুম ৬-হাওড়া) ঐ সময়ে দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলে মাত্র পাঁচটি গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছিল! এই বিচারে "মাজু পাবলিক লাইব্রেরী" স্থাপনা এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

মাজু গ্রামে গ্রন্থাগার স্থাপনার প্রাথমিক ক্ষেত্র, বোধ করি, প্রস্তুত হয়েছিল ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে।

১ অক্টোবর, ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে বাবু অক্ষয় কুমার দাস [কোলে], বাবু হরলাল মজুমদার প্রমুখের মেধা, তৎপরতা ও আন্তরিকতার দ্বারায় সূচনা হয়েছিল জন জাগরণের। পরবর্তীকালে সহযোগীরূপে যুক্ত ছিলেন বাবু নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বাবু রণধীর চট্টোপাধ্যায়, বাবু নারায়ণচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ।

মাজু পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা বিষয়ে কার্যকরী সমিতির একটি প্রতিবেদন সূত্রে জানা যাচ্ছে-- Immediately after the establishment of schools in these villages, the reading public felt the necessity of circulating libraries to supplement the schools and to supply them with sufficient food for the intellect.

It was to meet this crying demand of the public, that Babu Akshay Kumar Das (Koley), the late Babu Narendra Nath Bhattacherjee and some other young man of Madju, by dint of unflagging zeal and disinterested co-operation, got up a collection of books hardly sufficient to fill an almirah, and put upon it in the name of "The Maju Public Library" in October, 1902.

অপরপক্ষে "মাজু পুরোধা সাহিত্য সংসদ"-এর মুখপত্রে ("লিখন") "মাজুগ্রাম" শীর্ষক প্রবন্ধে জীবন ঘোষাল, "মাজু সাধারণ পাঠাগার" সম্পর্কে লিখেছেন : "জ্ঞান চর্চার পীঠভূমিরূপে 'মাজু সাধারণ পাঠাগার' মাজুর মাটিতে এক তীর্থ। এই তীর্থের

প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হরলাল মজুমদার ও অক্ষয় কুমার কোলে। ইং ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে পাঠাগারটি প্রতিষ্ঠিত হয়। একটি পরিচালক সমিতির তত্ত্বাবধানে পাঠাগারটির বাল্য, কৈশোর ও যৌবন অতিবাহিত হয়। মাজু সাধারণ পাঠাগারের পরিচালক সমিতির সভ্য ছিলেন রণধীর চট্টোপাধ্যায়, নারায়ণচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি মাজুর গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ। প্রতিষ্ঠাকাল হইতে হরলালবাবু ছিলেন মাজু সাধারণ পাঠাগারের প্রাণপুরুষ। তাঁহারই নিষ্ঠা, সেবা ও যত্নে মাজু সাধারণ পাঠাগার হাওড়া জেলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পাঠাগারে পরিণত হয়। যতদিন মাজু সাধারণ পাঠাগার থাকিবে হরলালবাবুর কৃতিত্বের স্বাক্ষর মাজুগ্রামে উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে।"

এবার অধ্যাপক গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত "মাজু পাবলিক লাইব্রেরী"র "প্রথম পঁচিশ বছর" শীর্ষক প্রবন্ধের মূল্যবান অংশটি পরিবেশন করছি ঃ—

"প্রথমে লাইব্রেরীর কাজ চলে বিভিন্ন ব্যক্তির সদরে। অনুজাচরণ মজুমদারের বাড়ীতেও দীর্ঘদিন এইভাবে চলে। ইং ১৯১৩ সালের ১৮ মে, তৎকালীন হাওড়া জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডি. সি. প্যাটারসন, আই. সি. এস. কর্তৃক গ্রন্থাগার ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়।" ভিত্তিপ্রস্তরের লিপির পাঠ : "This stone was laid / by Mr. D. C. Patterson / on May 18th, 1913." গ্রন্থাগারের একটি প্রতিবেদনেও ঐ বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে : Mr. D. C. Patterson Esq. I.C.S., District Magistrate of Howrah who took the chair, laid with his characteristic zeal and energy the foundation stone in the presence of many men of light and leading the elite of the District of Howrah, amidst the acclamations of the audience.

গ্রন্থাগার গৃহের জন্য জমি দান করেছিলেন রামলাল মজুমদার, হরলাল মজুমদার, কালীপদ মজুমদার ও অমূল্যচরণ মজুমদার। বলা বাহুল্য, হরলাল মজুমদার তৎকালে গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব এবং গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

সেপ্টেম্বর, ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে স্যার তারকনাথ পালিতের পরামর্শে লিটারারি সোসাইটি রূপে গ্রন্থাগারটি রেজেষ্ট্রীকৃত হয়। এই ঘটনা সম্পর্কে ইং ১৯১৩ সালে গ্রন্থাগার সচিব রণধীর চট্টোপাধ্যায় লিখিত প্রতিবেদন হচ্ছে : To secure the growing property of the library in books and stock, and to give it a legal status, the chief promoters of the Library were advised by Sir T. .N. Palit, KT. D. L., Bar-at-Law, to get it duly registered. Accordingly in Sept 1911, it was duly registered as a Literary Society under Act XXI of 1860.

এই ঘটনাসূত্রে বোঝা যাচ্ছে যে, ঐ সময়ে মাজু পাবলিক লাইব্রেরীর পরিচয় গ্রামের গণ্ডী ছাড়িয়ে বহুদূর প্রসারিত হয়েছিল। বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি যথা, জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর, জলধর সেন, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, বিনয় সরকার,

বরদাপ্রসাদ বসু, চুনীলাল বসু (রসায়নাচার্য), দুর্গাদাস লাহিড়ী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, মহারাজ মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী, যতীন্দ্র মোহন বাগচি প্রমুখ মাজু পাবলিক লাইব্রেরী-তে গ্রন্থাদি উপহার দিয়েছিলেন।

ইং ১৯২৯ সালে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের স্মৃতিতে অষ্টাদশ বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল মাজু পাবলিক লাইব্রেরীর উদ্যোগে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে মাজুর সুসন্তান ডঃ সুবোধ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম. এ., ডি. লিট (পারী) সমাগত সুধীবৃন্দকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। ঐ অধিবেশনে মূল সভাপতি ছিলেন দীনেশচন্দ্র সেন। সাহিত্যশাখার সভাপতি ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম. এ., ডি. এল. ; ইতিহাস শাখার সভাপতি ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, এম. এ., পি. এইচ. ডি. ; দর্শন শাখার সভাপতি ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, এম. এ., পি. এইচ. ডি. ; বিজ্ঞান শাখার সভাপতি ডঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম. ডি. প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া, ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে মাজুতে অনুষ্ঠিত হাওড়া জেলা শিক্ষক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী।

মাজু পাবলিক লাইব্রেরীতে রয়েছে বহু প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তকাদি এবং বেশ কিছু পরিমাণ সংস্কৃত পুঁথি। সংস্কৃত পুঁথিগুলির মধ্যে রয়েছে—বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধবিধি, প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা, দায়ভাগ, দান খণ্ড, লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্রসার, ইত্যাদি। পুঁথিগুলির লিপিকাল হল ১৬৩৩ শকাব্দ থেকে ১৭৫৬ শকাব্দ (= খ্রিঃ ১৭১১ থেকে ১৮৩৪)। দুঃখের বিষয়, এ সকল পুঁথির কোন 'ক্যাটালগ' নেই। আরও আশ্চর্যের বিষয় পূর্ণ সময়ের গ্রন্থাগারিক জহরলাল বেরা অবসর গ্রহণের পর দীর্ঘকাল বাদে "ডেপুটেশনে" সপ্তাহে তিনদিনের জন্য গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করা হয়েছে। অথচ স্থানীয়ভাবে গ্রন্থাগারিকতা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ব্যক্তি রয়েছেন। বর্তমানে মাজু লাইব্রেরীর দীর্ঘদিনের সাথী বিশ্বনাথ ব্যানার্জী একমাত্র কর্মী! সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত, এলাকার প্রাচীনতম গ্রন্থাগারটির এহেন দুর্দশা কবে ঘুচবে? স্মরণ রাখা উচিত, অচিরকালের মধ্যেই শতবর্ষ অতিক্রম করবে গ্রন্থাগারটি।

সবুজ গ্রন্থাগার (১৯৪৫ খ্রিঃ), নিজবালিয়া

'সবুজ গ্রন্থাগার' আদিতে ছিল "সবুজ সঙ্ঘ" নামীয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার শাখা। সবুজ সঙ্ঘ তথা সবুজ গ্রন্থাগার-এর সৃষ্টিকর্তা হলেন নিজবালিয়ার ভূমিপুত্র (ডঃ) অজিতকুমার মাইতি, যিনি পরিণত জীবনে ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শারীর বিজ্ঞানী।

১৯৪৩ খ্রিঃ-তে খান পঁচিশেক বই নিয়ে সবুজ সঙ্ঘের কার্যারম্ভ হয়েছিল নিজবালিয়ায়, কবিরাজ মাণিকলাল মাইতির কবরেজখানার এক কোণায়। বই থাকত তখন দু'খানা ঝোড়ায়! বইয়ের সংখ্যা বাড়তে থাকায় বৃদ্ধ মাণিকলাল মাইতি তাঁর একখানি আলমারি ব্যবহার করতে দেন। অজিতকুমারের মাতুল ডাঃ (ক্যাপ্টেন) প্রফুল্ল কুমার বেরা প্রথমাবস্থায় কিছু বইপত্র দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। সে সময় কলেজ ছাত্র

অজিতকুমারের সঙ্গী ছিল সনৎকুমার মাইতি, গুরুদাস মুখোপাধ্যায় সহ জনাকয় সোৎসাহী সমবয়সী।

সন ১৩৫১ বঙ্গাব্দ, ২৫ বৈশাখ—আনুষ্ঠানিকভাবে সবুজ সঙেঘর উদ্বোধন কার্য সম্পন্ন করেছিলেন 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদক সুধাংশু চট্টোপাধ্যায়। তখন নিজবালিয়ার মাইতি পরিবারের এজমালী সম্পত্তিভুক্ত একটি ছোট্ট মাটির প্রায় ভগ্ন ঘরে গ্রন্থাগারের কাজকর্ম চলত। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ খ্রিঃ-র মধ্যে আশপাশের অনেক যুবক কর্মী—[নির্মলেন্দু মান্না, হারাধন সামন্ত, পরেশ মান্না (সকলেই গড়বালিয়া নিবাসী), যতীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ললিত চট্টোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মদন পাল (সকলেই নিজবালিয়া নিবাসী), প্রভাত ব্যানার্জী (রণমহল), পঞ্চানন সিংহ (বাদেবালিয়া). প্রসাদ চন্দ্র ঘড়া (ইছাপুর) প্রমুখেরা] এই প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই আজও দৃঢ়ভাবে যুক্ত আছেন।

খ্রিঃ ১৯৫৭ সালে সবুজ সঙেঘর ব্যবস্থাপনায় হাওড়া জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিক দপ্তরের প্রধানা তপতী রায়-এর উদ্যোগে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে নিজবালিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একমাসব্যাপী "হাওড়া জেলা যুবশিবির"-এর কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছিল। হাওড়া জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা পঞ্চাশজন যুবক ঐ শিবিরে হাতেকলমে সমাজসেবার ট্রেনিং নিয়েছিলেন। ঘটনাচক্রে বর্তমান গ্রন্থকার ঐ শিবিরের সদস্য ছিলেন।

হাওড়া জেলা যুব শিবির উদ্বোধন করেছিলেন ডঃ ধীরেন্দ্র মোহন সেন, আই. এ. এস. (তদানীন্তন রাজ্য সরকারের শিক্ষাসচিব)। যুব শিবির উপলক্ষ্যে সবুজ সঙঘ পরিদর্শন করেছিলেন ডঃ সেন ব্যতিরেকে হাওড়া জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, হাওড়া সদর মহকুমা শাসক, পঃ বঃ সরকারের শিক্ষা দপ্তর ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের উচ্চ আধিকারিকবৃন্দ। এই সকল ঘটনার পুরোভাগে যেমন ছিলেন অজিতকুমার ও তাঁর সঙ্গীসাথীরা তেমনি নেপথ্যে ছিলেন গড়বালিয়ার কানাইলাল মান্না ও তাঁর পরিবারবর্গের ডাঃ বলরাম মান্না, ডাঃ বিভূতিভূষণ মান্না প্রমুখ। নিজবালিয়ায় হাওড়া জেলা যুব শিবির-এর কার্যক্রম সফল করে তোলার জন্য নেপথ্যে আরও অনেকে ছিলেন—কৃষ্ণধন মাইতি, নৃসিংহমুরারী মাইতি, মন্মথ ঘোষ, পুলিনবিহারী মাইতি সহ স্থানীয় কর্তাব্যক্তিগণ।

প্রতিষ্ঠানটি অবশেষে নিজস্ব গঠনতন্ত্র বা সংবিধানসহ নিবন্ধভুক্ত হয় "সবুজ গ্রন্থাগার" শিরোনামে। সবুজ সঙঘ লুপ্ত হয়ে যায় কালগর্ভে। সংবিধান রচনা করেছিলেন ডঃ অজিতকুমার মাইতি।

"সবুজ গ্রন্থাগার", পঃ বঃ সরকারের গ্রামীণ গ্রন্থাগার প্রকল্পভুক্ত হয় স্বল্পকালের মধ্যেই। এই ঘটনার পিছনে সর্বাধিক অবদান ছিল পূর্বোক্ত তপতী রায় মহাশয়ার। গ্রামীণ গ্রন্থাগার স্কীম অনুযায়ী প্রথম গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হয়েছিলেন পাইকপাড়া নিবাসী সন্তোষ কুমার পাল এবং সাইকেল পিওন রূপে ছিলেন নিজবালিয়ার বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিপূর্বে বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘ দশ-বার বছর ধরে দক্ষতার সঙ্গে

সবুজ সঙ্ঘ-র গ্রন্থাগারিকের কাজ চালিয়েছিলেন মাত্র দশ টাকা বেতনে! যাহোক, তখন গ্রামীণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের বেতন ছিল মাসিক ৭৫ টাকা, সাইকেল পিওন ৪০ টাকা এবং কন্টিনজেন্সী ছিল মাসিক ৫০ টাকা। সুদীর্ঘকাল এই অবস্থায় কেটেছে।

বৃহত্তর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে সবুজ গ্রন্থাগারের বিশেষ অবদান হচ্ছে—গ্রন্থাগার ভাবনা কেন্দ্রিক প্রদর্শনী, পুঁথি ও প্রত্নবস্তু সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ইত্যাদি। ইং ১৯৫৪-৫৫ থেকে ১৯৭২-৭৩ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর স্থানীয়ভাবে প্রদর্শনী আয়োজিত হয়েছে। এছাড়া বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন উপলক্ষ্যে সম্মেলন স্থলেও কমপক্ষে ছ'বার এবং কলকাতায় (মার্কাস স্কোয়ারে) বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন উপলক্ষ্যে একমাস ব্যাপী "প্রদর্শনী" আয়োজিত হয়েছে সবুজ গ্রন্থাগারের তরফে। ঐ প্রকার প্রদর্শনীর একটি তালিকা দেয়া গেল—

	বিষয়বস্তু	স্থান	তারিখ
১.	আপনি ও আপনার গ্রন্থাগার	সিদ্ধেশ্বরী মহাবিদ্যালয়, শ্যামপুর, হাওড়া।	৩০, ৩১ মে ১৯৬৫ খ্রিঃ
২.	সমাজ ও গ্রন্থাগার	রাজেশ্বরী ইনস্টিটিউশন, দ্বারহাট্টা, হুগলী।	১১, ১২, ১৩ ফেব্রুঃ ১৯৬৬ খ্রিঃ
৩.	রবীন্দ্রনাথের "লাইব্রেরী"	শ্রীখণ্ড উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বর্ধমান।	২১, ২২, ২৩ এপ্রিল, ১৯৬৭ খ্রিঃ
৪.	অনুভূতির আলোকে গ্রন্থাগার	বালুরঘাট, পশ্চিম দিনাজপুর।	২৪, ২৫, ২৬ মে ১৯৬৮ খ্রিঃ
৫.	সভ্যতা ও গ্রন্থাগার	জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরী, উত্তরপাড়া হুগলী।	৪, ৫, ৬ এপ্রিল, ১৯৬৯ খ্রিঃ
৬.	গ্রন্থাগার আপনার জন্য কি করতে পারে?	হরিপদ সাহিত্য মন্দিব, পুরুলিয়া শহর।	১২, ১৩, ১৪ ফেব্রুঃ, ১৯৭১ খ্রিঃ

শেষোক্ত প্রদর্শনীটির জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ দুইশত টাকা অনুদান দিয়েছিলেন--পরে পরিষদের সৌজন্যে প্রদর্শনীটি বহু জায়গায় দেখানো হয়েছিল।

ঐ সকল বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠানে সভাপতিরূপে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ সহ গ্রন্থাগার জগতের অজস্র লব্ধপ্রতিষ্ঠ কর্মীর প্রশংসা অর্জন করেছিল পূর্বোক্ত প্রদর্শনীসমূহ। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ নির্মলকুমার বসু, শৈল কুমার মুখোপাধ্যায় (পঃ বঃ সরকার, অর্থমন্ত্রী), রবীন্দ্রলাল সিংহ (পঃ বঃ সরকার, শিক্ষামন্ত্রী), প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (রবীন্দ্র জীবনীকার, বিশ্বভারতী), বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (গ্রন্থাগারিক, বিশ্বভারতী), ডঃ সুবিমল কুমার মুখোপাধ্যায়, অজিত কুমার মুখোপাধ্যায় (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়), বিশিষ্ট বিজ্ঞানী বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায়, তৎসহ জাতীয় গ্রন্থাগারের উচ্চপদস্থ গ্রন্থাগারিকবৃন্দ। 'আনন্দবাজার পত্রিকা' সহ বহু দৈনিকপত্রে

প্রদর্শনী-সংবাদ আলোচিত হয়েছিল ঐ সময়ে। রবীন্দ্রনাথের "লাইব্রেরী" শীর্ষক প্রদর্শনীটি দেখে বিমুগ্ধ বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্বভারতী থেকে এক পত্রে গ্রন্থগার সচিবকে লিখেছিলেন : "আপনাদের প্রদর্শনীর প্রশংসা নানান কাগজে দেখেছি। দেখেশুনে মনে হয়েছে, আপনাদেরটাই এ বছরে বিশিষ্টগুলোর মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য। এতে আমি খুব খুশী হয়েছি। আপনারা যে এত চিন্তা করে জিনিসটি খাড়া করেছেন তার জন্য সাধুবাদ পাবারই কথা।" ...... আশা করি ভবিষ্যতে আপনাদের আরো অনুরূপ প্রচেষ্টা দেখবার সৌভাগ্য হবে।" [পত্র তাং ১৭-০৬-৬৭। বর্তমান গ্রন্থকার ঐ সময়ে ছিলেন গ্রন্থাগার সচিব।]

প্রদর্শনীর আয়োজন চিরতরে বন্ধ করে দিতে হয়েছিল ৩টি কারণে--(১) সবুজ গ্রন্থাগারের পরিচালকবৃন্দের বিরূপ মনোভাব, ঈর্ষা (২) ব্যক্তিগত অর্থাভাব, (৩) উদ্যোগের অভাব ও উপযুক্ত কর্মীর অভাব। বলা বাহুল্য, প্রদর্শনীর ৯৯% ব্যয়ভার বহন করতেন মাত্র দুজন ব্যক্তি—(ক) প্রদর্শনীর নির্দেশক ও প্রযোজক নির্মলেন্দু মান্না, (খ) প্রধান সংগঠকরূপে বর্তমান গ্রন্থকার। অপরাপর স্বেচ্ছাসেবী কর্মী ছিলেন শিল্প নির্দেশক বৈদ্যনাথ মাইতি। এছাড়া মনোরঞ্জন জানা, বিমল কুমার মাইতি, মানব মোহন মিশ্র প্রমুখ বিভিন্ন সময়ে সবুজ গ্রন্থগারের বেতনভোগী কর্মীবৃন্দ অংশ নিয়েছেন।

প্রদর্শনীর ক্ষেত্র রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর শুরু হয়েছিল প্রত্নবস্তু ও পুঁথি, পুরাতন দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, নির্দেশ গ্রন্থাদি সংগ্রহের কাজ। সবুজ গ্রন্থাগারের স্বেচ্ছাসেবী কর্মীরূপে ঐ সময় বর্তমান গ্রন্থকার অধ্যাপক ডঃ দুলাল চৌধুরী (অ্যাকাডেমি অফ ফোকলোর) এবং শ্রী তারাপদ সাঁতরা (আনন্দ নিকেতন কীর্তিশালা, নবাসন, বাগনান)-র পরামর্শে সবুজ গ্রন্থাগারে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত পুরাবস্তু-আদি সহযোগে "প্রদর্শনীশালা" চালু করার চেষ্টা করেন। ফলে বেশ কিছু পরিমাণ পোড়ামাটির নিদর্শন, একটি মূল্যবান সূর্যমূর্তি, কিছু পুরাতন পঞ্জিকা, নথি ও পুঁথি সংগৃহীত হয়। এ সকল দ্রব্যাদি সংগ্রহের ক্ষেত্রে সাইকেল পিওন মানব মোহন মিশ্র-র অবদান অনস্বীকার্য। ঐ সকল পুরাবস্তুর মধ্যে আছে--

(১) স্থানীয় কুমারপুরের (জে. এল. নং ৬০) দ্বারী পরিবারের পরিত্যক্ত দোল বা রাসমঞ্চের পোড়ামাটির মূর্তি (১ মিটার উচ্চতাযুক্ত), যথা (ক) দ্বারপাল, (খ) কমলধারী নারী (গ) বংশীবাদক পুরুষ, (ঘ) কাঁসর বাদনরত নারী (ঙ) সাহেবী পোষাক ও জুতা পরিহিত বন্দুকধারী (চ) জপ-ধ্যানরত মহন্ত (ছ) হরিনাম সঙ্কীর্তনরত পুরুষ।

(২) পাঁতিহাল (জে. এল. নং ৪৯) হাটতলার নিকটবর্তী ভগ্ন ও পরিত্যক্ত শিবমন্দিরের 'বৃষবাহন শিব'—পোড়ামাটির ফলক।

(৩) রামেশ্বরপুর (জে. এল. নং ২২) মিত্র পরিবারের পরিত্যক্ত ও ভগ্ন শিবমন্দির গাত্রে নিবদ্ধ পোড়ামাটির ফলকাদি, রামায়ণ যুদ্ধ দৃশ্য ইত্যাদি।

(৪) জঙ্গলপাড়া (জাঙ্গীপাড়া থানা, হুগলী) গ্রামের পরিত্যক্ত মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপি— "শ্রীশ্রীহরিঃ সন ১১৮১ সাল / সুভমস্তু সকাবদা ১৬৯৬ সক"।

(৫) চোঙঘুরালি (জে. এল. নং ৩৮) মৌজা থেকে বৃন্দাবন ঘোষ মহাশয়ের সংবাদের ভিত্তিতে সংগৃহীত হয় দুষ্প্রাপ্য সূর্যমূর্তি। মস্তকবিহীন ও ক্ষয়িত হলেও হাওড়া জেলায় এ ধরণের প্রস্তর ভাস্কর্যের নিদর্শন দু-তিনটির বেশী মেলেনি।

প্রাচীন পঞ্জিকাগুলি দান করেছিলেন প্রবীণ শিক্ষক নিজবালিয়ার বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য। পঞ্জিকাগুলির প্রকাশকাল শকাব্দ ১৭৮৫, ১৭৮৭, ১৭৯১, ১৭৯৫, ১৭৯৮, ১৮০০, ১৮০১, এবং ১৮০৮ (অর্থাৎ ১৮৬৩ খ্রিঃ থেকে ১৮৮৬ খ্রিঃ)। এছাড়া রয়েছে বেশ কিছু ভাগবত, রামায়ণ, চণ্ডী, কথকতার ছাপা পুঁথি, তালপাতায় ছাপা চণ্ডী এবং দায়ভাগ, ব্যাকরণ, তিথিতত্ত্ব জাতীয় পুঁথি—তুলট কাগজে লিখিত।

ঘটনাচক্রে ১৯৮০ খ্রিঃ-র পর থেকে বর্তমান গ্রন্থকারের সঙ্গে সবুজ গ্রন্থাগারের বিচ্ছেদ ঘটে যায়। অতীব দুঃখের বিষয়, বর্তমানে পোড়ামাটি ও প্রস্তর মূর্তিসমূহ কুৎসিৎভাবে দেয়ালগাত্রে নিবদ্ধ করা হয়েছে সিমেন্ট-বালি সহযোগে; পুঁথিগুলির অবস্থাও সঙ্গীন। পুঁথি সমূহের অবর্ণনীয় দুর্দশা দেখে, সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারিক বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত "শচীদেবী স্মারক বক্তৃতা"র কথা মনে পড়ছে ঃ "....পল্লী বাংলার অপরিচিত কুটিরে বাঙালীর প্রেম, ক্রোধ, ঘৃণা, আশা-নিরাশা নিয়ে বাংলায় রচিত যে পুঁথিগুলো আমাদের অজ্ঞাত অবস্থায় পড়ে রয়েছে, তার দিকে নজর দেবার দায়িত্ব কার? পল্লী বাংলার জনশিক্ষায় যাঁদের মুখ্য ভূমিকা ছিল তাঁদের নিভৃত প্রস্তুতির স্বাক্ষর যে সব পুঁথিতে আছে, সেগুলো উদ্ধার করবে কে?"

হায়! পুঁথি উদ্ধারের পরও যে তা পরিত্যক্ত জঞ্জালের সামিল হয়, তার প্রমাণ সবুজ গ্রন্থাগাব রেখেছে দক্ষতার সঙ্গে। শুধু পুঁথি নয়, সন্ধানী পুস্তক বিভাগটির অবস্থাও সঙ্গীন। সন্ধানী পুস্তক বিভাগটি-র সূচনা হয়েছিল ডাঃ বিভূতিভূষণ মান্না এবং বর্তমান গ্রন্থকারের যৌথ উদ্যোগে। ডাঃ বিভূতিভূষণ মান্নার মৃত্যুপথযাত্রী মায়ের নির্দেশ ছিল গ্রামের শিক্ষার্থীদের হিতার্থে যেন কিছু দান-ধ্যান করা হয়। সেই অর্থের দ্বারায় সবুজ গ্রন্থাগারে বেশ কিছু পরিমাণ 'নির্দেশ গ্রন্থ' খরিদ করা হয়েছিল, যার মধ্যে অনেকগুলি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। ঐভাবে সংগৃহীত 'নির্দেশ গ্রন্থ' সমূহ "সুশীলাবালা মান্না সংগ্রহ" নামে চিহ্নিত আছে।—বর্তমানে অবহেলিত, কীটদষ্ট দশা দেখে দুঃখ সম্বরণ সম্ভব? বাংলা ভাষায় লেখা দুষ্প্রাপ্য "শিশুভারতী" গ্রন্থের নয়টি খণ্ড সংগৃহীত হয়েছিল হাওড়া জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিকা চারুশীলা বোলারের সৌজন্যে। পাঠকক্ষের টেবিল চেয়ার ইত্যাদির জন্য অর্থ সাহায্যের ক্ষেত্রে হাঃ জেঃ সমাজ শিক্ষা আধিকারিক প্রণব কুমার ভট্টাচার্যের সহায়তা স্মরণীয়। নৈশকালে আলোর সুব্যবস্থা প্রথমে করেছিল রণমহলের চিত্তরঞ্জন মাইতি।

সবুজ গ্রন্থাগার ভবনের ভিত্তি প্রস্তর লিপির পাঠ ঃ—

পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভার অধ্যক্ষ

মাননীয় শ্রীযুত শৈলকুমার মুখোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক

সবুজ গ্রন্থাগারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হইল।

২৪-২-৫৭ সবুজ গ্রন্থাগার
নিজবালিয়া, পাঁতিহাল
হাওড়া

নিজবালিয়া নিবাসী কৃষ্ণধন মাইতি, পুলিনবিহারী মাইতি, নৃসিংহমুরারী মাইতি [সকলের পিতা ঁদীননাথ মাইতি], ইন্দুমতী মাইতি [স্বামী ঁযতীন্দ্রনাথ মাইতি]। নিজবালিয়া মৌজার প্রায় কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ৬৩ নং খতিয়ানভুক্ত ১৯৪০ দাগে ২৬ শতক, ১৯৪১ দাগে ৭ শতক একুনে ৩৩ শতক পরিমাণ মূল্যবান ডাঙ্গা জমি সবুজ গ্রন্থাগারের অনুকূলে দান করেন ২৭ মে, ১৯৫৭ খ্রিঃ তারিখে। উক্ত দানপত্রটি বড়গাছিয়া সাব-রেজেষ্ট্রী অফিসের মোহরাঙ্কিত দলিল নং ২০৬৬, বুক নং ১, ভল্যুম নং ২৪, পৃষ্ঠা নং ১৫০-১৫৩ ; তাং ২৭ মে, ১৯৫৭ খ্রিঃ।

প্রতিষ্ঠানটির রেজি. নং — এস/২৯১২ অফ ১৯৫৭-৫৮

মুন্সিরহাট সাধারণ পাঠাগার (১৯৪৮ খ্রিঃ)

সদ্য স্বাধীন কিন্তু দরিদ্র ও নিরক্ষর জনসাধারণের দেশে যখন জনশিক্ষার প্রশ্নটি ছিল প্রথম ও প্রধান আবশ্যকীয় বিষয়, সেই সময় জগৎবল্লভপুর অঞ্চলের এক অবজ্ঞাত এলাকাতেও কিছু মানুষের মনে একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার ভাবনা দানা বেঁধেছিল।

১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে পাঠাগারের সূচনাকালে নাম ছিল "শংকরহাটি সাধারণ পাঠাগার"। প্রধানতঃ নিত্যানন্দ চক্রবর্তী, জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন প্রথম উদ্যোক্তা। পাঠাগারটির সূচনা হয়েছিল তৎকালীন মার্টিন লাইট রেল স্টেশনের পাশে অবস্থিত অ্যান্টি ম্যালেরিয়া সোসাইটি অফিসের এক কোণায়। সংগঠকরূপে ছিলেন নিশিকান্ত দে, ঋষিকেশ চক্রবর্তী প্রমুখ। এছাড়া প্রকাশ চন্দ্র ঘোষ, মুন্সিরহাটের স্টেশন মাস্টার বংকিম মুখার্জী সহ আরও জনাকয় ছিলেন উৎসাহদাতা।

ইং ১৯৫৫ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত 'মুন্সিরহাট সুহৃদ সংঘ' সাধারণ পাঠাগারটির দায়িত্ব গ্রহণ করে। এই সময়েই পাঠাগারের নাম পরিবর্তন করে "মুন্সিরহাট সাধারণ পাঠাগার" নামে রেজিস্ট্রেশন করা হয়। তখন গ্রন্থ সংখ্যা ছিল প্রায় ২৩০০ টি। ১৯৬৪-৬৫ খ্রিঃ নাগাদ নূতন কর্মসূচী নেওয়ার ফলে সংগৃহীত গ্রন্থ সংখ্যা হয় প্রায় ৩,৫০০টি। কিন্তু তারপরেই সাংগঠনিক সঙ্কট, কর্মীর অভাব দেখা দেয়। পাঠাগারের নাভিশ্বাস ওঠে।

ইং ১৯৭১ থেকে পরবর্তী প্রায় এক দশক পাঠাগারটি অচল হয়ে যায়, অজস্র বই লোপাট হয়ে যায়। পুনরায় ১৯৭৭ খ্রিঃ-র পরে প্রাণের চঞ্চলতা দেখা দেয়। পাঠাগারটি স্থায়ীভাবে নিজগৃহে স্থাপনের জন্য মাণিকলাল ঘোষ, কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ এবং মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ শঙ্করহাটি মৌজায় ৪৭২ নং দাগে মোট ৪ শতক জমি দান করেন। গৃহাদি নির্মাণের জন্য হাওড়া জেলা সমাজ শিক্ষা অধিকার (টাঃ ২,৫০০/-), শঙ্করহাটি গ্রাম পঞ্চায়েত (টাঃ ৯,৮০০/-), স্থানীয় জনসাধারণ (টাঃ ১৫,৯২০/-) এবং পাঠাগার তহবিল ও

অন্যান্য প্রকার ঋণ সূত্রে (প্রায় টাঃ ১২,০০০/-) অর্থাদি পাওয়া গিয়েছিল।

১৯৭৭ খ্রিঃ ও তার পরবর্তীকালে পুনর্গঠন ও সাংগঠনিক কর্মে ব্রতী হয়েছিলেন— প্রবীণ শিক্ষক শিবরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক সনৎ কুমার ঘোষ (প্রেসিডেন্সী কলেজ), নিশিকান্ত দে, মুরারীমোহন নন্দী, চিত্তরঞ্জন গাঙ্গুলী, বভ্রূবাহন কুণ্ডু, মহম্মদ সাদিক (পিপলস অ্যালবাম থিয়েটার), রত্নেশ্বর চক্রবর্তী, প্রদীপকুমার চক্রবর্তী, শিববাম চক্রবর্তী, বীরেশ্বর চক্রবর্তী (বর্তমান গ্রন্থাগারিক), কাজী সামসুল হক, রঞ্জন ঘোষ, সুকুমার পাত্র, সৈয়দ ফজলুল হক, অমল রায়, সমরেন্দ্র মল্লিক, কাশীনাথ আদক সহ আরো অনেকে।

১৯৮০ খ্রিঃ, ১৮ আগষ্ট তারিখে পঃ বঃ সরকারের গ্রামীণ গ্রন্থাগার প্রকল্পভুক্ত হয়।

২২ জুন, ১৯৮৬ খ্রিঃ, নতুন ভবনে স্থায়ীভাবে পাঠাগারটি স্থানান্তরিত হয়। গৃহপ্রবেশানুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক এম. আনসারুদ্দীন, প্রধান অতিথিরূপে ছিলেন পঃ বঃ সরকারের পরিষদীয় মন্ত্রী পতিতপাবন পাঠক এবং উদ্বোধন কর্তা ছিলেন দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সভাধিপতি, হাওড়া জেলা পরিষদ।

বিগত ১০ মার্চ, ১৯৯৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সংগৃহীত পুস্তক সংখ্যা ছিল ৩,০১২টি। মূল্যবান দশটি প্রাচীন পুঁথি রযেছে। পুঁথিগুলি সংগৃহীত হয়েছিল বল্লভবাটীর রামপ্রসাদ ব্যানার্জীর কাছ থেকে।

বিদেশী পুরাণের ফিনিক্স পাখীর মতই আলোচ্য পাঠাগারটি প্রাণ ফিরে পেযেছে, এলাকার মানুষের কাছে সেটা আনন্দ ও আশীর্বাদ দুই-ই।

অভিনব গ্রন্থাগার, শিয়ালডাঙ্গা (১৩৬০ বঙ্গাব্দ)

অভিনব গ্রন্থাগার স্থাপনের ইতিহাসটাই অভিনব।

জগৎবল্লভপুর থানার পূর্ব-দক্ষিণে প্রত্যন্ত প্রান্তের একটি গ্রাম শিয়ালডাঙ্গা (জে এল. নং ৫৯)। বিগত ১৯৯১ সালের জনগণনা সূত্রে জানা যাচ্ছে, গ্রামের মোট অধিবাসীর সংখ্যা ৪,৬৪৩ জনের মধ্যে তপশীলভুক্ত হচ্ছেন ১,৫৬৭ জন। সাক্ষরের সংখ্যা ২,৩৫৪ জন। কিন্তু আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে এই গ্রামে শিক্ষার আলো পৌঁছায়নি। অধিবাসীদের নব্বই শতাংশই ছিলেন শ্রম নির্ভর, কৃষি নির্ভর। এমন এক পরিবেশে গ্রন্থাগার স্থাপনের স্বপ্ন দেখা তো বাতুলতা মাত্র। প্রকৃতই কয়েকজন "কাজ-পাগল" যুবা পুরুষ কখনও পরের জমিতে 'মজুর' খেটে, কখনও-বা কারো পুকুর কেটে, আবার কখনও ভিন্ন ভাবে অর্জিত অর্থাদি দিয়ে সৃষ্টি করেছিল 'ভ্রাতৃ সংঘ' নামে একটি জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান। এই ভ্রাতৃ সংঘের অধীনে, সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত হত "অভিনব গ্রন্থাগার"। উদ্দেশ্য ছিল এলাকার নিরক্ষরতা দূরীকরণ। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, পরিচালক সদস্যদের অনেকেই যৎসামান্য লেখাপড়া জানত, কিন্তু জানার আগ্রহ ছিল দারুণ রকমের। এই ছিল তাদের সেদিনকার "মূলধন"।

১৫ ফাল্গুন, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ—অভিনব গ্রন্থাগাবের সূচনা দিবস। তিনকড়ি চরণ কোলে ও দাশুরথি কোলে প্রদত্ত ১টি আলমারি, প্রায় ৫০টি বই নিয়ে নিধুভূষণ চক্রবর্তীর

বসতবাটীর একটি ঘরে গ্রন্থাগারের কর্মারম্ভ। আজ ১৪০৭ বঙ্গাব্দের সূচনায় কুড়ি-বাইশটি আলমারি ও বুক-র‍্যাকে সজ্জিত আছে ৪,৩৫২টি পুস্তক, যার একাংশ পাওয়া গেছে দানরূপে। এছাড়া শিয়ালডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রদত্ত চারশতক জমি ও ২০,০০০ টাকা অনুদান, দীনবন্ধু কোলে প্রদত্ত জমি, পঃ বঃ সরকার প্রদত্ত ২,৩২,৮১১ টাকা অনুদান এবং স্থানীয় জনসাধারণ প্রদত্ত প্রায় ৪১ হাজার টাকা সহযোগে একটি সুদৃশ্য দ্বিতল গ্রন্থাগার ভবন নির্মিত হয়েছে অতি সম্প্রতি। পঃ বঃ সরকারের আর্থিক অনুদান আদায়ের জন্য গ্রন্থাগারের অন্যতম সংগঠক কামাখ্যা চরণ হাজরা এবং নিমাবালিয়া নিবাসী সিদ্ধেশ্বর মণ্ডলের উদ্যোগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। [শ্রী মণ্ডল, কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের প্রাক্তন চীফ ইঞ্জিনীয়ার।]

অভিনব গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার উদোক্তা ও কর্মীবৃন্দের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন সর্বশ্রী কামাখ্যাচরণ হাজরা, তিনকড়ি চরণ কোলে (ছোট), কৃষ্ণধন দাস, অরবিন্দ কোলে, নিতাইচন্দ্র কোলে, প্রসাদচন্দ্র কর্মকার, তারাপদ কোলে, দাশুরথি কোলে প্রমুখ। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বহু গ্রামবাসী বহুভাবে শ্রম দান, খয়রাতি সাহায্য দিয়েছেন।

গ্রন্থাগারকে সচল রাখার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ে প্রবন্ধ, সঙ্গীত, আবৃত্তি, বিতর্ক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা হত, এখনও হয়ে থাকে। এছাড়া, দরিদ্র শিক্ষার্থীদের বিনাব্যয়ে পুস্তকাদি পাঠের আয়োজনও রয়েছে।

বর্তমানে অভিনব গ্রন্থাগারের সদস্য সংখ্যা—পুরুষ ৪১৩, মহিলা সদস্যা ৫৮, ছাত্র-ছাত্রী ৩৮ জন।

বিগত ১৯৮১ সালে পঃ বঃ সরকার পোষিত গ্রামীণ গ্রন্থাগারের স্বীকৃতি লাভ করায় ট্রেণ্ড গ্রন্থাগারিক ১ জন, সাইকেল পিওন ১ জন কর্মরত রয়েছেন।

বলা বাহুল্য, অভিনব গ্রন্থাগার, জগৎবল্লভপুর জনপদে অত্যন্ত প্রাণবন্ত ও সুপরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে অন্যতম।

আলোচ্য জনপদে বর্তমানে "গ্রামীণ গ্রন্থাগার" রয়েছে আটটি। এ ছাড়াও, এলাকামধ্যে বেসরকারীভাবে পরিচালিত গ্রন্থাগার রয়েছে কয়েকটি।

গ্রামদেবতা পরিচয় :

গ্রামিনো গ্রামরক্ষার্থে / পূজ্যয়েদ গ্রামদেবতা।" [দেবী যামল]

বিপদ-আপদ, মহামারী, সর্বপ্রকার বিপর্যয়ের হাত থেকে গ্রামকে রক্ষা করার জন্যই গ্রামবাসীরা গ্রামদেবতার পূজাদি করে থাকেন। গ্রামদেবতা হচ্ছেন গাঁ-জনের দেবতা, গ্রামের সর্বজনীন দেবতা, গ্রামের দেবতা, গ্রামের মঙ্গলামঙ্গলের নিয়ন্তা। গ্রামে গাঁথা দেশে, গ্রাম-নির্ভর জীবনযাত্রা। গ্রামবাসীদের আধিদৈবিক-আধিভৌতিক চিন্তাচেতনার কেন্দ্রে আছে যুগলালিত সংস্কার, পুরুষানুক্রমিকভাবে প্রচলিত রীতি-নীতি সমূহ। বিনা প্রশ্নে, বিনা দ্বিধায় অনুসরণ করা হচ্ছে গ্রামদেবতার পূজা-পদ্ধতি ; কোথাও তা প্রকাশ্য, কোথাও-বা অপ্রকাশ্য। শিক্ষিতের কিম্বা নিরক্ষরের ক্ষেত্রেও কোন ভেদাভেদ দেখা যায়

না বিশেষভাবে। এ ছবি সমগ্র ভারতবর্ষের, একথা বলা বাহুল্যমাত্র।

প্রকৃতপক্ষে গ্রামদেবতার সৃষ্টি যে কিভাবে, কবে এবং কার দ্বারায়, সে ঘটনার ইতিহাস আজ কুহেলিকায় আচ্ছন্ন। তবে হিন্দু সমাজে প্রচলিত চতুর্বর্ণ প্রথা অনুসারে সবচেয়ে নীচের স্তরে রয়েছে যে শূদ্র জনতা, তাদের আরাধ্য দেব-দেবীই 'গ্রামদেবতা' নামে চিহ্নিত হয়েছেন, এদেশের শাস্ত্রকারদের দ্বারায়। তাই বলা হয়ে থাকে—

ব্রাহ্মণাম শিবো দেব, ক্ষত্রিয়ানাম তু মাধব।

বৈশ্যানাম তু ভবেদ ব্রহ্মা, শূদ্রানাম গ্রামদেবতা।।—[আগম স্মৃতিসার]

গ্রামদেবতাই হচ্ছে শত-সহস্র-কোটি অন-আর্য শূদ্র জনগণের আরাধ্য দেব-দেবীর প্রতিভূ, গ্রাম দেবতারাই হচ্ছেন ভারতবর্ষের অন-আর্য শূদ্র জনগণের দেব-চিন্তার ফসল "জাতীয় দেবতার প্রতীকস্বরূপ"। কোন পরিবারের কাছে তাদের কুলদেবতার, ব্যক্তির কাছে তার ইষ্টদেবতার যে গুরুত্ব, গ্রামবাসীদের কাছেও গ্রামদেবতার ভূমিকাটিও তদ্রূপ।

আলোচ্য জগৎবল্লভপুর থানা এলাকা সম্পর্কে একই প্রকার মন্তব্য সুপ্রযুক্ত—যেহেতু সম্পূর্ণ অঞ্চলটি গ্রামীণ এলাকা, তাই প্রতি গ্রামেই দেখা পাওয়া যাবে গ্রামদেবতার।

জগৎবল্লভপুর অঞ্চলে পূজিত গ্রামদেবতাদের "কুলজী নামা" বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, শৈব-শাক্ত-বৌদ্ধ-বৈষ্ণব-নাথযোগী এবং ইসলাম ধর্মমতের সহাবস্থান ঘটেছে। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক সুকুমার সেন মহাশয়ের মন্তব্য প্রণিধান যোগ্য ঃ "তুর্কী আক্রমণের সময়ে চারটি ধর্মমত প্রচলিত ছিল —

(ক) দেশীয় প্রাচীন ঐতিহ্যবাহিত গ্রামদেবদেবীপূজা [যাহার মধ্যে বৈদিক, পৌরাণিক দেবতা আছেন, বাহিরের দেবতা আছেন, নূতন পরিগৃহীত দেবতাও আছেন] ;

(খ) মহাযান বৌদ্ধমতের একটি বিশেষ ও স্থানীয় রূপ ;

(গ) যোগীমত [যাহার সহিত শৈবমতের সংস্রব ছিল] ;

(ঘ) পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যমত [যাহার মধ্যে পধান হইতেছে বিষ্ণু-শিব-চণ্ডী উপাসনা]।

(বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ঃ আনন্দ সংস্করণ)

আলোচ্য ক্ষেত্রে অধ্যাপক সেনের মত অনুসরণ করার মত সূত্র পাওয়া সম্ভব। জগৎবল্লভপুর জনপদ অঞ্চলে যে সমস্ত গ্রামে উল্লেখযোগ্য গ্রামদেবতার মূর্তি বা "থান"গুলি রয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেয়া গেল—

(ক) বুড়ো শিব / শিব / স্বয়ম্ভু শিব — জগৎবল্লভপুর, বাঁকুল, কমলাপুর, ধসা, পাইকপাড়া, মধ্য মাজু, পোলগুস্তিয়া, ইসলামপুর, গোবিন্দপুর, সিদ্ধেশ্বর, রণমহল, ইছাপুর, ত্রিপুরাপুর, নিমাবালিয়া, গড়বালিয়া, নিজবালিয়া, প্রতাপপুর, চোঙঘুরালি, বোহারিয়া, শঙ্করহাটি, মানসিংহপুর, সাদতপুর।

(খ) ধর্মরাজ / ধর্মঠাকুর — হাঁটাল, বোহারিয়া, মানসিংহপুর, পাঁতিহাল, যদুপুর, চন্দনপুর, [মৌজা-যদুপুর], বড়গাছিয়া, নরেন্দ্রপুর,

		নবাসন, পাইকপাড়া, প্রতাপপুর, নিজবালিয়া, ধসা, রামপুর, দক্ষিণ মাজু, সন্তোষবাটী, মাড়ঘুরুল, ভূরশিট ব্রাহ্মণপাড়া, খড়দা ব্রাহ্মণপাড়া, কমলাপুর, পার্বতীপুর, শিয়ালডাঙ্গা, ইসলামপুর।
(গ) বিশালাক্ষ্মী	—	হাঁটাল, কমলাপুর, নাইকুলি (উন্নতমানের দর্শনীয় দারুমূর্ত্তি), ধসা (মূর্ত্তি আছে), খড়দা ব্রাহ্মণপাড়া (বামুনপাড়া)।
(ঘ) মনসা	—	প্রায় প্রতি গ্রামে রয়েছে মনসার থান ; এলাকার অধিকাংশ হিন্দু পরিবারে 'সিজ মনসা' গাছ পূজা করা হয়। মনসার অতি সুন্দর দারুমূর্ত্তি নিত্য পূজিতা হচ্ছেন খড়দা ব্রাহ্মণপাড়া মৌজায়।
(ঙ) পঞ্চানন্দ	—	খড়দা ব্রাহ্মণপাড়া, নবাসন, ইসলামপুর, শঙ্করহাটি, নরেন্দ্রপুর, শিয়ালডাঙ্গা, মাজু, রণমহল-কুমারপুর।
(চ) চণ্ডী	—	ইছানগরী (গড়চণ্ডী), পোলগুস্তিয়া (মগরাই চণ্ডী), জগৎবল্লভপুর, খড়দা ব্রাহ্মণপাড়া সহ বহু গ্রামে।
(ছ) ষষ্ঠী	--	গোবিন্দপুর, গড়বালিয়া সহ বহু গ্রামে।
(জ) 'গুমো' ঠাকুর	—	গুমাডাঙ্গী
(ঝ) সিংহবাহিনী	—	নিজবালিয়া (দর্শনীয় দারুমূর্ত্তি), জগৎবল্লভপুর,
(ঞ) সত্যপীর	—	মাজু (বাজার অঞ্চল)
(ট) মাণিকপীর	--	ইসলামপুর (মাণিকপীর অঞ্চল)—(পাঁচলা থানা)
(ঠ) কালী	--	পাঁতিহাল (ফলহারিণী কালিকা), খড়দা ব্রাহ্মণপাড়া (ব্রহ্মময়ী কালী), পাইকপাড়া(সিদ্ধেশ্বরী কালী), মাজু।
(ড) মহাকাল	—	শ্যামপুর, চোঙঘুরালি
(ঢ) ক্ষেত্রপাল	—	মানসিংহপুর,

এগুলি ছাড়া গড়বালিয়া গ্রামে রয়েছে 'নিতাই গৌর'-এর অপূর্ব সুন্দর দারুমূর্ত্তি, যা এক অর্থে গ্রামদেবতারূপে পূজিত হচ্ছে। মাজুতে শ্যামেশ্বরী মহাকালী।

"পীরতলা" রয়েছে কয়েকটি গ্রামে। যেমন, কতোয়ালী পীর [লোকমুখে ফতে আলি] শঙ্করহাটি-মুন্সিরহাটে। এঁর স্মৃতিতে প্রতি বৎসর ১লা মাঘ তারিখে প্রায় পনের দিন ব্যাপী মেলা বসে আজও। এছাড়া, হরিনারায়ণপুর, মাজু, জালালসী, শিয়ালডাঙ্গা গ্রামে 'পীরতলা' আছে, ভূরশুট ব্রাহ্মণপাড়া গ্রামেও আছে পীরতলা। ইছাপুর ও শিয়ালডাঙ্গা গ্রামের ব্রহ্মাপূজা বহুকালের প্রাচীন, গ্রামস্থ সকলেই এ পূজায় অংশ নিয়ে থাকেন। শিয়ালডাঙ্গা, বাদেবালিয়া, যমুনাবালিয়া, গড়বালিয়া সহ অনেকানেক গ্রামে ভাদ্রমাসে জন্মাষ্টমী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম স্মরণে পূজাপাঠ এবং "বাদাই" নামক গীতোৎসব হয়ে থাকে। রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি উপাসিত হচ্ছে বহু পরিবারে ও গ্রামে।

দেব-দেবীর মন্দির

জগৎবল্লভপুর থানা এলাকার মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন গ্রামে মোট সত্তরটি বিভিন্নরীতির পাকা ইটের মন্দির, দোল, রাসমঞ্চ ইত্যাদি রয়েছে। বহু মন্দিরেই রয়েছে প্রতিষ্ঠালিপি, পোড়ামাটির নকাশী কাজ, লঙ্কাযুদ্ধ, সামাজিক দৃশ্যাবলী। এখানে একটা তালিকা দেওয়া গেল—

(১) ইছানগরী [জে. এল. নং ১] — গড়চণ্ডী ; আটচালা, দক্ষিণমুখী, ভগ্ন, পোড়ামাটির নকাশী কাজ ও মূর্তি-আদি ; খ্রিঃ ১৮ শতকের ২য় ভাগ।

(২) ইছাপুর [জে. এল. নং ৪৪] — উমাপতি-শিব ; আটচালা, পশ্চিমমুখী ; লিপি— "সন ১২৭৪ সাল / সাকিম ইছাপুর / শ্রী...ঘড়া / শ্রী দিগাম্বর পুত্র।"

(৩) —ঐ— — রাসমঞ্চ, ছয়কোণাকৃতি ; পোড়ামাটির নগ্নিকা, কৃষ্ণ, বলরাম, রাধিকা ; ১৮ শতকের শেষভাগ।

(৪) ইসলামপুর [জে. এল. নং ৭৬] — শিবমন্দির, আটচালা, দক্ষিণমুখী, আনুঃ ১৯ শতকের শেষভাগ।

(৫) ঐ — ধর্মমন্দির, আটচালা, দক্ষিণমুখী (আনুঃ খ্রিঃ ১৯ শতকের শেষভাগ)

(৬) কুমারপুর [জে. এল. নং ৬০] — রাসমঞ্চ, দ্বারী পরিবারের ; অষ্টকোণাকৃতি ; পোড়ামাটির ৭৬ সেমি উচ্চতা বিবিধপ্রকার মূর্তি ; স্বল্প সংখ্যক মূর্তি নিজবালিয়া সবুজ গ্রন্থাগারে রক্ষিত।

(৭) গড়বালিয়া [মৌজা-নিজবালিয়া জে. এল. নং ৪৬] — গ্রামদেবতা 'বুড়ো শিব', আটচালা, পশ্চিমমুখী। লিপি "শ্রীরাম শুভমস্তু, / শকাব্দা ১৭০৯ / সন ১১৯৪ সাল।"

(৮) —ঐ— — ভুবনেশ্বর শিব, আটচালা, পূর্বমুখী ; মান্না পরিবার। পোড়ামাটির দ্বারপাল। আনুঃ ১৯ শতকের শেষার্দ্ধ।

(৯) —ঐ— — রাস / দোলমঞ্চ ; অষ্টকোণাকৃতি ; পোড়ামাটির নগ্নিকা ও মিথুন মূর্তি, পঙ্খের নকাশী কাজ আনুঃ ১৯ শতকের শেষার্দ্ধ

(১০) —ঐ— — রাধাকান্তজীউ, দালান মন্দির, উত্তরমুখী; হৃদয়নাথ মান্না। প্রতিষ্ঠা সন ১৩২৬। ১৮ ফাল্গুন।

(১১) —ঐ— — মহাপ্রভুজীউ [১.২ মি. উচ্চতাযুক্ত দারুময় গৌর-নিতাই] দালান মন্দির ; খৃঃ ১৮ শতকের শেষভাগ।

(১২) গুমাডাঙ্গী [জে. এল. নং ৩১] — শিব, আটচালা, পশ্চিমমুখী, পোড়ামাটির নকাশী কাজ স্বল্পাবশিষ্ট, ভগ্ন। আনুঃ ১৯ শতক

(১৩) গোবিন্দপুর [জে. এল. নং ৬৮] — শিব, নবরত্ন, দক্ষিণমুখী (ভগ্ন ও পরিত্যক্ত), ১৮ শতকের মধ্যভাগ।

(১৪) চাঁদুল [জে. এল. নং ১২] — রঘুনাথজীউ, শিখর দেউল রীতি ; দক্ষিণমুখী ; ১৯ শতকের ১ম ভাগ।

(১৫) চোঙঘুরালি [জে. এল. নং ৩৮] — মদনমোহনজীউ (কৃষ্ণরাধিকামূর্তি), আটচালা, দক্ষিণমুখী ; দেঁড়ে পরিবার ; লিপি— "স্থাপিত ১১১২ সাল মদনমোহনজীউ"।

(১৬) — ঐ — — কল্যাণেশ্বর শিব, আটচালা, পশ্চিমমুখী ; চক্রবর্তী পরিবার ; লিপি —"শ্রী দিগম্বর দে তস্যপুত্র / শ্রীরামকুমার দে দ্বারা / নির্মীত সাং সেনহাট।" এবং "শকাব্দা ১৮০৬ / সন ১২৯২ সাল / ১৫ বৈশাখ।"

(১৭) জগৎবল্লভপুর [জে. এল. নং ৪] — শিব, আটচালা, পূবমুখী ; পাল পরিবার ; লিপি—"শুভমস্তু সকাব্দ ১৬৮৫ / সন ১১৭০"। পোড়ামাটির লঙ্কাযুদ্ধ দৃশ্য।

(১৮) — ঐ — — শিব, আটচালা, দক্ষিণমুখী ; পোড়ামাটির লঙ্কাযুদ্ধ ; লিপি — "১৬৬২ শকাব্দ"। (কালীতলা বাজার এলাকা)

(১৯) — ঐ — — মহেন্দ্রেশ্বর শিব ; আটচালা, পশ্চিমমুখী, লিপি — "শকাব্দা ১৭২৪ সন ১২০৯ তারিখ ১৪ই ফাল্গুন।"

(২০) — ঐ — — শিব, আটচালা, পূর্বমুখী (ষষ্ঠীতলা এলাকা)

(২১) দক্ষিণ মাজু [জে. এল. নং ৩২] — দামোদরজীউ, আটচালা, পশ্চিমমুখী, পোড়ামাটির সজ্জা ; ১৮ শতকের মধ্যভাগ।

(২২) ধসা [জে. এল. নং ২৮] — চন্দ্রচূড় শিব, আটচালা, পশ্চিমমুখী, লিপি— শুভমস্তু সকা/ব্দা ১৬৫৭ সক ; চৌধুরী পরিবার ; পোড়ামাটির লঙ্কাযুদ্ধ দৃশ্য। (সংস্কার - মার্চ, ১৯৯৯)

(২৩) — ঐ — — গোপীনাথ জীউ, আটচালা—চারচালা নাটমন্দিরসহ, দক্ষিণমুখী, লিপি — "১৬৩০ শক / ১২৯৯ সাল ম্যারামত।" পোড়ামাটির লঙ্কাযুদ্ধ দৃশ্য ; (মার্চ-এপ্রিল ১৯৯৯ পুনরায় সংস্কার হতে দেখেছি)।

(২৪) — ঐ — — দুর্গা মণ্ডপ, দালান মন্দির, ভগ্ন ও পরিত্যক্ত ;

চৌধুরী পরিবার। দুটি লিপি আছে—

(ক) "শ্রীশ্রী দুর্গা / শরণম। / এই দেবী মণ্ডপ স্বর্গীয় মহাত্মা লক্ষ্মণ চন্দ্র চৌধুরী কর্তৃক প্রথম সংস্থাপিত / তৎপরে / তস্য প্রপৌত্র স্বর্গীয় তারাচাঁদ চৌধুরীর / পুত্র শ্রী অন্নদা প্রসাদ চৌধুরী / কর্তৃক পুনঃসংস্কৃত হইল। / সন ১২৯২ সাল / তারিখ ৪ঠা অগ্রহায়ণ।"

(খ) "এই দেবী মণ্ডপ / *লক্ষ্মণ চন্দ্র চৌধুরীর প্রপৌত্র / *বদন চন্দ্র চৌধুরীর পৌত্র / *রাখালদাশ চৌধুরীর পুত্র / *যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, কিশোরী মোহন চৌধুরী / *ভোলানাথ চৌধুরী কর্তৃক পুনঃসংস্কার করা হইল। / ৮ই মাঘ, ১৩৫৪ সাল।"

(২৫)	— ঐ —	—	বিশালাক্ষ্মী, দালান মন্দির, দক্ষিণমুখী, প্রতিষ্ঠাকাল (?) ; বিশালাক্ষ্মী মূর্তি আছে।
(২৬)	নাইকুলি [জে. এল. নং ১১]	—	শিব, আটচালা, পশ্চিমমুখী, লিপি —"সকাবদা ঃ / ১৬৯৫।"
(২৭)	— ঐ —	—	বিশালাক্ষ্মী, দালান মন্দির, দক্ষিণমুখী ; মিশ্র পরিবার ; ১২০৯ বঙ্গাব্দ (?) ; দেবী বিশালাক্ষ্মীর অপূর্ব সুন্দর দারুময় মূর্তি।
(২৮)	নিজবালিয়া [জে. এল. নং ৪৬]	—	সিংহবাহিনী, আটচালা মন্দির, চারচালা নাটমন্দির ; চাঁদনীরীতির দালান, দক্ষিণমুখী ; চারলাইন লিপি — "শ্রী রামনারায়ণ মল্লিক / সাং কলিকাতা সকাবদা / ১৭১২। সন ১১৯৭ সাল / মাহ অগ্রহায়ণ।" অপূর্ব সুন্দর অষ্টভূজা দারুমূর্ত্তি। [দেবী মূর্তির প্রতিষ্ঠাকাল সম্ভবতঃ ষোড়শ শতক—পরিশিষ্ট অংশে স্বতন্ত্র আলোচনা দ্রষ্টব্য]
(২৯)	— ঐ —	—	শিবমন্দির, আটচালা, দক্ষিণমুখী ; একলাইন লিপি — "শ্রীশ্রীরাম যুভমস্তু সকাবদা ১৬৯৮ সক সন ১১৮৩ সাল তাং ১৫ শ্রাবণ।" ; পোড়ামাটির অলঙ্করণ, মূর্ত্তি, লঙ্কাযুদ্ধ দৃশ্য।
(৩০)	— ঐ —	—	পিপুলেশ্বর শিব, সপ্তরথ শিখর দেউল, পশ্চিমমুখী। আনুঃ খ্রিঃ ১৯ শতকের মধ্যভাগ।
(৩১)	নিমাবালিয়া [জে. এল. নং ৪২]	—	শিব, আটচালা, পশ্চিমমুখী, ১৯ শতকের মধ্যভাগ। কাঠের ক্ষয়িত হরপার্বতী মূর্তি।

(৩২)	পাইকপাড়া [জে. এল. নং ২৪]	—	বুড়োশিব, আটচালা, পশ্চিমমুখী ; সরকার পরিবার ; ১৯ শতকের মধ্যভাগ।
(৩৩)	— ঐ —	—	ধর্মঠাকুর, দালান মন্দির, দক্ষিণমুখী ; সরকার পরিবার। কূর্ম মূর্তি ধর্মরাজ।
(৩৪)	পাঁতিহাল [জে. এল. নং ৪৯]	—	শিব, আটচালা—২টি, পশ্চিমমুখী, তন্মধ্যে একটিতে লিপি — "সকাব্দা ১৭০৩ সক ১১৮৮ সাল।" খ্রিঃ ১৮ শতকের মধ্যভাগে দুটি মন্দিরই নির্মিত বলে অনুমান, বর্তমানে ভগ্নদশা। সম্মুখস্থ আটচালা অদৃশ্য।
(৩৫)	— ঐ —	—	শিব, পঞ্চরত্ন, পূর্বমুখী, পোড়ামাটির অলঙ্করণ, খ্রিঃ ১৮ শতকের শেষভাগ।
(৩৬)	— ঐ —	—	রাসমঞ্চ, অষ্টকোণাকৃতি — ২টি আছে। (সাহা, সীতারাম)। ১৯ শতকের শেষভাগ।
(৩৭)	— ঐ —	—	কাশীনাথ জীউ, আটচালা, দক্ষিণমুখী ; চক্রবর্তী পরিবার। ১৮ শতকের মধ্যভাগ।
(৩৮)	— ঐ —	—	শ্যামসুন্দর জীউ, দোলমঞ্চ, আটচালা শৈলী লিপি — শ্রীরামসদয় রায় / সন ১২৭৪ সাল।
(৩৯)	পারগুস্তিয়া [জে. এল. নং ৭৩]	—	শিব, আটচালা, পশ্চিমমুখী, লিপি — "সকা ১৭৮৯ / সন ১২৩৪ সা... / তারিখ ...২ / রচত্র দেবালয়ং / রামহরি স্থপথং"
(৪০)	পোলগুস্তিয়া [জে. এল. নং ৭২]	—	শিব, আটচালা, পশ্চিমমুখী। আনুঃ খ্রিঃ ১৯ শতকের শেষভাগ।
(৪১)	— ঐ —		শিব, আটচালা, পশ্চিমমুখী, কুণ্ডু পরিবার। আনুঃ খ্রিঃ ১৯ শতক শেষার্দ্ধ।
(৪২)	প্রতাপপুর [জে. এল. নং ২৩]	—	শিব, আটচালা, দক্ষিণমুখী, ভট্টাচার্য পরিবার ১৯ শতকের শেষপাদ। পরিত্যক্ত।
(৪৩)	— ঐ —	—	ধর্মরাজ, দালানমন্দির, পশ্চিমমুখী ; পাথরের প্রাচীন কূর্মরূপী ধর্মঠাকুর। সাম্প্রতিক কাল।
(৪৪)	— ঐ —	—	শিব, আটচালা, দক্ষিণমুখী, মুখার্জী পরিবার ১৯ শতকের শেষভাগ।
(৪৫)	বাঁকুল [জে. এল. নং ৭]	—	শিব, আটচালা, পশ্চিমমুখী, লিপি — শুভমস্তু স/কাবদা ১৬৮১। পোড়ামাটির অলঙ্করণযুক্ত।

(৪৬)	— ঐ — (খাঁড়াপাড়া)	—	শিব, আটচালা, দক্ষিণমুখী, লিপি — শুভমস্তু সকাবদা ১৬৮২।
(৪৭)	(খড়দা) ব্রাহ্মণপাড়া [জে. এল. নং ১৬]	—	শিব, আটচালা ; পশ্চিমমুখী ; লিপি — সুভমস্তু সকাবদা ১৬৯৯।
(৪৮)	মধ্য মাজু [জে. এল. নং ৩৩]	—	নীলকণ্ঠ মহাদেব, আটচালা, দক্ষিণমুখী ; লিপি — "এই দেবমন্দির স্বর্গীয় নিমাইচরণ দত্ত মহাশয় / কর্ত্তৃক স্থাপিত / এবং ২৩শে অগ্রহায়ণ বুধবার ১২৫৪ বঃ শঃ / ইং ৮ই ডিসেম্বর ১৮৪৭ সন তদীয় দানপত্র দ্বারা উৎসর্গীকৃত / ২০শে আশ্বিন, ১৩৬৯।"
(৪৯)	মাজুক্ষেত্র [জে. এল. নং ৭৭]	—	দ্বাদশ শিব, আটচালা, ছ'টি পূর্বমুখী, ছ'টি পশ্চিমমুখী। ১৯ শতকের মধ্যভাগ। [কালীশঙ্কর চক্রবর্তী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত]।
(৫০)	— ঐ —	—	বুড়ো শিব, আটচালা, দক্ষিণমুখী ; পোড়ামাটির নকাশী কাজ, শালভঞ্জিকা, মোহন্ত মূর্তি। খ্রিঃ ১৮ শতকের প্রথমভাগ। [ধোলে পাড়া]।
(৫১)	— ঐ —	—	শিব, আটচালা, দক্ষিণমুখী ; লিপি — "সন ১২১৫।" কুমোরপাড়া।
(৫২)	রালি [জে. এল. নং ৪১]	—	দামোদর জীউ, অষ্টকোণাকৃতি রাসমঞ্চ ; পোড়ামাটির গণেশজননী, মোহন্ত, তবলা বাদিকা, রামচন্দ্র, নৃত্যরত শিব ইত্যাদি [মণ্ডল পরিবারের]। আনুঃ ১৯ শতক।
(৫৩)	— ঐ —	—	মহাকাল শিব, আটচালা, দক্ষিণমুখী খ্রিঃ ১৯ শতকের মধ্যভাগ। [মাখালতলা]
(৫৪)	মানসিংহপুর [জে. এল. নং ৫০]	—	ধর্মঠাকুর, আটচালা, পশ্চিমমুখী ; লিপি — "শ্রীশ্রীধর্মঠাকুর / সকাবদা ১৭৩৪...।"
(৫৫)	— ঐ —	—	রঘুনাথ জিউ, আটচালা, পূর্বমুখী, স্বল্প পঙ্খের অলঙ্করণ ; খ্রিঃ ১৯ শতকের শেষভাগ।
(৫৬)	যদুপুর [জে. এল. নং ৮]	—	ধর্মরাজ, আটচালা, পশ্চিমমুখী। [একজোড়া পদচিহ্নাঙ্কিত কূর্মমূর্তি], বেচারাম হালদার পরিবার। খ্রিঃ ১৮ শতকের শেষভাগ।

[ধর্মরাজ মূর্তিটি বর্তমানে নবমতম পুরুষের দ্বারা পূজিত হচ্ছে।]

(৫৭) যাদববাটী [জে. এল. নং ৩৫] — অন্নপূর্ণা, নবরত্ন [একতলা দালানের ওপর স্থাপিত], পশ্চিমমুখী। আনুঃ খ্রিঃ ১৯ শতক।

(৫৮) রণমহল [জে. এল. নং. ৪৩] — শিব, আটচালা, পূর্বমুখী, খ্রিঃ ১৯ শতকেব শেষপাদ।

(৫৯) রামপুর মৌজা — রমানাথবাটী [জে. এল. নং ২২] — বুড়োশিব, আটচালা, পশ্চিমমুখী খ্রিঃ ১৮ শতকের শেষভাগ। [চক্রবর্তীপাড়া] [মন্দিরের পাশেই একটি বৃষকাষ্ঠ আছে— নির্মাণশিল্পী যুগল দাস, নিবাস—গড়বালিয়া]।

(৬০) — ঐ — — "ক্ষুদিরায়" ধর্মরাজ, আটচালা, দক্ষিণমুখী, চুন বালির লিপি "শকাবদা...৬২৪"। যোগী নাথ / যুগী পরিবারের দ্বারা পূজিত — বর্তমানে ষষ্ঠ / সপ্তম পুরুষ (?), — মানসিংহপুর এলাকা থেকে আগত। আনুঃ ১৯ শতক।

(৬১) রামেশ্বরপুর [জে. এল. নং ২২-এর অংশ বিশেষ] — শিব, আটচালা, দক্ষিণমুখী, প্রতিষ্ঠা লিপি — সুভমস্তু সকাব্দা ১১৫৩। মিত্র পরিবার ; বর্গীর হাঙ্গামাকালে পরিত্যক্ত। পোড়ামাটির অলঙ্করণ — লঙ্কাযুদ্ধ দৃশ্য ও অন্যান্য নকাশী কাজ।

(৬২) — ঐ — — শিব, আটচালা, পশ্চিমমুখী। পঙ্খের লিপি — সকাবদা / সোন ১২৩৯। চক্রবর্তী ; পরিত্যক্ত।

(৬৩) — ঐ — — শিব, আটচালা, পশ্চিমমুখী। রায়পাড়া - পরিত্যক্ত। উনিশ শতকের মধ্যভাগ।

(৬৪) সিদ্ধেশ্বর [জে. এল. নং ৬৪] — বুড়োশিব, আটচালা, পূর্বমুখী, খ্রিঃ ১৯ শতকের মধ্যভাগ।

(৬৫) স্যাকরাহাটি [জে. এল. নং ২১] ওরফে শঙ্করহাটি — শ্রীধরজীউ (শালগ্রাম), আটচালা, পশ্চিমমুখী। পাথরে ক্ষোদাই লিপি — বাস্তমন্দির / দেবোত্তর শ্রীশ্রী শ্রীধরজীউ দিং / প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় দাতারাম ঘোষ / পুত্র / সেবাইত শম্ভুচরণ ঘোষ / পুত্র / সেবাইত অঘোর চন্দ্র ঘোষ / পুত্র /

সেবাইত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ / সাং স্যাকরাহাটি, হাওড়া। আনুঃ ১৯ শতকের শেষার্দ্ধ।

(৬৬) — ঐ — — রাসমঞ্চ, আটচালা ; পঙ্খের লিপি — প্রতিষ্ঠাতা দাতারাম ঘোষ / রাস্তমন্দির দেবত্তর / সেকরাহাটি।

(৬৭) নিজবালিয়া [জে. এল. নং ৪৬] — ধর্মরাজ, দালানমন্দির, দক্ষিণমুখী ; পাথরে উৎকীর্ণ লিপি — "নমঃ ধর্মরাজায় নমঃ / স্বর্গীয় পূজনীয় জ্যেষ্ঠ সহোদর জজ্ঞেশ্বর ঘোষ ও/ স্বর্গীয় পূজনীয় মধ্যম সহোদর রাজ্যেশ্বর ঘোষ ও/ স্বর্গীয় কল্যাণীয় কনিষ্ঠ সহোদর দুঃখীরাম ঘোষ / সহোদরগণের/চিরস্বরনার্থে এই দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। / দীন /কেদারনাথ ঘোষ/সাং নিজবালিয়া/ সন ১৩৩৯ সাল ৩০ ফাল্গুন।"

[বর্তমানে পঞ্চম পুরুষের দ্বারায় পূজিত কূর্মমূর্তি ধর্মরাজ-মূর্তিটি আলোচনাযোগ্য]

[বলা বাহুল্য, ইতিপূর্বে উল্লিখিত পাইকপাড়া মৌজার ধর্মমন্দির গাত্রে উল্লিখিত লিপিটির পাঠ—সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্/পরমপূজ্য ভক্তপ্রবর স্বর্গীয়/দাশুরথি হালদার/ এবং/কৃষ্ণমোহন হালদার/মহোদয়গণের পুণ্য স্মৃতিকল্পে মন্দিরটি তদীয় উত্তরাধিকারী-গণের / দ্বারা সংস্কৃত হইল। / ১৪ই আশ্বিন, রবিবার, ১৩৯৬ সাল।]

(৬৮) বাদেবালিয়া [জে. এল. নং ৪৭] — আটচালা, দক্ষিণমুখী, বেরা পরিবার,

(৬৯) পার্বতীপুর [জে. এল. নং ৫২] — রাধাকৃষ্ণজীউ, আটচালা, প্রতিষ্ঠাতা — রামকুমার চৌধুরী।

(৭০) নিজবালিয়া — রাস/দোলমঞ্চ, অষ্টকোণাকৃতি, রসুনচূড়া, পঙ্খের অলঙ্করণ, লিপি —

"শ্রীশ্রী শ্যামসুন্দর জয়তি / স্বর্গীয় পিতৃপুরুষগণের / কীর্তিস্তম্ভ। / অধম শ্রীবিপিন বিহারী মাইতি / কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইল। / সন ১৩২৪ সাল ২৩শে আশ্বিন।"

পূর্বোদ্ধৃত তালিকাটি অনুসরণ করলে দেখা যাবে, আলোচ্য জগৎবল্লভপুর থানা এলাকা মধ্যে শিব মন্দিরেরই আধিক্য। এর অন্যতম কারণ, দশনামী শৈব সম্প্রদায়ের বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র 'তারকেশ্বর শিব'-এর প্রভাব-বলয়মধ্যে অবস্থান হেতু শিব মন্দিরের আধিক্য। মোট ৭৬টি বসতিযোগ্য মৌজার মধ্যে (+ ১টি মৌজা বসতিহীন) ৩৬টি বসতিযোগ্য মৌজার মধ্যে "শিব" পূজিত হচ্ছেন বিভিন্ন নামে। যথা—শিব, বুড়োশিব, নীলকণ্ঠ শিব, মহেন্দ্রেশ্বর শিব, চন্দ্রচূড় শিব, উমাপতি শিব, ভুবনেশ্বর শিব, কল্যাণেশ্বর শিব, পিপুলেশ্বর শিব, মহাকাল, ইত্যাদি।

বৈষ্ণব ধর্মের প্রাবল্য একসময় এই এলাকায় বিশেষভাবে ঘটেছিল, যার কিছু নিদর্শন রয়ে গেছে। আরাধ্য দেবতা বিভিন্ন নামে পূজিত হচ্ছেন। যথা—রাধাকান্ত, রঘুনাথ, মদনমোহন, গোপীনাথ, শ্যামসুন্দর, দামোদর জীউ ইত্যাদি। পোড়ামাটির অলঙ্করণ সমৃদ্ধ রাস/দোল মঞ্চগুলি বৈষ্ণব ধর্মের নিদর্শন মধ্যে গণ্য।

বিশালাক্ষ্মীর দারুমূর্তি রয়েছে ধসা এবং নাইকুলি গ্রামে--কিন্তু এলাকায় বিখ্যাত হলো হাঁটালের বিশালাক্ষ্মী। কোন মূর্তি নাই, শিলাখণ্ডে নিত্য পূজিতা। হাঁটালের পাশ দিয়ে যে অতীতে কোন প্রবলবেগ সম্পন্ন নদী বয়ে যেত তা বোঝা যায় এলাকা ঘুরে দেখলে। আজও নিকটেই রয়েছে গৌরীগঙ্গা বা গৌরীগাঙ। নাইকুলির ও ধসার বিশালাক্ষ্মী মূর্তি উচ্চাঙ্গের দারুশিল্পর নিদর্শন, বহুকালের প্রাচীন।

এলাকা মধ্যে খ্যাতিমান শক্তিদেবী হচ্ছেন নিজবালিয়ার সিংহবাহিনী, মধ্য মাজুর অন্নপূর্ণা (বারোয়ারী), নাইকুলির এবং হাঁটালের বিশালাক্ষ্মী।

খড়দা ব্রাহ্মণপাড়া মৌজায় মনসাদেবীর দারুময় মূর্তি এ অঞ্চলে দ্বিতীয় রহিত। অত্যন্ত উচ্চমানের দারুশিল্পের নিদর্শন মধ্যে গণ্য হবার যোগ্য। [চিত্র : ১১-১৩]।

মসজিদ বিবরণী

আলোচ্যক্ষেত্রে সর্বাধিক উল্লেখ্য বিষয় হচ্ছে সমগ্র হাওড়া জেলার প্রাচীন মসজিদগুলির মধ্যে অন্ততঃ সাতটি মসজিদের অবস্থান স্থল জগৎবল্লভপুর জনপদ।

জগৎবল্লভপুর মৌজায় যে মসজিদটি রয়েছে, সেটি এক গম্বুজওয়ালা। খাদেমদের মতে, মসজিদটি আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে (খ্রিঃ ১৬৫৮-১৭০৭) নির্মিত। কিন্তু কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ মেলেনি এই দাবীর সমর্থনে।

পূর্বোক্ত জগৎবল্লভপুর মৌজার উত্তর-পশ্চিমে সংলগ্নভাবে রয়েছে ঝিংরা মৌজা। ঝিংরা মৌজায় ১২৭৩ হিজিরায় (১৮৫৬-৫৭ খ্রিঃ) স্থাপিত বৃহদায়তন ছয় গম্বুজওয়ালা মসজিদ রয়েছে। মসজিদে প্রবেশদ্বার হচ্ছে তিনটি। মাঝের দরজার শিরোভাগে ফার্সী ভাষায় লিখিত লিপি অনুসারে জনৈক দবীরুদ্দীন ১২৭৩ হিজিরা সনে উপাসনালয়টির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

এই মসজিদটির কাছাকাছি আরও একটি প্রাচীন, ভগ্ন এক গম্বুজওয়ালা মসজিদ আছে—এই মসজিদের নির্মাণকাল আওরঙ্গজেবের রাজত্বে বলে অনেকের ধারণা। তবে সীতাপুর এবং ফুরফুরা শরীফ প্রভৃতি মুসলিম ঐতিহ্যবাহী গ্রাম-এলাকার অতি নিকটে অবস্থিত ঝিংরার মসজিদগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

চাঁদুল মৌজার চন্দনপুর এলাকায় রয়েছে পশ্চিমমুখী তিন গম্বুজওয়ালা মসজিদ, যার নির্মাণকাল আনুমানিক খ্রিঃ ১৮ শতক।

বাঁকুল মৌজার কাজীপাড়ায় পূর্বমুখী, তিন গম্বুজওয়ালা মসজিদটির নির্মাণকাল আনুমানিক খ্রিঃ ১৮ শতকের প্রথমার্ধ।

জালালসী মৌজায় পিচ রাস্তার গায়েই রয়েছে পূর্বমুখী তিন গম্বুজওয়ালা মসজিদ।

এটির উত্তরপাশে যে পুষ্করিণীটি রয়েছে তার ঘাটে নিবদ্ধ লিপি ফলকটির পাঠ "মরহুম / নবাবদী মল্লিক / সন ১২৬৯ সাল। সাং জালালসী"—এর ভিত্তিতে মসজিদটির নির্মাণকাল খ্রিঃ ১৮৬২।

জালালসী মৌজার শেখ পাড়ায় পূর্বমুখী এক গম্বুজওয়ালা মসজিদটির গাত্রে নিবদ্ধ চার লাইনের লিপিটির পাঠ -- "জালালসী আদি মসজিদ / শরিয়তি মুন্সী শেখ মহামদ / সাদেক রহমতুল্লাহ সাহেব দ্বারা / স্থাপিত সাল ১২০০"—অর্থাৎ এই মসজিদটির স্থাপনকাল ১৭৯৩ খ্রিঃ। এ মসজিদটি সম্ভবতঃ পারিবারিক।

লোক-উৎসব ও মেলা, পূজন—

বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি উপলক্ষ্যে নিমাবালিয়া গ্রামের (জে. এল. নং ৪২) শশীভূষণ মণ্ডল কর্তৃক প্রবর্তিত বৈশাখী রথের উৎসবে, একদিন ব্যাপী মেলা বসত, গ্রাম সীমান্তে "আরুণের বাঁধ" নামক স্থানে। ঐ রথযাত্রার প্রবর্তন হয়েছিল ১৩১১ সালে (= ১৯০৪ খ্রিঃ) বৈশাখী পূর্ণিমায়। জুজারসা গ্রামের লৌহ ব্যবসায়ী ও জমিদার গগন চন্দ্র মান্না নিমাবালিয়ায় জমিদারী খরিদ করেন এবং শশীভূষণ মণ্ডল কর্তৃক নির্মিত রথের সেবার জন্য কিছু ভূ-সম্পত্তি দান করেন। (দ্র. হাওড়া জেলার ইতিহাস—অচল ভট্টাচার্য। মার্চ, ১৯৮২, পৃঃ ১৬৮)। প্রায় এক দশক পূর্বে ঐ রথযাত্রা উৎসব রহিত হয়ে যায়। বর্তমানে রথটি ধ্বংসোন্মুখ। মানসিংহপুর (জে. এল. নং ৫০) গ্রামেও বৈশাখী রথযাত্রার ঐতিহ্য বর্তমান।

মানসিংহপুর গ্রামেও (জে. এল. নং. ৫০) বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কথিত হয়, বহুকাল পূর্বে মানসিংহপুর গ্রাম নিবাসী মাহিষ্য সম্প্রদায়ভুক্ত জনৈক ব্যক্তি সুদূর দাক্ষিণাত্য থেকে একটি খঞ্জ ব্রাহ্মণ ও তার পরিবারবর্গকে এই গ্রামে স্থায়ী বসবাসের জন্য নিয়ে আসেন। ঐ ব্রাহ্মণ পরিবারের দ্বারা বৈশাখী রথযাত্রা উৎসবের সূচনা হয়। বর্তমানে সর্বজনীন উৎসবে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। (দ্র. পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা : সম্পাদনা অশোক মিত্র। ২য় খণ্ড। পুনর্মুদ্রণ, পৃঃ ৪২০)।

নিজবালিয়া গ্রামে (জে. এল. নং ৪৬) ১২৭১ সালে (= ১৮৬৪ খ্রিঃ) রথযাত্রার প্রবর্তন করেন যজ্ঞেশ্বর ঘোষ এবং তাঁর তিন সহোদর ভাই যথাক্রমে রাজ্যেশ্বর ঘোষ, কেদারনাথ ঘোষ ও দুখীরাম ঘোষ। ১২৯৫ সালে (= ১৮৮৮ খ্রিঃ) ২৮ আষাঢ় তারিখে যজ্ঞেশ্বর ঘোষ ও তাঁর ভাইগণ ন'চূড়ো কাঠের রথ প্রতিষ্ঠা করেন। সৌভাগ্যবশতঃ ঐ রথ আজও চালু আছে। আষাঢ় মাসে রথযাত্রা ও উল্টোরথ উৎসবে মেলা বসে এখনও।

খড়দা ব্রাহ্মণপাড়া (জে. এল. নং ১৬) গ্রামে প্রাচীন কুণ্ডু পরিবারের প্রতিষ্ঠিত রথযাত্রা উৎসব এখনও প্রতি বছর আষাঢ় মাসে হয়ে থাকে। কুণ্ডু পরিবারের কুলদেবতা নারায়ণ শিলা-কে রথে রেখে রশিতে টান দেয়া হয়ে থাকে। পুনর্যাত্রার সময় নারায়ণ শিলা সহ রথকে পুনরায় ফিরিয়ে আনা হয় স্বস্থানে। এখানকার রথযাত্রায় আশপাশের

অনেকানেক গ্রাম থেকে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতারা আসেন। বর্তমানে খড়দা ব্রাহ্মণপাড়া, শঙ্করহাটি গ্রামাদির কতকাংশে স্থায়ী দোকানপাট, অদূরে মুন্সিরহাট গঞ্জ থাকায় সব সময়েই লোকে পরিপূর্ণ থাকে।

আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয় জগৎবল্লভপুরে। এ ছাড়া ফটিকগাছি গ্রামে (জে. এল. নং ৬৫), স্থানীয় দলুই পরিবারের রথ সচল থাকার কারণে এলাকার মানুষ আনন্দিত।

দক্ষিণমাজু গ্রামে (জে. এল. নং ৩২) আষাঢ়ে রথযাত্রা যথেষ্ট প্রাচীন উৎসব। গ্রামের প্রবেশ পথে রথতলায় একদিনের মেলা হয়। বর্তমানে রথটি রয়েছে স্থানীয় রায় পরিবারের হেপাজতে।

ভাদ্রমাসে জন্মাষ্টমী তিথি উপলক্ষ্যে বাদেবালিয়া, নিজবালিয়া, গড়বালিয়া, শিয়ালডাঙ্গা, যমুনাবালিয়া প্রভৃতি গ্রামাদিতে পূজাপাঠ হয়ে থাকে বহু বাড়ীতেই। দু'দশক পূর্বেও ঐ উপলক্ষ্যে 'বাদাই গান' গাওয়া হতো। একদা এই এলাকায় 'বাদাই গান' খুবই জনপ্রিয় ছিল। স্থানীয় গীতকার, সুরকারবৃন্দই 'বাদাই গীত' রচনা করতেন।

প্রতি বছর ১লা মাঘ থেকে পরবর্তী পূর্ণিমা তিথির পূর্বদিন পর্যন্ত (মাঘী পূর্ণিমা) কতোয়ালী পীর (লোকমুখে ফতে আলীর যাত) স্মরণে মেলা বসে মুন্সিরহাট এলাকায় (খড়দা বামুনপাড়া মৌজা, শঙ্করহাটি গ্রামঃ পঃ)। কুম্ভকারদের তৈরী মাটির জিনিস ও পুতুল, খেলনা, ডোমেদের তৈরী বাঁশের তৈরী জিনিসপত্র বিক্রি হয় যথেষ্ট। বহুদূর থেকে লোকজন আসে। উৎসব উপলক্ষ্যে বহু ধর্মপ্রাণ মুসলমান, ফকির ও ভক্তের সমাবেশ হয়।

মাঘী পূর্ণিমা তিথি থেকে ফাল্গুনে শিবরাত্রির পূর্বদিন পর্যন্ত হরিসভা উৎসব উপলক্ষ্যে নিজবালিয়া গ্রামে মাইতি পরিবারের প্রাঙ্গণে একটি মেলা বসত। প্রায় শতাধিক বৎসরের প্রাচীন হরিসভা উৎসব ও মেলা প্রায় দেড় দশক পূর্বেই চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। পার্শ্ববর্তী গড়বালিয়া গ্রাম উৎসব মুখর হয়ে উঠত মান্না পরিবারের রাধাকান্তদেব তৎসহ নিতাই গৌর মূর্ত্তি আদিকে কেন্দ্র করে। রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনীযুক্ত মাটির পুতুলের প্রদর্শনী সজ্জা ছিল বিশেষ আকর্ষণ।

ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে সিদ্ধেশ্বর গ্রামে (জে. এল. নং ৬৪) স্বয়ম্ভু বুড়োশিবের মন্দির প্রাঙ্গণে এক সপ্তাহ ব্যাপী মেলা বসে। তবে বর্তমানে ঐ স্থানে স্থায়ী দোকানপাট, বাজার গড়ে ওঠায় মেলা তেমন জমে না।

প্রতি বছর বৈশাখ মাসে সীতানবমী তিথিতে নিজবালিয়ায় দেবী সিংহবাহিনীর বার্ষিক পূজা, হোম যাগ ও পরবর্তী দিবসে অন্নকূট উপলক্ষ্যে দু'দিন ব্যাপী মেলা বসে। বহু দূর দূরান্ত থেকে লোক সমাগম হয়ে থাকে। অন্নকূট উৎসবের সূচনা হয়েছিল ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে (খ্রিঃ ১৯৪০)। ঐ মন্দির প্রাঙ্গণেই আষাঢ়ে রথযাত্রা, চৈত্র সংক্রান্তিতে গাজন উপলক্ষ্যে একদিনের জন্য মেলা বসে।

নিজবালিয়া ও শঙ্করহাটি (লোকমুখে স্যাকরাহাটি) গ্রামে বহু পূর্বে (অন্ততঃ তিন

দশক) চৈত্রের গাজন উপলক্ষ্যে সঙের নাচ গান হতো। স্যাকরাহাটির গাজন সঙ এলাকায় জনপ্রিয় ছিল।

পাঁতিহাল গ্রামে মণ্ডলা পুষ্করিণী তীরে এবং বাঁকারায় তলায় জ্যৈষ্ঠমাসের অমাবস্যা তিথিতে ফলহারিণী কালিকা মাতার পূজা, সারারাত্র ব্যাপী উৎসব ও মেলা। ঐ উপলক্ষ্যে বাঁকারায় তলায় প্রায় ১৫টি এবং মণ্ডলায় শতাধিক ছাগ বলি হয়ে থাকে মানত / মানসিক পূজার নৈবেদ্যরূপে। উভয়স্থানেই দণ্ডীকাটা হয়।

শিয়ালডাঙ্গা গ্রামে দোলপূর্ণিমা তিথিতে বার্ষিক ব্রহ্মাপূজা এবং পঞ্চম দোল তিথিতে বাবা পঞ্চানন্দের বার্ষিক পূজা উৎসবাদি হয়ে থাকে এখনও। বর্তমানে ব্রহ্মাপূজার উদ্যোক্তা হল শিয়ালডাঙ্গা তরুণ সঙ্ঘ (রেজিঃ সংস্থা)।

আলোচ্য অঞ্চলটি তারকেশ্বরের শৈব মন্দির ও দশনামী শৈব সম্প্রদায়ের প্রভাব-বলয় মধ্যে অবস্থিত হবার কারণে প্রতিটি বর্ধিষ্ণু গ্রামেই রয়েছে শিব মন্দির। চৈত্র সংক্রান্তিতে ঐ সকল শিব মন্দিরে, স্থানীয় পঞ্চানন্দ থানে গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এলাকা মধ্যে মাজু, বোহারিয়া, নিজবালিয়া, গড়বালিয়া, শিয়ালডাঙ্গা প্রভৃতি গ্রামাদিতে গাজন উৎসবে সমারোহ লক্ষণীয়।

মাজু গ্রাম পঞ্চায়েতভুক্ত চোঙঘুরালি গ্রামে (জে. এল. নং ৩৮) সাপুড়ে পোতায় চড়ক হয় ২ বৈশাখ, আর একই মৌজার বেলডুবির মাঠে হয় ৩ বৈশাখ ; অপরপক্ষে ১ বৈশাখ চড়ক হয় মৌজা মাড়ঘুরালি (জে. এল. নং ৪১)-র আরুণেপোতায়। এসব চড়কেরও নাম আছে—টাটকা চড়ক, বাসি চড়ক ইত্যাদি।

মাজু বারোয়ারী অন্নপূর্ণা পূজা এ অঞ্চলের সর্বপ্রাচীন বারোয়ারী। ১২৯২ বঙ্গাব্দে (= ১৮৮৫ খ্রিঃ) বারোয়ারী অন্নপূর্ণা পূজার প্রবর্তন করেন চন্দ্রনাথ ঘোষাল। চন্দ্রনাথ ঘোষাল প্রয়াত হবার পর তাঁর পুত্র শ্যামাপদ ঘোষাল তৎসহ হরনাথ পাঠক, উমেশ চন্দ্র কাঁড়ার প্রমুখ এই বারোয়ারীর প্রাণস্বরূপ ছিলেন। বর্তমানে গ্রামবাসীদের উদ্যোগে উৎসবটি হয়ে থাকে।

বহু পূর্বে উত্তর মাজুর পথের ধারে পৌরাণিক দৃশ্যের অনুসরণে মাটির পুতুল সাজানো হত। এছাড়া প্রায় একমাস ধরে কবি, তরজা, রামায়ণ গান, চণ্ডীর গান, পুতুল নাচের আসর বসত। বাবুরাম কবিওয়ালার সঙ্গী হয়ে বাংলার প্রখ্যাত মহিলা কবি-গায়িকা শ্রীমতী তিনকড়ি, মাজুর অন্নপূর্ণা মূর্তি দর্শনে গেয়েছিলেন : "অন্নপূর্ণা বিরাজমান কাশীর তুল্য মাজুগ্রাম"...। স্থানীয় পাঠক ও গোলুই পরিবার পূজার ব্যয়ভার বহুদিন বহন করেছেন। বর্তমানে মাজু মিলন সঙ্ঘের উদ্যোগে পাকা মণ্ডপ তৈরী হয়েছে। ১৪০৫ বঙ্গাব্দে (= ১৯৯৯ খ্রিঃ) অন্নপূর্ণা পূজা উপলক্ষ্যে অন্নকূট উৎসব পঁচিশ বছরে পদার্পণ করল। নিজবালিয়ায় সন ১৩৪৭ সাল থেকে প্রতি বৎসর সীতানবমী তিথিতে দেবী সিংহবাহিনীর বার্ষিক পূজা, হোমযজ্ঞ এবং পরদিবস অন্নকূট উৎসব প্রতিপালিত হয়ে আসছে।

স্বাধীনতা সংগ্রাম

"এসেছে সে একদিন
লক্ষ পরাণে শঙ্কা না জানে, না রাখে কাহারো ঋণ,
জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন।"

পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হবার জন্য যখন সারা ভারতবর্ষ উত্তাল হয়ে উঠেছে, সারা দেশেই যখন জাতি, ধর্ম, শ্রেণী, বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আত্মবলিদানে উন্মুখ, সেই ঐতিহাসিক যুগসন্ধিক্ষণের প্রভাব জগৎবল্লভপুর জনপদেও পড়েছিল। এই ক্ষুদ্র জনপদেও সেদিন শোনা গিয়েছিল বিপ্লবের প্রলয় বিষাণ, ঘটেছিল সত্যাগ্রহ, আইন অমান্য আন্দোলন ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে, সেদিন কেউ নাম-খ্যাতি প্রচারের আলোয় দাঁড়ানোর লোভে এগিয়ে আসেননি—আগিয়ে এসেছিলেন প্রাণের আকুতিতে। কিন্তু অতীতের সেই কর্মবহুল জীবনের, দৃঢ় প্রত্যয়ের কোন ছবি বিশেষ কেউ রক্ষা করেননি। আজ সে কারণেই ঐ যুগ সন্ধিক্ষণের ছবিটিকে যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে বর্ণনা করা প্রায়শঃ আমার ক্ষুদ্র ক্ষমতার পক্ষে দুর্বহ ভার বলেই মনে হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে বিশালাকার হিমশৈল-র যেমন এক দশমাংশ মাত্র জলের উপরিভাগে থাকায় তার প্রকৃত পরিচয় সহজে নজরে পড়ে না, তেমনিভাবে আলোচ্য এলাকায় স্বাধীনতা আন্দোলনের বিবিধ কর্মসূচীর সামান্যতম জানিত অংশটুকুই বর্ণিত হলো, বহু অজ্ঞাত ও সুগুপ্ত তথ্য চিরকালের মত অজানাই রয়ে গেল।

সাধারণভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে দুটি কর্মধারা প্রবল আকার নিয়েছিল—

(১) অহিংস গণ আন্দোলন [অর্থাৎ আইন অমান্য আন্দোলন, সত্যাগ্রহ, বিলাতী বস্ত্র ও দ্রব্য বর্জন, স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদন ও ক্রয়-বিক্রয়, দেশাত্মবোধক পুস্তক পাঠ ও তার প্রচার-প্রসার ইত্যাদি]

(২) সশস্ত্র রক্ত ঝরা গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলন, অর্থাৎ রীতিমত দীক্ষা গ্রহণ, করে মন্ত্রগুপ্তি নিয়ে বিদেশী রাজশক্তিকে উৎখাত করার জন্য বলপ্রয়োগের কর্মসূচী অনুসরণ, আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার—যেখানে "প্রাণ দেয়া নেযার ঝুলিটা থাকে না শূন্য।"

জগৎবল্লভপুর জনপদে উভয় প্রকারের কর্মসূচীই অনুসৃত হয়েছে।

ইংরাজী ১৯১৮ সাল বা তার সমকালে জগৎবল্লভপুর জনপদ সংলগ্ন এলাকা ডোমজুড় থানার দফরপুর, ঝাপড়দহ বাজার অঞ্চলে জনাকয় একনিষ্ঠ দেশসেবকের প্রচেষ্টায় জনসেবামূলক কর্মসূচী গৃহীত হয়। ঐ সকল দেশসেবকগণ হচ্ছেন দফরপুর গ্রামের বামাপদ ঘোষ ; দক্ষিণ ঝাপড়দহের শিবপ্রসাদ মুখার্জী, ধীরেন মুখার্জী, আশুতোষ ভট্টাচার্য ; উত্তর ঝাপড়দহের খোদা বক্স প্রমুখ। এঁদের প্রচেষ্টাতেই জগৎবল্লভপুর থানার বিভিন্ন অংশে বিশেষতঃ পাঁতিহাল, মুন্সিরহাট, মাজু প্রভৃতি এলাকায় স্বদেশভক্তদের জীবনী এবং স্বদেশ প্রেমমূলক পুস্তকাদি, স্বদেশী দ্রব্যাদি বিক্রি করা হত। পাঁতিহাল দামোদর ইনস্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক শশিভূষণ দত্ত মহাশয় ঐ ধরণের পুস্তকাদির নিয়মিত ক্রেতা ছিলেন। [বলা বাহুল্য, ঐ এলাকায় শশিভূষণ বাবুর অপরিসীম প্রভাব

ছিল শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের উপর। তাছাড়া, উনি খ্রিঃ ১৯১৯ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত পাঁতিহালস্থ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। অনুমান করি, ছাত্রদের মধ্যে দেশপ্রেমের বীজ রোপণ করার ক্ষেত্রে শশিভূষণ বাবুর কিঞ্চিৎ অবদান ছিলই]।

১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দের শেষভাগ। ভারতবাসী কি পরিমাণ রাজনৈতিক অধিকার লাভ করতে পারে তা নিরূপণ করার জন্য আইনজীবি স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে একটি "রয়্যাল কমিশন" গঠিত হয়। কিন্তু ঐ রয়্যাল কমিশনে কোন ভারতীয়ের স্থান না হওয়ায় দেশব্যাপী আন্দোলনের সূচনা ঘটে। প্রকৃতপক্ষে প্রথম দফায় খ্রিঃ ১৯২৭ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত ইংরাজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রাম চলে। সেই সময়ে জগৎবল্লভপুর জনপদেও উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে স্বাধীনতা প্রাপ্তির আকাঙ্খায়।

১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে মাজু গ্রামে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ রাজনৈতিক সম্মেলনের আহ্বায়ক ছিলেন মাজু নিবাসী প্রখ্যাত কংগ্রেস কর্মী ও স্বাধীনতা যোদ্ধা সতীসাধন গায়েন। তাঁর সহযোগীরূপে ছিলেন মাজুর বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ গায়েন, জুজারসা-র (থানা পাঁচলা) দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায় সহ বহু স্বেচ্ছাসেবী। মাজু অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন দিনাজপুর নিবাসী প্রসিদ্ধ জননায়ক যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন দেশপ্রাণ বীরেন্দ্র নাথ শাসমল সহ বহু দেশকর্মী। প্রাদেশিক সম্মেলনটির অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন নবাসন নিবাসী ডাঃ প্রমথ নাথ নন্দী, এম. ডি।

সশস্ত্র বিপ্লবী কর্মীদের সংগঠন 'আত্মোন্নতি সমিতি' খ্যাত বিপিন বিহারী গাঙ্গুলীর গোপন কর্মস্থলের কয়েকটি ছিল পাঁতিহাল, মাজু এবং সংলগ্ন আমতা থানাধীন পানপুর গ্রামে। পাঁতিহাল গ্রামে গুপ্ত কেন্দ্রটির সাথে অনেকানেক স্থানীয় যুবাকর্মী জড়িত ছিলেন। এঁদের মধ্যে প্রতাপচন্দ্র ঘোষ বিশিষ্টতম। পাঁতিহাল নিবাসী প্রতাপচন্দ্রের জ্ঞাতি শত্রু ভেলো ঘোষ প্রমুখের গুপ্ত তৎপরতার দরুণ পুলিশ স্বদেশীদের গোপন কর্মকাণ্ডের হদিশ পায়। তৎপরে প্রতাপচন্দ্র গ্রেপ্তার হন, পরিশেষে নিখোঁজ। পরবর্তীকালেও বিপ্লবী প্রতাপচন্দ্রের কোন হদিশ মেলেনি। জানা গেছে, কলকাতা ও হাওড়ার বিভিন্ন এলাকার বহু গুপ্ত বিপ্লবী প্রয়োজনবোধে পাঁতিহাল কেন্দ্রে আত্মগোপন করতেন। অপরপক্ষে প্রতাপচন্দ্রের সঙ্গে বাঙলার বাঘা বাঘা বিপ্লবী যথা কানাইলাল দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, যতীন সেন, কুঞ্জবিহারী গাঙ্গুলী প্রমুখের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। অহিংস অসহযোগ আন্দোলন বা সত্যাগ্রহের সঙ্গে যুক্ত কর্মীরা প্রেসিডেন্সী জেলে অন্তরীণ থাকাকালে প্রতাপচন্দ্র ঘোষের কীর্তি কাহিনীর কিছু আভাস পেয়েছিলেন মাত্র।

১৯৩০ খ্রিঃ, ৪ঠা এপ্রিল তারিখে রূপনারায়ণ নদ তীরবর্তী শিবগঞ্জে লবণ সত্যাগ্রহ শুরু হয়। সত্যাগ্রহীরা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে বিশিষ্ট দেশকর্মী ও শিক্ষাবিদ বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে লবণ সত্যাগ্রহে অংশ নেন। প্রথম দলটির যাত্রাপথ ছিল ভায়া বড়গাছিয়া, পাঁতিহাল, মুন্সিরহাট ইত্যাদি। এই দলেও জগৎবল্লভপুর, পাঁচলা, আমতা থানা এলাকার অনেক স্বেচ্ছাসেবী ছিলেন।

১৯৩০ সালের ১৪ জুলাই বৈকাল ৩.৩০ মিঃ নাগাদ সময়ে বড়গাছিয়াস্থিত আবগারি দোকানের [গাঁজা, সিদ্ধি, ভাঙ ইত্যাদি] সামনে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে কারারুদ্ধ হন হাঁটালের কালীপদ সাউ, গোপী সাউ, পাঁতিহালের অজিত মজুমদার, শচীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রমুখ। হাওড়া কোর্টে সোপর্দ হলে বয়স কম থাকার কারণে অজিত মজুমদারের পাঁচ মাস এবং বাকী সকলের ছয় মাস কারাদণ্ড হয়। ওঁরা প্রথমে প্রেসিডেন্সী জেলে, তারপর বহরমপুর জেলে অন্তরীণ থাকেন। বলা বাহুল্য, প্রেসিডেন্সী, বহরমপুর, হুগলী, ফরিদপুর, রাজশাহী জেলগুলিতে রাজবন্দীদের সাথে অমানুষিক ব্যবহার করা হত। আগষ্ট, ১৯৩০ খ্রিঃ, প্রেসিডেন্সী জেলে বিখ্যাত পাগলাঘন্টির বিবরণ অনেকেরই জানা আছে। উপরিউক্ত জেলগুলির অবস্থা সম্পর্কে বিপ্লবী ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত তাঁর "বিপ্লবের পদচিহ্ন" গ্রন্থে যৎসামান্য বিবরণ দিয়েছেন—"......প্রেসিডেন্সী জেলে দেখে এলাম, রাজবন্দীরা কি অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। শুনেছি, বহরমপুর জেলে, ফরিদপুর জেলে, হুগলি জেলে, রাজসাহী জেলে জীবন আরও দুর্বহ, নির্জন কারাবাস আরও কঠোর—" [পৃঃ ৭৩]। প্রেসিডেন্সী জেলে পাগলা ঘন্টির সময় পাঁতিহালের অজিত মজুমদার রীতিমত আঘাত পান পিঠে, তারপরেই বহরমপুর জেলে সরিয়ে দেয়া হয় তাঁকে। অজিত মজুমদার খুবই ডাকাবুকো এবং প্রখর বুদ্ধিধর ছিলেন। [এঁর কাহিনী পরে বিবৃত করেছি]।

পাঁতিহালে ত্রিশের দশকে ফুটবল খেলা ছিল খুব জনপ্রিয়। পাঁতিহালের পঞ্চানন সাঁবুই (পঞ্চু—পচু সাঁবুই নামেও পরিচিত) তাঁর মাতৃদেবী সরস্বতী দেবীর নামে শীল্ড দান করায় ফুটবল দলের নাম রাখা হয় পাঁতিহাল সরস্বতী স্পোর্টিং ক্লাব আর ফুটবল খেলার মাঠের নাম হয় সরস্বতী গ্রাউণ্ড। সরস্বতী গ্রাউণ্ড তো কেবল খেলার মাঠ নয়—জনসমাবেশ, মিটিং-এর আদর্শ স্থানও বটে। সরস্বতী গ্রাউণ্ডের বিচিত্র অবস্থান হেতু পাঁতিহাল, বড়গাছিয়া, মানসিংহপুর, হাঁটাল, বাদেবালিয়া, যমুনাবালিয়া, নিজবালিয়া, গড়বালিয়া, ইছাপুর, নিমাবালিয়া রণমহল প্রভৃতি কাছের ও দূরের গ্রামের সাথেও ভালো যোগাযোগ। ঐ সরস্বতী গ্রাউণ্ডে কংগ্রেস কর্মী সতীসাধন গায়েনের নেতৃত্বে নুনমাটি জ্বাল দিয়ে লবণ তৈরী করে প্যাকেট পিছু দু'আনা মূল্যে বিক্রি করা হয়েছিল—লবণ সত্যাগ্রহের কালে।

১৯৩২ খ্রিঃ ২২শে জানুয়ারি হাওড়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যার উদ্দেশ্যে হাওড়া-আমতা মার্টিন রেলপথে পাঁতিহাল স্টেশনে রেলগাড়ীর সেলুন কামরায় বোমা নিক্ষেপ করা হয়। ঐ ঘটনায় তিনজন কনস্টেবল আহত হয়। [দ্র. বাংলায় বিপ্লববাদ ঃ নলিনীকিশোর গুহ। বৈশাখ, ১৩৬১। পৃঃ ২২৬]। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হাওড়া শহরের বাসিন্দা [৭ বৈকুণ্ঠ চ্যাটার্জী লেন, হাওড়া] বিপ্লবী কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ধৃত হন ও বিচারে জেল হয়।

খ্রিঃ ১৯৩০-৩৪ সালের মধ্যে জগৎবল্লভপুর জনপদে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে বহু স্বেচ্ছাসেবী কারাবরণ করেন। এঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম-পরিচয়

পাওয়া গেছে। যেমন, পাঁতিহালের শচীন ঘোষ, বারীণ ঘোষ, হরেকৃষ্ণ মাজী, পশুপতি শাস্ত্রী, দুলাল কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত কুমার মজুমদার ; হাঁটাল গ্রামের কালীপদ সাউ, গোপী সাউ ; মাজু গ্রামের (বসু পরিবারের সদস্যা) বাসন্তী বসু, কালীপদ গায়েন, অরবিন্দ গায়েন প্রমুখ। পরবর্তীকালে এই সকল দেশকর্মীদের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন গড়বালিয়া গ্রামের বৃন্দাবন মান্না, যুধিষ্ঠির মান্না, শীতলচন্দ্র মান্না, মানসিংহপুরের বৃন্দাবন পাঁজা সহ আরো অনেকে।

এঁরা ছাড়াও অপরাপর দেশসেবীরা হলেন হাঁটালের গৌর মালিক, সুফল মান্না (পরবর্তীকালে শুদ্ধানন্দ সরস্বতী), পোলগুস্তিয়ার অমৃতলাল হাজরা (যিনি ১৯৫২ খ্রিঃ তে কংগ্রেসী এম. এল. এ) চেতনানন্দ গিরি (মুন্সিরহাট নিবাসী) প্রমুখ।

মাজু গ্রামের অনতিদূরবর্তী পানপুর গ্রামে (থানা আমতা) মতিবাবুর পঁচিশ বিঘা আয়তনের বাগানবাড়ীটি ছিল 'আত্মোন্নতি সমিতি'-খ্যাত বিপিন বিহারী গাঙ্গুলীর একটি গোপন কর্মকেন্দ্র। এ কেন্দ্রের সাথে বহু বিপ্লবী দেশকর্মী যুক্ত ছিলেন কিন্তু গোপনীয়তা ও সুরক্ষা হেতু তাঁদের নামধাম জানা যায়নি।

জগৎবল্লভপুর জনপদে মাজু নিবাসী সতীসাধন গায়েন ছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। তাঁর কর্মকাণ্ডের কিছু অপ্রকাশিত তথ্য দিয়েছেন ডোমজুড়ের ঝাপড়দহ ডিউক ইনস্টিটিউশনের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ও অভিজ্ঞ রাজনৈতিক কর্মী শ্রী দুঃখহরণ ঠাকুর চক্রবর্তী। ঐ সূত্রে জানা যাচ্ছে—

গ্রামের মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করে তোলার জন্য সতীসাধনবাবু তাঁর বিশিষ্ট অনুগামী আমতা থানার খড়দহ গ্রামনিবাসী সুফল চন্দ্র মান্না-কে [পিতা রাখালচন্দ্র মান্না] সুবিখ্যাত স্বদেশী গায়ক-অভিনেতা মুকুন্দ দাসের যাত্রাদলের অনুকরণে যাত্রাদল খুলতে প্রেরণা দেন। সুফলবাবু ঐ প্রকার স্বদেশী গানের যাত্রাদল খোলেন এবং গ্রাম-গ্রামান্তরে যাত্রাভিনয় ও সঙ্গীতের মাধ্যমে ইংরাজ শাসন বিরোধী প্রচারে রত হন। সতীসাধনবাবু এইভাবে একদিকে স্বাধীনতালাভের আন্দোলন সংগঠিত করেন, অপরদিকে উপযুক্ত কর্মী, স্বেচ্ছাসেবীর দল গড়ে তোলেন।

সতীসাধনবাবুর আর একটি ঘটনা যেমন বিচিত্র বা অভিনব, তেমনি কৌশলপূর্ণ। ঘটনাটি হচ্ছে, জনৈক উচ্চপদস্থ রাজপুরুষের শুভাগমন ঘটবে মাজু গ্রামে—এমন একটি সংবাদ বিশ্বস্ত সূত্রে পাবার পর সতীসাধনবাবু স্বেচ্ছাসেবীদের গোপন নির্দেশ পাঠান। রাজপুরুষটির যথাসময়ে শুভাগমন ঘটলে দেখা গেল মাজু-স্টেসন চত্বরে অসংখ্য গরু ঘুরে বেড়াচ্ছে আর প্রতিটি গরুর পিঠে রাজপুরুষটির নাম জ্বলজ্বল করছে। বলাবাহুল্য, এহেন পন্থায় অপমানিত হবার পর রাজপুরুষটি অবিলম্বে অকুস্থল পরিত্যাগ করেন।

সতীসাধনবাবুর একটা হাত ছিল অকর্মণ্য কিন্তু যেখানেই প্রয়োজন হয়েছে সেখানেই হয় তিনি নিজে উপস্থিত থেকেছেন দলবল নিয়ে, নতুবা প্রয়োজনীয় সংখ্যক দায়িত্বশীল স্বেচ্ছাসেবী পাঠিয়েছেন কার্যোদ্ধারের জন্য।

একবার মার্টিন ট্রেন যোগে কলকাতা থেকে বিলাতী কাপড় ও প্রচুর পরিমাণ

বিদেশী মদ আমদানীর খবর সতীসাধন বাবুর কাছে পৌঁছালে মাকড়দহের কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবী ললিতমোহন চৌধুরী ও অন্যান্যদের সহায়তায় ঐগুলি নষ্ট করে দেয়ার ব্যবস্থা উনি করেন।

১৯৩০ খ্রিঃ সতীসাধনবাবুর উদ্যোগে কৃষকদের স্বার্থে কেদোর জলা-মাঠের উন্নতির জন্য কাদুয়া খাল সংস্কারের কাজ হয়। সন ১৩৩৮ সালে সতীসাধনবাবু প্রয়াত হন। ১৩৫২ সালে তাঁর স্মৃতিতে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বর্তমানে সতীসাধন বিদ্যামন্দিরটি মাজু গ্রন্থাগার ভবনের পূর্বপার্শ্বে অবস্থিত।

পাঁতিহাল গ্রামের অজিত মজুমদারের নাম উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। অজিতবাবু যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে পাঠকালে তিন-চারজন মিলে মেদিনীপুরের বাঘাজল গ্রামে যান খাজনা বন্ধ রাখার জন্য সভা করতে। তাঁদের সঙ্গে ছিল হ্যাণ্ড প্রেস (লিথো), প্রচারপত্র ইত্যাদি। সভা সেরে তমলুকে অজয় মুখোপাধ্যায়ের সাথে ওনারা মিলিত হন এবং অজয়বাবুর পত্রসহ স্থানান্তরে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে চারজন পুলিশ সাইকেলে ধাওয়া করলে সঙ্গীরা পালিয়ে যায়। অজিতবাবু ধরা পড়ার পূর্বে অজয়বাবুর চিঠি চিবিয়ে নষ্ট করে দেন। বিষ্ণুপুরে বিচার হয়, ছ'মাসের কারাদণ্ড হয়। [দ্র. স্বাধীনতা আন্দোলনে হাওড়া জেলা— দুঃখহরণ ঠাকুর চক্রবর্তী। কলিকাতা, ১৯৯৯। পৃঃ ১৫২-৫৩]

গড়বালিয়ার বৃন্দাবন মান্না স্বাধীনতা আন্দোলনের কালে উদয়নারায়ণপুর থানার কানুপাট অঞ্চলে স্বদেশি পাঠশালা স্থাপন করেন এবং গোপনে আন্দোলন সংগঠিত করতে থাকেন। ৪২-এর আগষ্ট আন্দোলনের সময় মাজু বাজার এলাকায় বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় গ্রেপ্তার হন। তিনি প্রথমে প্রেসিডেন্সী জেলে অন্তরীণ থাকেন। শোনা যায়, তাঁকে বহরমপুর জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। তারপর বৃন্দাবন মান্না নিখোঁজ হয়ে যান। পাঁতিহালের বিপ্লবী প্রতাপ চন্দ্র ঘোষের মতই স্বাধীনতাকামী বৃন্দাবন মান্নার শেষ পরিণতি এ যাবৎ অজ্ঞাত। [দ্র. হাওড়া জেলার একটি গ্রাম গড়বালিয়া—শিবেন্দু মান্না। কৌশিকী, ১৯৯৬, পৃঃ ১৫৩]

সশস্ত্র বিপ্লব আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ বহু সময়ে কৌশলগত কারণে আইন অমান্য আন্দোলন, অহিংস সত্যাগ্রহে অংশ নেয়ার নির্দেশ দিতেন সহযোগী কর্মীদের। জগৎবল্লভপুর, আমতা প্রভৃতি থানাঞ্চলে বিপ্লবী বিপিন বিহারী গাঙ্গুলীর আত্মোন্নতি সমিতির সাথে যুক্ত কোন কোন কর্মী, সত্যাগ্রহে বা আইন অমান্য আন্দোলনেও অংশ নিয়েছেন আবার গুপ্ত বিপ্লবীদলেও যুক্ত থেকেছেন।

মাজু নিবাসী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমে হাওড়া জেলা কংগ্রেস সভাপতি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং সম্পাদক হরেন্দ্রনাথ ঘোষের সাথে পরিচয় সূত্রে কংগ্রেস কর্মী হিসাবে দেশসেবা শুরু করেন। কিছুকাল পরে বিপ্লবী বিপিন বিহারী গাঙ্গুলীর দলে যোগদান করেন। ১৯৩০ খ্রিঃতে মাজু বাজারে আবগারি দোকানে পিকেটিং করার সময় গ্রেপ্তার হন, পরিণামে ছ'মাস কারাবাস। প্রেসিডেন্সী জেলে নির্জন সেলে ডাণ্ডাবেড়ী

সাজাও ভোগ করেন। দমদম জেলে থাকাকালীন সময়ে পাঞ্জাবের গদর পার্টির নেতা বাবা গুরুদিৎ সিং সহ একাধিক বিপ্লবী নায়কের সান্নিধ্যলাভ করেন। এছাড়া মাজুর সতীসাধন গায়েনের সহকর্মীরূপেও দেশসেবা করেছেন।

জগৎবল্লভপুর থানার হাঁটাল, বোহারিয়া গ্রামাদির সাথে পাঁচলা থানার জুজারসা, কুলডাঙ্গা গ্রামাদির নিত্য যোগাযোগ। স্বাধীনতা আন্দোলনের কালে জুজারসা গ্রামের প্রখ্যাত কংগ্রেস কর্মী দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়, সুফল চন্দ্র মান্না সহ আরও অনেকেই পূর্বোক্ত হাঁটাল বোহারিয়ায় নিত্য যাতায়াত কবতেন, স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মীদের মদত দিতেন। ১৯৩২ খ্রিঃ-তে বোহারিয়া শিবতলা প্রাঙ্গণে একটি সভায় দুর্গাপদবাবু জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে কংগ্রেস পতাকাসহ শোভাযাত্রা করে কুলডাঙ্গা বাজারে গিয়ে সত্যাগ্রহ শুরু করলে গ্রেপ্তার হন। ইনিই ইতিপূর্বে ১৯২৭ খ্রিঃ-তে মাজুতে অনুষ্ঠিত বঙ্গ ীয় রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে এবং ১৯৩০ খ্রিঃ-তে উত্তরপাড়ায় বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯৩০ খ্রিঃ এবং ১৯৩২ খ্রিঃ, দু'বারই কারাবাস ঘটে।

জুজারসা গ্রামের সুফল চন্দ্র মান্না [পিতা—হরিদাস মান্না] এর সাথেও হাঁটাল-বোহারিয়ার যোগ ছিল। ১৯৩২ খ্রিঃ ইনিও গ্রেপ্তার হন। এঁর বৈচিত্র্যময় জীবনে বহুবার গ্রেপ্তার হয়েছেন। ইনি হাওড়া জেলা জুড়েই কাজ করেছেন। ১৯৫০-৫১ সাল নাগাদ সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করে হাঁটাল গ্রামে একটি মঠবাড়ী স্থাপন ও ধর্মকর্মের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করেন। বোহারিয়া নিবাসী হীরালাল মান্না ছিলেন জনৈক স্বাধীনতা সংগ্রামী।

মাজু-র বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী সতীসাধন গায়েনের ভাইপো অরবিন্দ গায়েন ১৯৩০ খ্রিঃ মাজু বাজারে পিকেটিং কালে গ্রেপ্তার হন। হাওড়া কোর্টে সোপর্দ করা হলে তিনি রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতা দেন। ঐ কারণে ছ'মাস কারাবাস হয়। কারাবাসের প্রথম মাসের পরে মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট এক বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন। সংগ্রাম কালে শরৎচন্দ্র বসু, কালী মুখার্জী ও বিপিন বিহারী গাঙ্গুলীর সাহচর্য লাভ করেন।

রামচন্দ্রপুর নিবাসী (থানা-বাগনান, জে. এল. নং ৭৭) ধরণীধর মাইতি, সেহাগড়ী নিবাসী (থানা-আমতা, জে এল. নং ১১২) কানাইলাল রায় প্রমুখ সত্যাগ্রহীরা ১৯৩৭ খ্রিঃ-তে মাজুতে সত্যাগ্রহকালে গ্রেপ্তার হন এবং পরিণামে কারাবাস করেন। এছাড়া শ্যামপুর থানার নাওদা গ্রামের (জে. এল. নং ২৩) সন্তোষকুমার মাইতি ১৯৩০ খ্রিঃতে বড়গাছিয়ায় সত্যাগ্রহকালে গ্রেপ্তার হন, সাতমাস কারাদণ্ড ভোগ করেন।

জগৎবল্লভপুর থানার জালালসী গ্রামের সতীশ মাল ও সমতুল মাজী প্রমুখ স্বেচ্ছাসেবী দেশকর্মীবৃন্দ সত্যাগ্রহকালে প্রভূত সহায়তা দিয়েছেন। সতীশ মাল অর্থসাহায্য ব্যতিরেকে সত্যাগ্রহীদের খাদ্য, গোপন আশ্রয় যেমন দিতেন, তেমনিভাবে দায়িত্ব সহকারে সভার স্থান নির্বাচন, আন্দোলন পরিচালনাও করেছেন। সমতুল মাজীও নিষ্ঠাবান কর্মী ছিলেন।

মাজু গ্রামের বসু পরিবারের বাসন্তী দেবী ১৯৩০ খ্রিঃ মাজুতে সত্যাগ্রহকালে গ্রেপ্তার

হন, কারাবরণ করেন। ইনি ছাড়া এলাকার আর কোন মহিলা, স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন কিনা জানা যায় না।

সুতরাং স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন ঘটনাসূত্রে বোঝা যাচ্ছে, ১৯১৮ খ্রিঃ থেকে ১৯৪২ খ্রিঃ পর্যন্ত বড়গাছিয়া, পাঁতিহাল, মুন্সিরহাট, মাজু প্রভৃতি এলাকা তো বটেই, জগৎবল্লভপুর থানার গ্রাম-অভ্যন্তরেও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অবাধ কর্মক্ষেত্র ছিল। নিকটবর্তী ও বহু দূরবর্তী এলাকা থেকেও স্বাধীনতা সংগ্রামীরা নিত্য যাতায়াত করতেন তাও সুস্পষ্ট। তাই আজ বলা চলে, স্বাধীনতা আন্দোলন কালে জগৎবল্লভপুরের অধিবাসীরা কাঠবিড়ালীর সেতুবন্ধনের ভূমিকা নিষ্ঠাভরেই পালন করেছিল। তবে একদিন যাঁদের বীজমন্ত্র ছিল—"মাগো, যায় যেন জীবন চলে, / শুধু জগৎ মাঝে তোমার কাজে / বন্দেমাতরম বলে", তাঁদের কথা, স্মরণে মননে কেউ রেখেছেন কিনা সন্দেহ। অথচ এঁদের অবদানের আলোচনা ব্যতিরেকে আলোচ্য এলাকার ইতিহাস তো অসম্পূর্ণ।

কৃষক আন্দোলন

"ভূমিই আমাদের মূলধন এবং কৃষককেরাই আমারদের প্রতিপালক। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়, যাহারা এমন হিতৈষী—সংসারের এমন সুখ সঞ্চারক, তাহাদের দারুণ দুর্দশা দেখিয়া হৃদয় ব্যাকুল হয়! 'যে রক্ষক সেই ভক্ষক'-এ প্রবাদ বুঝি বাঙ্গলার ভূস্বামীদিগের ব্যবহার দৃষ্টেই সূচিত হইয়া থাকিবেক।"

১৮৫০ খ্রিঃ-তে অক্ষয়কুমার দত্তের এই প্রকারের লিখিত মন্তব্যের পরিবর্তন, কৃষকদের অবস্থার হেরফের পরবর্তী প্রায় এক শতাব্দীকালের মধ্যেও বিশেষ হয়নি।

১৯৩৯-৪০ খ্রিঃ নাগাদ সময়ে রাজনৈতিক দলের কর্মীদের উদ্যোগে কৃষক সভা বা কৃষক সমিতি গঠিত হবার ফলে কৃষিক্ষেত্রে আন্দোলনের ও পরিবর্তনের সূচনা ঘটে। এই প্রকার আন্দোলন ও পরিবর্তনের ঢেউ জগৎবল্লভপুর জনপদেও পৌঁছেছিল। আলোচ্য জগৎবল্লভপুর অঞ্চল তো দেশ-বিচ্ছিন্ন কোন এলাকা নয়, সুতরাং জগৎবল্লভপুরের পার্শ্ববর্তী ডোমজুড়, পাঁচলা, আমতা, সাঁকরাইল প্রভৃতি থানা-এলাকায় সংঘটিত বিষয়ের ফলাফলের সাথে আলোচ্য এলাকার বিবিধ ঘটনাবলীর যোগসূত্র ছিলই।

সমগ্র হাওড়া জেলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ জনিত প্রভাব ও কর্মকাণ্ড অর্থাৎ শিল্পাঞ্চল ও শিল্প-শ্রমিক, পাটকল মজুর, পাটচাষী, ধানচাষী, ভাগচাষী, ক্ষেতমজুরদের অবস্থান, ট্রেড ইউনিয়ন, জমিদার-জোতদার বনাম কৃষক সমিতি, প্রগতিশীল বামপন্থী ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের টানাপোড়েন ইত্যাদি বিষয়ের মিলিত প্রভাবের দ্বারা জগৎবল্লভপুর ও সন্নিহিত থানা-এলাকা কখনও কখনও উত্তাল হয়ে উঠেছে। তার পরিণতিও বহুক্ষেত্রেই বেদনাদায়ক হয়েছে।

জগৎবল্লভপুর সংলগ্ন পাঁচলা, আমতা প্রভৃতি থানা এলাকার বিভিন্ন অংশে জমিদার-জোতদাররা বহু বিচিত্র পদ্ধতিতে কৃষক-প্রজাদের ফসল হরণ করত, নিপীড়ন চালাত। এসব পদ্ধতির নাম ছিল কুৎখামার (গড়পড়তা হিসাব করে ধান্যাদি ফসল আদায়), কাস্তে কাড়া (অবাধ্য কৃষক প্রজাকে ফসল কাটতে না দেয়া ও প্রাপ্য ফসল থেকে বঞ্চিত করা, তহুরী (উৎকোচ প্রদানে বাধ্য করা), পার্বণী (পুজাদি উপলক্ষ্যে ফসল, অর্থ বলপূর্বক আদায় করা), হিসাবানা ইত্যাদি।

ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯ খ্রিঃ। জগৎবল্লভপুর থানার দক্ষিণ সীমান্ত এলাকা সংলগ্ন জুজারসা গ্রামে (পাঁচলা থানা) হাওড়া জেলা কৃষক সমিতির প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ অধিবেশনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন জুজারসা গ্রামের বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায় ও পার্শ্ববর্তী কুলডাঙ্গা গ্রামের হাতেম পুরকাইত।

এই প্রথমবারের হাওড়া জেলা কৃষক সমিতির অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন ডঃ ভূপেন দত্ত। বঙ্কিম মুখার্জী, সমর মুখার্জী, শ্যামাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য সহ অনেকানেক বিশিষ্ট বামপন্থী ব্যক্তিত্ব ঐ অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। ঐ অধিবেশনে হাওড়া জেলা কৃষক সমিতির প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন কংগ্রেস সোসালিষ্ট পার্টির শিবনাথ ব্যানার্জী এবং সম্পাদক পদে বৃত হন বিশিষ্ট পাটকল ট্রেড ইউনিয়ন নেতা মদন দাস। বলা বাহুল্য, কৃষক সমিতি প্রতিষ্ঠার সময়ে কংগ্রেসের বামপন্থী অংশ সমেত ধর্মনিরপেক্ষ সকল রাজনৈতিক দলের কর্মীরাই যুক্ত ছিলেন ঐ সমিতির সাথে।

যাহোক, একই সময়ে জুজারসা গ্রামে আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। জুজারসা গ্রামের জমিদারের অবিচার, অন্যায় আচরণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকেরা সঙঘবদ্ধ আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলন "কাস্তে কাড়া আন্দোলন" নামে সুপরিচিত। এই প্রকার কাস্তে কাড়া আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন পূর্বোক্ত দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায় ও হাতেম পুরকাইত।

হাওড়া জেলা কৃষক সমিতির দ্বিতীয় অধিবেশন হয় আমতা শহরে। ঐ দ্বিতীয় সম্মেলনের অল্প কিছুকাল পরেই জগৎবল্লভপুর থানার ইসলামপুরে অনুষ্ঠিত হয় "কান্দুয়া সম্মেলন।"

কান্দুয়া, লোকমুখে কেদোর জলা-মাঠ, আমন ধান চাষের সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্রটি আসলে দামোদর নদের 'ব্যাক সোয়াম্প' অঞ্চল। এই অঞ্চলটির পরিমাণ হবে প্রায় এক লক্ষ বিঘা। সুবিস্তীর্ণ এই এলাকাটির প্রধান সমস্যা বর্ষাকালে অতিরিক্ত জলের চাপ এড়ানোর জন্য উপযুক্ত নিকাশীর অভাব। সে সময়, যে কারণে আমন ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াই একমাত্র বিধিলিপি ছিল। আর আমন ধানের চাষই ছিল কৃষকের একমাত্র অবলম্বন।

কান্দুয়া বা কেদোর জলা-মাঠের পশ্চিম দিকে আমতা থানা, পূর্বদিকে জগৎবল্লভপুর থানা এলাকা। কেদোর জলা-মাঠ সংলগ্ন জগৎবল্লভপুর থানাধীন গ্রাম বসতিগুলি হচ্ছে ইসলামপুর, জালালসী, পোলগুস্তিয়া, মাজু, ধসা, ভূঃ ব্রাহ্মণপাড়া ইত্যাদি।

১৯৩০ খ্রিঃ-তে কান্দুয়া খাল সংস্কারে ব্রতী হয়েছিলেন মাজুর কংগ্রেস কর্মী

সতীসাধন গায়েন। সুতরাং বুঝতে পারা যাচ্ছে সুবিস্তীর্ণ এলাকার কৃষকদের স্বার্থ কান্দুয়ার জলা-মাঠের উন্নতির সাথে যুক্ত রয়েছে।

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে, ১৯৪৬ খ্রিঃ সেপ্টেম্বর মাসে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার ঘোষিত কর্মসূচীর ভিত্তিতে প্রথম দফার তে-ভাগা আন্দোলনের সূচনা হয়।

উৎপন্ন ফসলের তিনটি ভাগ থেকে "তে-ভাগা" ধ্বনি-র উৎপত্তি। "তে-ভাগা" হচ্ছে কৃষকের ন্যায্য দাবী। তে-ভাগা দাবী অনুসারে উৎপন্ন ফসলের দু'ভাগ প্রাপ্য কৃষকের, একভাগ জমির মালিক জমিদার, জোতদার-এর। কারণ, শ্রম ও অর্থ বিনিয়োগ করে কৃষক। অথচ প্রচলিত প্রথায় কৃষকের প্রাপ্য হিসাব করলে তার সারা বছরের খোরাকী জোটানো ভার ছিল। তদুপরি কৃষকের নিজ শ্রমের কোন মূল্য ধরাও হত না। তাই কৃষকের দুর্গতির অবসানও হত না।

অবশ্য "তে-ভাগা"-র দাবী বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সমিতি জানালেও তার উৎস রয়েছে ১৯৪০ খ্রিঃ-তে দাখিলকৃত ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশের মধ্যে। ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশ ছিল—

(১) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তথা জমিদারী প্রথার বিলোপ করতে হবে ;

(২) প্রচলিত ভাগচাষী প্রথার অবসান না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট কৃষক উৎপন্ন ফসলের দু'ভাগ পাবে, বাকী একভাগ পাবে জমির মালিক জমিদার বা জোতদার ;

(৩) ভাগচাষীকে আইনগত স্বীকৃতি দিতে হবে। কৃষিজমিতে কৃষকের স্বত্ব থাকবে আইনের ভিত্তিতে।

১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাস নাগাদ অর্থাৎ ধানকাটার মরশুমে জগৎবল্লভপুর ও ডোমজুড় থানার বিভিন্ন গ্রাম এবং সংলগ্ন হুগলী জেলার কয়েকটি গ্রামে প্রথম দফায় তে-ভাগা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। রাজাপুরের মাঠ, হাঁটাল-বোহারিয়ার মাঠ, সন্তোষপুরের মাঠ এলাকার কৃষকেরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিল বামপন্থী রাজনৈতিক দলের কর্মীদের প্রয়াসের ফলে। একটি হিসাব সূত্রে জানা গেছে, হাওড়া জেলার ডোমজুড়, জগৎবল্লভপুর এবং সংলগ্ন চণ্ডীতলা থানা (হুগলী জেলা)-এলাকাধীন প্রায় পঁচিশ হাজার বিঘা শালীজমির ভাগচাষীরা তে-ভাগা আন্দোলনে সামিল হয়েছিল প্রথম দফায়।

ডিসেম্বর, ১৯৪৬ খ্রিঃ, ইংরাজ রাজত্বে শেষবারের ধান তোলা, ধানঝাড়ার কাজ কতকটা শান্তিপূর্ণ ছিল। ছোট ছোট জোতের মালিকেরা কোথাও রসিদের বিনিময়ে, কোথাও পুরাতন প্রথা, ধর্মভয়ের রক্ষাকবচের জোরে বিনা রসিদে ধান আদায় করে নেওয়ায় আপাতভাবে শান্তি বজায় ছিল। যদিও ধান কাটার সময়ে লাল ঝাণ্ডা উড়িয়ে দল বেঁধে স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত হত ক্ষেত-খামার। আধি নয়, তে-ভাগা চাই ; রসিদ ছাড়া ধান নাই ; নিজ খামারে ধান তোল ; জান দেব তো ধান দেব না ইত্যাদি স্লোগান খুব জনপ্রিয় ছিল ঐ সময় ; অপরদিকে ঐ সময় পুলিশ প্রহরা ছিল রাজাপুর, সন্তোষপুর প্রভৃতি এলাকায়। কিন্তু কোন বিশৃঙ্খলা না ঘটায় পরিবেশ চরমভাবে অশান্ত হয়ে উঠেনি।

১৫ আগষ্ট, ১৯৪৭ খ্রিঃ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ। দ্রুত পট পরিবর্তন। স্বাধীন কংগ্রেস সরকার তে-ভাগার বিপক্ষে। যদিও তে-ভাগা আন্দোলন মূলতঃ অর্থনীতি ভিত্তিক, তৃণমূল স্তরে কৃষকের স্বার্থবাহী, তথাপি এর রাজনৈতিক দিকও প্রবলভাবে বর্তমান ছিল। ফলে রাজনৈতিক আদর্শ ও বিশ্বাস এবং পন্থার সঙ্ঘাত ঘটে তে-ভাগা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে, কংগ্রেস এবং বামপন্থী মতবাদীদের মধ্যে।

২৬ মার্চ, ১৯৪৮ খ্রিঃ। স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনি ঘোষিত। বামপন্থী নেতাদের অনেকেই অন্তরীণ-সুযোগ বুঝে আত্মগোপন করেন। ইতিমধ্যে কমিউনিষ্ট পার্টির নির্ধারিত কর্মসূচী অনুসারে দক্ষিণভারতে তেলেঙ্গানা বিপ্লব এবং দক্ষিণ বঙ্গের কাকদ্বীপ, চন্দনপিঁড়ি, লালগঞ্জ, বুদাখালি, সন্দেশখালি, রাজনগর প্রভৃতি অঞ্চলে জোতদার, জমিদার ও দেশীয় শাসকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র কৃষক আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। এই সকল ঘটনার ফলাফলে ১৯৪৯ খ্রিঃ-র সূচনা কালেই পুনরায় জোরদার তে-ভাগার দাবীতে কৃষক আন্দোলন সংঘটিত হয় হাওড়া জেলার কয়েকটি এলাকায়। ঐ সকল এলাকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

সাঁকরাইলের মাসিলা গ্রামাদি ও জগৎবল্লভপুর থানার সন্তোষপুর, হাঁটাল, বোহারিয়া, ইসলামপুর, শিয়ালডাঙ্গা, রণমহল প্রভৃতি গ্রামাদি। কৃষকেরা তে-ভাগার দাবীতে দলবদ্ধ হন জগৎবল্লভপুর জনপদের অন্যান্য গ্রামেও।

২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৯ খ্রিঃ। সাঁকরাইল থানার মাসিলা গ্রামে দ্বিপ্রহরে পুলিশের গুলিতে তিনজন মহিলা সমেত মোট আটজন শহীদ হন। এঁরা হলেন ললিত নস্করের সদ্য বিবাহিতা কন্যা মনোরমা রায়, লক্ষ্মীময়ী রায়, হিরন্ময়ী গাঙ্গুলী, সাধন বাগ, মাখন কয়াল, ফটিক গলুই, তারাপদ রায় ও গুইরাম মুদি।

পরবর্তী ঘটনাস্থল জগৎবল্লভপুর থানার ইসলামপুর মৌজা।

২৪ জুন, ১৯৪৯ খ্রিঃ। শান্তি রক্ষার জন্য এই গ্রামে ছিল একটি পুলিশ ক্যাম্প। ঐ পুলিশ ক্যাম্পের শক্তি বৃদ্ধির জন্য নতুন করে রাইফেলধারী গুর্খা পুলিশ আমদানী করা হয়। গুর্খা পুলিশ ইসলামপুর সীমান্তে হাওড়া-আমতার পানপুর নামীয় মার্টিন রেল স্টেশনে পৌঁছান মাত্র জনতা পুলিশে খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়। পরিশেষে পুলিশের গুলিতে দুজন কৃষক সন্তান শহীদ হন। সেদিনের পানপুর রেল স্টেশন আজ পানপুর বাস টার্মিনাস। ঐখান থেকে পূবমুখে কয়েক মিনিট আগালে ইসলামপুর বাজারে প্রবেশের মুখেই ঐ দুই শহীদের স্মৃতিতে যে স্তম্ভ রয়েছে, তার লিপির পাঠ—

শহীদ স্মরণে

কম : পচু বেরা

" কানাই বাগ

১১ই আষাঢ়, ১৩৫৬ সাল

ইসলামপুর।

সেদিন ইসলামপুরে আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন কৃষক নেতা মদন দাস এবং তার

সহকর্মী ছিলেন দেবেন মালিক, ডাঃ পূর্ণ ভূঞে, ভদ্রেশ্বর বেরা, ভজহরি বেরা, কানাই সাউ, বিপিন ঘড়া, নিতাই সাঁতরা, পুলিন বেলেল, বিজয় ঘোষ সহ আরও অনেকে।

এর পরেও হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটে জগৎবল্লভপুর থানার হাঁটাল গ্রামে।

হাঁটালের ঘটনার একটা পটভূমি আছে। সেটি এইপ্রকার—জগৎবল্লভপুর অধীন বাদেবালিয়ার বেরা পরিবারের জমি চাষবাস করত হাঁটালের চাষীরা। ৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ খ্রিঃ। প্রতি বছরের মত হাঁটালের চাষীরা ধান কর্জ বা বাড়ি নেবার জন্য বেরা বাড়ীর প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়। তার পূর্বে কৃষক সমিতির সিদ্ধান্ত ছিল, বিনা সুদে জমিদারকে ধান কর্জ বা বাড়ি দিতে হবে। এ নিয়ে কিছু উত্তেজনার সৃষ্টিও হয়েছিল। যাহোক, গৃহকর্তা বসন্ত বেরা জমায়েত হওয়া কৃষকদের ছত্রভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে অথবা ভয়ভীত হয়ে বাড়ির ছাদ থেকে "ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার" করলে জমায়েত হওয়া চাষীরা ফিরে যায়। পরদিন ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ খ্রিঃ। সন্তোষপুরস্থিত ফুটবল খেলার মাঠে প্রায় সাত - আটশ জঙ্গী কৃষকেরা জমায়েত হয়ে পরবর্তী কার্যক্রম স্থির করে। পুলিশের সশস্ত্র বাহিনী কেবল ঐস্থানে টহল দিয়ে ফিরে যায় তখনকার মত।

৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ খ্রিঃ। ভোরবেলায় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী হাঁটাল গ্রামে উপস্থিত হয়, যারা বাদেবালিয়ায় ধানের জন্য বেরা বাড়ীতে গিয়েছিল তাদের গ্রেপ্তার করতে। তখন জোয়ান পুরুষেরা পুলিশী অত্যাচারের ভয়ে গ্রাম ছাড়া হয়ে দূরে দূরে মাঠে ময়দানে বা অন্যত্র আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছে। পূর্বাপর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে, গ্রাম মধ্যে সে সময় কেবল নিরস্ত্র নারী ও শিশুর দল। কৃষক রমণীরা সশস্ত্র পুলিশের পথরোধ করল। বাধা পেয়ে পুলিশ খিস্তি খেউড় শুরু করল। মেয়েরাও পাল্টা উত্তর দিল। উত্তেজনা বাড়তে লাগল। এক সময় মনে হল পুলিশ বুঝি ফিরে যাচ্ছে বিফল মনোরথ হয়ে। মুহূর্তকালের মধ্যেই ঘুরে গেল পুলিশের রাইফেলের নল, উদ্যত হল কৃষক রমণীদের প্রতি। সঙ্গে সঙ্গে ছয় জন কৃষক রমণীর রক্তে রঞ্জিত হল হাঁটালের মৃত্তিকা। শহীদ হলেন বৃদ্ধা মাখমময়ী পণ্ডিত, সুধাময়ী সাঁতরা (গর্ভবতী অবস্থা), পারুলবালা সাঁতরা, বালিকা পাত্র, সিন্ধুময়ী দলুই এবং কিশোরী কন্যা যশোদা সাঁতরা (৯ বছর বয়স)।

পরবর্তী ঘটনার স্রোত কৃষক বিরোধী নিপীড়ন, গ্রেপ্তার, কারাদণ্ড ইত্যাদি। নানাধরণের ফৌজদারী মামলায় জড়িয়ে দেয়া হল বহু কৃষক সন্তানকে। খুন-জখম ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগ দায়ের করে বিচারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হল বদন পণ্ডিত ও বিজয় অধিকারী-কে।

হাঁটালের গ্রাম্য পথের ধারে (পূর্বোক্ত ঘটনাস্থলের পাশে) রয়েছে ছয়জন শহীদ কৃষকরমণীর স্মৃতিতে উৎসর্গীকৃত একটি স্মৃতিস্তম্ভ। এছাড়া, রাজাপুর খালের উপর নির্মিত 'উখড়া' সেতুটিকে—ঐ ছয়জন শহীদ কৃষকরমনীর স্মৃতিতে উৎসর্গ করা হয়েছে, 'শহীদ সেতু' নামে। 'শহীদ সেতু'টি জগৎবল্লভপুর, পাঁচলা ও ডোমজুড়—তিনটি থানা এলাকার সংযোজক। তথাপি, পাঁচ দশক পূর্বেকার ঘটনার কোন ছাপ কি আজকের

প্রজন্মের মনে ঠাঁই পেয়েছে? মনে রাখতে হবে, আজকের হাঁটালের সাথে সেদিনের হাঁটালের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট পার্থক্য গড়ে উঠলেও, এলাকাটি আজও মূলতঃ গ্রামীণ কৃষিপ্রধান এলাকা।

যাহোক, সদ্য স্বাধীন ভারতবর্ষে তে-ভাগা আন্দোলন প্রবল প্রতিকূলতার মুখোমুখি হলেও শেষপর্যন্ত প্রাদেশিক কংগ্রেস সরকার "দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল এস্টেটস অ্যাকুইজিশন অ্যাক্ট (১৯৫৩ খ্রিঃ)" প্রবর্তন করতে বাধ্য হন। এই আইনের বলে সকলেই অর্থাৎ জমিদার, জোতদার, মধ্যস্বত্বভোগী থেকে কৃষকেরা সরাসরি রাজ্যের প্রজারূপে আইনগত স্বীকৃতি লাভ করে। এর দ্বারা সরকারী কোষাগার লাভবান হয়। পরবর্তীকালে ভূমি সংস্কার আইন, বর্গাদার আইন প্রবর্তিত হয়েছে। নিঃসন্দেহে যুগের পরিবর্তন ঘটেছে। কৃষকের শত্রুর মূর্তিও রূপান্তরিত হয়ে গেছে নতুন কালের পরিপ্রেক্ষিতে।

জগৎবল্লভপুর থানাঞ্চলে বর্তমানে জলসেচের সুবিধাযুক্ত ১২, ৩২৮ হেক্টর কৃষিজমি [মোট কৃষিজমির ৬৩.৭%] আবাদ করার জন্য রয়েছে দু'শোর বেশী পাওয়ার টিলার এবং এক হাজারের বেশী পাম্পসেট। গরুতে টানা লাঙ্গল এখন "মিউজিয়ম পিস"। বোরো ও আমন ধান চাষ ও ফসল কাটার সময় কৃষি শ্রমিকের অভাব মেটায় আদিবাসী কৃষিশ্রমিকের দল। বহু জমি এখন তিন-ফসলী।

অপরপক্ষে দেখা দিয়েছে এক বিচিত্র চিত্র!

সমগ্র হাওড়া জেলায় কৃষি জমির পরিমাণ ক্রমহ্রাসমান অথচ ফসল উৎপাদনের পরিমাণ উর্ধগামী!! হাওড়া জেলার সাম্প্রতিক কালের চিত্রটি নিম্নরূপ—

(ক) ১৯৭১ খ্রিঃ কৃষি জমির পরিমাণ ২,৬০,৬৫০ একর
(খ) ১৯৮১ খ্রিঃ " " " ২,২২,৬৬০ "
(গ) ১৯৯১ খ্রিঃ " " " ২,০৫,৩২৫ "।
} বলা বাহুল্য এই হিসাব কৃষক সমিতি সূত্রে প্রাপ্ত।

আলোচ্য এলাকায়, কৃষিজমি একদিকে রূপান্তরিত হচ্ছে বাগিচা, রেলবাঁধ, গঞ্জ, কলকারখানা, বাগান বাড়ী, বিপণি, বসতবাটী, বিদ্যালয় গৃহ ইত্যাদিতে। অপরদিকে কৃষক হারাচ্ছে কৃষিজমি!

ডোমজুড়-রাজাপুর থেকে ইসলামপুর ভায়া বড়গাছিয়া-পাঁতিহাল-মুন্সিরহাট-মাজু পিচঢালা রাস্তার দু'পাশে কৃষিজমির একর প্রতি মূল্য তিন থেকে চার লক্ষ টাকা অতিক্রমের পথে আগুয়ান! সচেতন কৃষক সন্তানেরা পোষ্টার দিচ্ছেন—"ধররে লেখন কঠোর হাতে / চমক মেরে জাগিয়ে দেরে / আছে যারা অর্ধচেতন।"

এর ভেতর নতুন এক কৃষক আন্দোলনের পদশব্দ শোনা যাচ্ছে কি?

আজকের কৃষক সন্তান সশঙ্কিত। কেন্দ্রীয় কৃষিনীতি, গ্যাট চুক্তি, ড্যাঙ্কেল চুক্তি, পেটেন্ট আইন, আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার, রাসায়নিক সার উৎপাদক, বীজ সরবরাহকারী এবং হিমঘর মালিকের ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে আজকের কৃষক সন্তান কতটা নিরাপদ ভাববার বিষয়। অপরদিকে, বর্তমানে জমিদারী প্রথার অস্তিত্ব নেই, কিন্তু কৃষিজমির মালিকানা রয়েছে সেই মধ্যস্বত্ব ভোগীদের, রায়তদের হাতে! ছোট ছোট জোতের

মালিককে আইন মোতাবেক দেয় ফসল, বর্গাদার বা ভাগচাষীর মর্জি মোতাবেক। ছোট জোতের মালিক দায়-বিপদে সহজে কৃষিজমি হস্তান্তর করতে. বিক্রী করতে পারেন না আইনের বেড়াজাল ডিঙ্গিয়ে। এঁদের ভাগ্য দেখে কৃষ্ণযাত্রার গায়ক নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের একটি গীত স্মরণে আসছে--

"শ্যামাপদে আশ, নদীর ধারে বাস, ভাবনা বারমাস ঘোচে না, ঘোচে না।

কৃপাশস্য কবে হবে, কি না হবে, তাহার নিশ্চয় কেউ জানে না।"--কে কাকে কৃপা করবে? অনিশ্চিত ইতিহাসের গতি কোন্ পথে ধাবমান তার নিশ্চয়তা কারোর জানা নেই। কারোর পায়ের তলায় মাটি নেই! এ কেমন জগৎ!!

* * * *

জগৎবল্লভপুর থানাঞ্চলে অনুষ্ঠিত হাওড়া জেলা কৃষক সমিতির অধিবেশনের খতিয়ান--

বর্ষ	স্থান	সংখ্যা	নির্বাচিত সভাপতি	নির্বাচিত সম্পাদক
...	...	...	....	....
১৯৫৩ খ্রিঃ	হাঁটাল	একাদশতম	তারাপদ দে	মদন দাস
১৯৬৪ খ্রিঃ	বড়গাছিয়া	উনিশতম	মদন দাস	জয়কেশ মুখার্জী
১৯৭৪ খ্রিঃ	মুন্সিরহাট	সাতাশতম	জয়কেশ মুখার্জী	সন্তোষ ব্যানার্জী

* * *

জগৎবল্লভপুর থানা-এলাকায় কৃষক আন্দোলনের সাথে যুক্ত কর্মীবৃন্দ (খ্রিঃ ১৯৩৯-৪০ থেকে খ্রিঃ ১৯৫৪-৫৫)--

মৌজার নাম	জে. এল. নং	কর্মীর নাম
শিয়ালডাঙ্গা	৫৯	মুকুন্দ পাড়ুই, নরেন্দ্র পাড়ুই, বেচু কাঁড়ার, মদন মালিক।
ভূরশুট রণমহল	৪৩	জীবন রায়, রাজেন্দ্র নাথ মাইতি, জয়ন্ত চক্রবর্তী, গুণধর প্রামাণিক।
ইছাপুর	৪৪	গৌরগোপাল মান্না।
নিমাবালিয়া	৪২	মহম্মদ ইলিয়াস।
হাঁটাল-অনন্তবাটী ও বোহাবিয়া	৫৮ ৬২	ভদ্রেশ্বর মাজী, যতীন সাঁতরা, সুখময় সাঁতরা, অর্জুন সাঁতরা, ভীম পণ্ডিত, তুলসীবালা সাঁতরা, মাখম সাঁতরা বটকৃষ্ণ সাঁতরা, সত্য পোড়েল, কার্তিক মাজী, কার্তিক কারক, বাসুদেব মান্না, সিন্ধুবালা সাঁতরা, অষ্টমবালা সাঁতরা, পারুল বালা সাঁতরা, সুধা সাঁতরা,

		মাখমময়ী পণ্ডিত, বালিকাবালা পাত্র যশোদা সাঁতরা, হীরালাল মান্না।
উত্তর সন্তোষপুর	৫৪	প্রাণকৃষ্ণ সাঁতরা, হরিশ সাঁতরা, মুকুন্দ সাঁতরা, বিজয় অধিকারী, শৈলবালা অধিকারী, বিজয় মালিক, সত্য মালিক, সন্তোষ পাড়।
মধ্য সন্তোষপুর	৫৫	অদ্বৈত পণ্ডিত (কারাগারে শহীদ হন), মদন পোড়েল, বটকৃষ্ণ পোড়েল, সুফল সাঁতরা, সুফল পণ্ডিত, বদন পণ্ডিত, রতন বদ্যি, মোহন বদ্যি, কার্তিক সাঁতরা।
দক্ষিণ সন্তোষপুর	৫৬	দুদে রহমান মল্লিক।
ইসলামপুর	৭৬	ডাঃ পূর্ণ ভূঞা, কানাই বেরা, হারু বেরা, ভদ্রেশ্বর বেরা, ভজহরি বেরা, পচু বেরা, কানাই বাগ, পুলিন বেলেল, খাদু মাজী, মৃত্যুঞ্জয় মাজী, বিপিন ঘড়া, নিতাই সাঁতরা, কানাই ভূএ্রঃ, জিতেন পাত্র, নরহরি খয়া, দেবেন মালিক, বিজয় ঘোষ, অজয় ঘোষ, কানাই সাউ।

এঁরা ছাড়া জগৎবল্লভপুর থানার নিকটবর্তী (উত্তরদিকে) হুগলী জেলাস্থিত ভেদুয়া কানাইডাঙ্গা গ্রামের গিরিশ পণ্ডিত, হাবু পণ্ডিত ও শিবু পণ্ডিত প্রমুখের অবদান স্মরণ যোগ্য।

অপরপক্ষে তে-ভাগা আন্দোলনের কালে "মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি"র ভূমিকাও স্বীকার্য। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিব সাথে ঐকালে যুক্ত জনাকয় কর্মীর নাম প্রাক্তন সাংসদ সমর মুখার্জী মহাশয়ের দৌলতে জানা গেছে। ওঁরা হলেন শৈলজা দে (দক্ষিণ ঝাপড়দহ, 'সকলের মা' নামে সুপরিচিতা), সন্তোষপুর নিবাসী শৈলবালা অধিকারী, কালিদাসী হাজরা, ফুলদাসী পাত্র পরীবালা সাঁতরা. বেবি হাজরা, তৎসহ উত্তর ঝাপড়দহ নিবাসী বিমলা ঘোষ, রুদ্রপুর নিবাসী সাবিত্রী সিং, দক্ষিণ ঝাপড়দহ নিবাসী কৌশল্যা বাগ, নির্মলা বাগ, খুকী দিদি (ছদ্মনাম), তুলসী দিদি প্রমুখ। জগৎবল্লভপুর জনপদেও এঁদের কর্মক্ষেত্র ছিল।

বিনোদন–

সাম্প্রতিক কালে বৈদ্যুতিন ব্যবস্থার কল্যাণে বিনোদনের নতুন সংজ্ঞা তৈরী হয়ে গেছে, কিন্তু পাঁচ দশক পূর্বে বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে জনপ্রিয় ছিল যাত্রাপালা, লোকগীত

ইত্যাদি।

জগৎবল্লভপুর জনপদে লোকগীতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ধারা হচ্ছে বাদাই গান, ঘেঁটুর গান, তরজা গান, মনসার ভাসান, শীতলা মঙ্গল, কীর্তন গান, কালী কীর্তন, সাপ খেলানোর গান, পুতুল নাচের গান ইত্যাদি। অপরদিকে যাত্রাপালার ক্ষেত্রে বেশ জনাকয় শক্তিশালী অভিনেতার অবদানও স্মরণযোগ্য।

(ক) বাদাই গান

জন্মাষ্টমী তিথিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-র ধরণীতে আবির্ভাব তথা জন্মবৃত্তান্তই হচ্ছে বাদাই গানের মূল উপজীব্য বিষয়। এ-যাবৎ প্রাপ্ত গানগুলির নমুনার ভিত্তিতে বলা চলে বাদাই গান মোটামুটি দেড়শ বছর ধরে প্রচলিত রয়েছে। বাদেবালিয়া, যমুনাবালিয়া, নিজবালিয়া, নিমাবালিয়া, গড়বালিয়া, ইছাপুর, শিয়ালডাঙ্গা, রণমহল প্রভৃতি গ্রাম কয়টিকে কেন্দ্র করে এক সময় জন্মাষ্টমী তিথি তথা বাদাই উৎসব অনুষ্ঠিত হত এবং ঐ উপলক্ষে বিভিন্ন লোকগায়কদের রচিত বাদাই গান শোনা যেত। বছর ত্রিশ পূর্বেও বাদাই গান বিশেষ আকর্ষণের বস্তু থাকলেও, আজ তার অন্তর্জলি যাত্রার কাল। কারণ গীতকার, সুরকার, গায়ক, বাদক, শ্রোতা সর্বোপরি পরিবেশ অন্তর্হিত হয়ে গেছে।

বাদাই গানের বিষয়বস্তু হচ্ছে ঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পুরাণোক্ত পিতা-মাতা বসুদেব-দেবকীর ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ, তাঁর জন্মগ্রহণের কালে পিতা-মাতা বসুদেব-দেবকীর কংসরাজের কারাগৃহে দুঃখ-দুর্দশা বরণ. শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেব কর্তৃক নবজাত সন্তানকে নিয়ে যমুনা নদী পারাপার, শ্রীকৃষ্ণের পালক পিতা-মাতা নন্দ ঘোষ ও যশোদারানীর আনন্দ-উচ্ছ্বাস এবং পরিশেষে গীতের ভণিতাংশে পরমার্থ অন্বেষণ ইত্যাদি। ফলে বাদাই গান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দীর্ঘ কাহিনীমূলক বা বিবৃতিমূলক হয়ে থাকে। বন্দনা গীত, প্রস্তাবনা দিয়ে আসর শুরু হয়, তারপর ধীরে ধীরে গীতের মাধ্যমে কাহিনীর অবগুণ্ঠন মোচন। আসর শেষ হয় নন্দোৎসবের গীত সহযোগে। কখনও গৃহস্থের আঙ্গিনায়, কখনও মন্দির প্রাঙ্গণে, কখনও গ্রাম-গ্রামান্তর পরিক্রমা করেও বাদাই সঙ্গীত গাওয়া হত।

সংক্ষিপ্ত আকারে একটি প্রাচীন বাদাই গানের নমুনা পেশ করা হল—

গোলোকধাম পরিহরি পতিতপাবন—
ভূ-ভার হরিবারে সদয় দেবকীরে,
মথুরায় রাখতে ভক্তের মান—
হোলো দৈববাণী গগনে,
বসুদেব কর্ণে শুনে,
পুত্র বক্ষে লয়
গেল নন্দালয়।
[বসুদেব]
ও হায়, হায়রে,

যমুনা আজ চক্ষে হেরে,
প্রফুল্ল হোয়ে অন্তরে
দুকূল ভাসে নয়ন নীরে [বেগে উজান বয়]
বহু চিন্তিত [ভাবে], চিন্তামণি কোলে লয়ে,
কূলে দাঁড়ায় গো, যমুনায় শুধায় অতি যতনে।।

*　　*　　*　　*　　*

বেগে উজান বওয়া যমুনাকে কি বলছেন বসুদেব?—

*　　*　　*　　*　　*

তোমায় কব কি, ইকি আমার কপাল মন্দ।
পুত্র কত্তে গোপন, বিপদ বিলক্ষণ, বিড়ম্বন বিধির নির্বন্ধ।।
গর্ভেতে পুত্র হয় বারে বারে, কংস সব ধ্বংস করে।
দুষ্ট দুরাশয় সে, বড়ই নির্দয়, হায় হায়রে।।—
কাঁদি আমরা দিবানিশি, চক্ষের জলে দুঃখে ভাসি।
ঐ কষ্ট কি সয়—বক্ষে শিলা, গলে রশি।।—
এখন বিপদে কোথায় হরি
বিপদভঞ্জন শ্রীমধুসূদন হে,
দয়াময় দয়া করো দ্বিজ নারাণে।।—

আরাধ্য দেবতা নবজাত সন্তানের রূপ পরিগ্রহ করে ভক্তের সম্মুখে উপস্থিত। ভক্ত নর-নারীর হৃদয়ে বাৎসল্য রসের প্রতিভাস। এর উৎস রয়েছে ব্রহ্মসংহিতার একটি শ্লোকে—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণ কারণম্।। (৫/১)

—পরম পুরুষোত্তম ভগবান হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর চিবন্তন আনন্দ, নিত্যত্ব এবং জ্ঞানময় সচ্চিদানন্দ ভাবের একটি শরীররূপও আছে—যদিও তাঁর কোন আদি নেই, কারণ তিনিই সব কিছুর উৎস—তিনিই সকল কারণের কারণ স্বরূপ।

"যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যাং পরম্ ব্রহ্ম নরাকৃতিঃ"—

সেই পরমতত্ত্ব হচ্ছেন সবিশেষ পুরুষ—তাঁরই নাম শ্রীকৃষ্ণ, তিনি প্রয়োজনে ভূ-ভার হরণের নিমিত্ত এই ধূলির ধরণীতে শরীর রূপ ধারণ করে অবতীর্ণ হন। যিনি সাধক, যিনি ভক্ত তাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়ে সেই সবিশেষ পুরুষের রূপ। এই প্রকার ভাবনা সঞ্জাত বাদাই গীতের নমুনা—

চক্ষে দেখলাম যে বালক,　বালক নয় পূর্ণব্রহ্ম জ্ঞান হয়।
জন্মে পদে যার গঙ্গাতীর্থ,　পদাঙ্কে গয়া তীর্থ সার তীর্থ,
প্রেমে আতীর্থ, মহিমা পুষ্কর তীর্থ, নামে যার কাশীতীর্থ
উদয় সেই মহাতীর্থ আজ নন্দালয়।।—

—ঐ যে জ্যোতির্ময়, রূপে আলোময়।।—
—ঐ রত্নগর্ভা যশোমতী ধরেছেন গোলোকের জ্যোতি
পূণ্যবতী ভাগ্যবতী
সাধ্ব্যা সতী ধন্যা
মহামান্যা—

* * * * *

কত লোকে কত সাধে সাধ ভঙ্গ হয় পদে পদে
স্নেহভাবে যে ধন বাঁধে
যশোদার নন্দন।।
যখন কাল এসে করবে বন্ধ শ্বাস প্রশ্বাস হবে রুদ্ধ
হায় — হায় গো
রসিক চায় ঐ পাদপদ্ম সেই সময় গো।।

বাদাই গীত রচয়িতা, সুরকার ও মূল গায়করূপে যাঁদের অবদান আজও স্মরণীয় তাঁরা হলেন বাদেবালিয়া নিবাসী নগেন চন্দ্র চক্রবর্তী, নারায়ণ (নারান) চন্দ্র চক্রবর্তী, শিয়ালডাঙ্গা নিবাসী ভজহরি জানা, ঈশান চন্দ্র জানা, কুঞ্জবিহারী জানা, জহরলাল জানা প্রমুখ। এছাড়াও কিশোরী, রাইচরণ, রসিকচন্দ্র প্রমুখ গীতিকারের ভণিতাও পাওয়া গেছে।

বাদাই গানের সুর কখনও কীর্তনাঙ্গ, কখনও টপ্পা, গজল, ঝুমুর ইত্যাদি। আবশ্যকীয় বাদ্যযন্ত্র হচ্ছে ঢোল ও কাঁসি, নুপুর, খঞ্জনী, বাঁশী, বাঁশরী ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য, বাদাই গানের অন্তর্জলী যাত্রার কাল এটি—'নারায়ণ' এখন পার্শ্ব পরিবর্তন করছেন। পাণ্ডুলিপির জীর্ণ পাতায় বাদাই গানের নমুনা মিললেও তার সুর গেছে হারিয়ে।

(খ) ঘেঁটু গান

লোকদেবতা ঘেঁটু—সর্বব্যাধিবিনাশন মহাবীর বিগ্রহ ঘণ্টাকর্ণ। ঘেঁটুর পূজা ফাল্গুন সংক্রান্তি থেকে পরবর্তী দু'তিনদিন করে থাকে গ্রামস্থ বালক-বালিকারা। এই উপলক্ষ্যে চৌদোলায় ঘেঁটু ফুল, জ্বলন্ত প্রদীপ সাজিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে ঘেঁটু গান গায় বালক-বালিকারা। ঘেঁটু গানে, ঘেঁটু কখনও বিবাহার্থী যুবক, কখনও বরবেশী পুরুষ, কখনও-বা দেশমান্য রাজা। ফলে বিভিন্ন রঙ ও রূপের এবং ভাবনার গান শোনা যায় গায়কদের মুখে। কিছু কিছু ঘেঁটু গান আছে যা দীর্ঘকাল প্রচলিত, আবার দেশ-কালের সাম্প্রতিক অবস্থার বর্ণনাযুক্ত ঘেঁটু গান বেঁধে থাকেন (রচনা করেন) গ্রাম্য গীতকার। শেষোক্ত ধরণের একটি গান—

ও ঘেঁটু—দেশের একি হাল হলো আজ দেখে বাঁচি না।
ও ঘেঁটু—যখন তখন হচ্ছে যে ভোট, আমরা ভুগি যন্ত্রণা।।

ভোটের আগে হা·,
মোদের সবাই ভালো চায়,
ভোট ফুরালে মোদের কথায় আমল নাহি দ্যায়।।
ও ঘেঁটু—যে যায় লঙ্কায় সেই হয় গো রাবণ,
মোদের দুঃখ ঘোচে না—
সংসার জ্বলন্ত
আমাদের প্রাণান্ত,
অ্যাখন নুন আনতে পান্তা ফুরায়, সবই যে বাড়ন্ত।।
ও ঘেঁটু—আমরা প্রচার শুনেই খিদে মেটাই
আসল কিছুই পেলাম না—
চায়ের চিনি নাই,
ডিজেল কোথা পাই,
লোডশেডিং-এর ঠেলায় পড়ে প্রাণখানাও যে যায় যায়—
ভোটের আগে হায় মোদের সবাই ভালো চায়।।

জগৎবল্লভপুর জনপদে একদা বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘেঁটু গান রচনা করেছেন পাঁতিহালের রতন চন্দ্র বাগ, শিয়ালডাঙ্গা-র জানা পরিবারের কুঞ্জবিহারী, ভজহরি প্রমুখ। উপরিউক্ত গীতটি রতন চন্দ্র বাগ রচিত। শিয়ালডাঙ্গার জানা পরিবারের গানের খাতা উইপোকায় হজম করে ফেলেছে। সিদ্ধেশ্বর গ্রামের সৌমেন্দু গোস্বামীর সংগ্রহে আছে বহু ঘেঁটু গীত।

(গ) হাত নাচনা পুতুলের গান

পাঁতিহাল গ্রামের এক প্রান্তে বসবাস করে এক শ্রেণীর মানুষ, যারা আচার-বিচারের দিক থেকে আধা-হিন্দু, আধা-মুসলিম। এদের জাতিগত পেশা (এক সময় ছিল) সাপ ধরা, সাপ খেলা দেখানো। সাপ খেলা দেখানোর সময় হাতের ডুগডুগি বাজিয়ে চড়া সুরে গান গেয়ে থাকে। সবশেষে দেখায় হাত নাচনা পুতুলের কসরৎ ও শোনায় গান। এক জোড়া পুতুল—পুতুলের মাথার অংশটা দৃশ্যমান। তার নীচে কৌশলে পরানো হয় ঘাগরা। দু'হাতে দুটি পুতুল ধরা হয় এবং স্রেফ আঙ্গুল চালনার কৌশলে মাথা নড়ে, হাত জোড়া নড়ে। পুতুলের মুখ, নাক, ছাড়াও মাথার বিঁড়ে খোপা, হাত জোড়া (তালু) কাঠ কুঁদে তৈরী করা হয়, তার ওপর প্রয়োজনমতো ত্রি-মাত্রিক আদল আনার জন্য নানাবিধ রঙের (সাধারণতঃ হলুদ, কালো ও লাল) প্রলেপ দেয়া হয়। গানের বিষয়বস্তুর মধ্যে কোন সঙ্গতি থাকে না বটে, তবে তালফেরতা থাকে। ছড়াগানের অসঙ্গতি এখানেও পাওয়া যেতে পারে। যেমন—

এইখানে আসিয়ে কানন
করিলো আসন

কাজকম্মো রেখে দ্যাখো
দুই কাননের নাচন।
ভালো করে নাচবি কানন রসের বিনোদী—
কি তরকারি রাঁধেন কানন—?
সব করেছে ঝোল
খেতে বসে দুই কাননে
লাগলো গণ্ডগোল
ভালো নাচবি কানন—
পান খেয়েছে পিচ ফেলেছে
ঠোঁট করেছে লাল,
আপেল পাথর পরেছে কানন
ভাদ্রমাসের তাল
ভালো নাচবি কানন—।।

হাত নাচ্না পুতুলের গানের আরও বৈচিত্র্য আছে।

(ঘ) সাপ খেলানোর গান

ঝাঁপি থেকে সাপ বের করে তার লেজের দিক ধরে একটা করে ঝাঁকি দেয়ামাত্র সাপ ফণা তোলে। সে সময় উবু হয়ে বসে অদ্ভুত কৌশলে সাপের সামনে একটা হাঁটু দোলাতে থাকে, সাপ ছোবল দেয়ার চেষ্টা করে, পারে না লেজটি ধরে থাকার কারণে। ঐ সময় খালি গলায় সাপুড়িয়া গান গায়—

উদয় নাগে শঙ্খ নাগে বেহুলা নাচনী
তিন নাগে বন্দী করে বেহুলা নাচনী—
সেই বেহুলা কাঁদে মাগো হারালাম স্বামী—ই—
অ্যাতোগুলো লোক দাঁড়ায়ে সাপের দিকে চেয়ে
কি না পয়সা দেবে মাগো মা মনসার নামে—
সব করিতে পারে মনসা তামাশা দেখে বসে
একে বলে গেড়ীভাঙা কেউটে খ্যালে আদর করে—

এ ধরণের গীত ছাড়াও তরজা গান, কালী কীর্তন, পালাকীর্তন, মঙ্গলগান (মনসা, শীতলা, শিবায়ন)-এর অনেক শিল্পী আজও আসর মাতিয়ে থাকেন।

তরজা গানে উত্তর মাজুর বীরেন ঘাঁটা ও মোহন বিলুই, কালীকীর্তনে মাড়ঘুরালির হারাধন খাঁ ; পালাকীর্তনে শিয়ালডাঙ্গার রাসবিহারী জানা, কমলাপুরের সূর্য পাল, নবাসনের গোপাল মালিক, হারু মালিক ; পাঁতিহালের পাঁচকড়ি মাল, সমরেন্দ্র মাজী ; নস্করপুরের জগৎ অধিকারী, গোপাল পাত্র ; উত্তর মাজুর খগেন্দ্রনাথ বিলুই ; উত্তর সন্তোষপুরের মথুর নস্কর ; শ্যামপুরের ক্যাবল রায় ; নরেন্দ্রপুরের সুবলচন্দ্র রায় প্রমুখ

খ্যাতির অধিকারী। এছাড়া মঙ্গলগানের বিশিষ্ট গায়ক-সম্প্রদায় হল দক্ষিণ মাজুর দিবাকর চক্রবর্তী ও (তার) সম্প্রদায় এবং একাব্বরপুরের অজিত চক্রবর্তী।

(৬) যাত্রাভিনয়

বিনোদনের জগতে যাত্রাপালার কদর আজও গ্রাম বাঙলায় রয়েছে। জগৎবল্লভপুর জনপদে যাত্রাভিনেতাদের মধ্যে যিনি সর্বাধিক সম্মানের অধিকারী ছিলেন, তিনি হলেন নিজবালিয়ার নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। দীর্ঘকায়, সুদেহী নারায়ণবাবু একাধারে ছিলেন 'জাত' অভিনেতা, অপরদিকে ছিলেন অভিজ্ঞ শিক্ষক ও পরিচালক। পৌরাণিক পালায় তাঁর অভিনয় বহু লোকের স্মরণে আছে। মেঘমন্দ্র স্বরে উচ্চারিত সংলাপ, বহুদূরের শ্রোতার কানে পৌঁছে দেওয়ার মত স্বরক্ষেপণ-ক্ষমতা, গুরু গম্ভীর চালচলন, আভিজাত্যপূর্ণ ব্যবহারের জন্য তাঁর সম্মোহনী শক্তি যাত্রা-আসরে ভিন্ন মাত্রা যোগ করত। দর্শক-শ্রোতা ভর্ত্তি (পাঁচ-সাত হাজার) যাত্রার আসরেও তাঁর অভিনয়ের কালে বিরাজ করত সূচীপতন নিস্তব্ধতা। বহুবার পেশাদার যাত্রাশিল্পী হওয়ার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছেন। প্রায় দু দশক পূর্বে ইহলোক ত্যাগ করেছেন।

নারায়ণবাবুর যোগ্য দোসর ছিলেন রামেশ্বরপুর নিবাসী মহানন্দ চক্রবর্তী। এঁদের দুজনের অভিনয় সম্পর্কে প্রবীণ যাত্রানট প্রতাপপুর নিবাসী নির্মল কুমার মুখোপাধ্যায় স্মৃতিচারণ করে বলেছেন ঃ মহিষাসুর পালায় "মহিষাসুর" নাম-ভূমিকায় অভিনয় করছেন নারায়ণবাবু, "বিশ্বামিত্র" সেজেছেন মহানন্দ বাবু। উভয়ের সেই যে অপূর্ব চরিত্র চিত্রণ, তা এমনভাবে স্মৃতিতে আজও গেঁথে আছে, নিজের সীমিত ক্ষমতার কথা চিন্তা করে কখনও ঐ দুটি ভূমিকায় অভিনয় করার কথা স্বপ্নেও ভাবি না।

বলা বাহুল্য, শালপ্রাংশু মহাভুজ জাতীয় চেহারার অধিকারী নির্মল কুমার মুখোপাধ্যায় প্রায় শতাধিক যাত্রাপালায় অভিনয় করেছেন। পেশাদার ও অপেশাদার উভয় দলেই যোগ্যতা ও নাম-খ্যাতিব সঙ্গে অভিনয় করেছেন, এখনও করে থাকেন।

অতীতে পৌরাণিক পালার মধ্যে মহিষাসুর, ধনুর্যজ্ঞ, নরকাসুর, সীতার বনবাস, পরশুরাম, হরিশচন্দ্র প্রভৃতি ছিল জনপ্রিয়। এছাড়া, সামাজিক বিশেষতঃ ঐতিহাসিক পালার আকর্ষণ ছিল যথেষ্ট।

কনসার্ট ছাড়া যাত্রাপালা অভিনয়ের কথা কল্পনা করা যায় না। মানসিংহপুরের কনসার্ট পার্টির খুব নামডাক ছিল। মানসিংহপুরের সঞ্জীব কর ছিলেন বিশিষ্ট ফ্লুট বাজিয়ে। নিজবালিয়ার কার্ত্তিক মুখার্জী ও মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী তবলাবাদকরূপে এবং বেহালাবাদকরূপে শক্তি চক্রবর্তীর যথেষ্ট নাম-ডাক ছিল।

যাত্রাপালায় সখীদলের নাচ ছিল আবশ্যিক অঙ্গ। স্নায়ু টান টান করা দৃশ্য কিংবা হাস্যমুখর কোন অভিনয় যাই হোক না কেন, 'রিলিফ' হিসাবে সখীদলের নৃত্য-গীত দর্শক-শ্রোতাদের কাছে উপরিপাওনা। যাত্রাদলের নবীনা কিশোরী সখীর দল আসলে ন'-দশ থেকে এগার-বারো বছর বয়স্ক বালক-কিশোরের দল। ঘাগরা, কাঁচুলী পরণে,

চোখে-মুখে পেন্ট মেক-আপ, কাজল, মাথায় নকল বেণী, পায়ে ঘুঙ্গুর সহযোগে যাত্রাদলের সখী হয়ে যেত ঐসব বালক কিশোররা। এই সখীব্যাচ তৈরীর মাস্টার ছিলেন মাজু নিবাসী অকৃতদার সত্য মজুমদার।

যাত্রা-গানের আসরে 'বিবেক' এক বিশিষ্ট অথচ নৈর্ব্যক্তিক চরিত্র। বিবেক-এর গানে, গগনে ধ্বনিত হয় সাবধান বাণী, ভবিতব্যের চিত্র, ভয়ঙ্কর ঘটনার পরিণতি। নিজবালিয়ার উপানন্দ কর্মকার [ডাকনাম মিছরী কামার] বর্তমানে যদুপুর নিবাসী—ইনি বহুদিন 'বিবেক' ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। আরও একজন "বিবেক" ভূমিকাভিনেতা ছিলেন। ইনি হলেন নিমাবালিয়া নিবাসী জীবন ভুক্ত। জীবনবাবু শেষ জীবনে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

প্রথম শ্রেণীর যাত্রাভিনেতা রূপে নিজবালিয়ার শম্ভুনাথ চক্রবর্তীর নাম উল্লেখযোগ্য। অভিব্যক্তিময় অভিনয় ছাড়াও শম্ভুনাথবাবু অসাধারণ দক্ষ গাইয়ে বাজিয়ে ছিলেন। তবলা, হারমোনিয়াম, পাখোয়াজ প্রভৃতি যন্ত্রসঙ্গীতে দক্ষতা ছিল তো বটেই, কণ্ঠসঙ্গীত এবং নৃত্যেও পারদর্শী ছিলেন। শম্ভুনাথবাবুর অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল স্বরক্ষেপণের [ভেনট্রিলোকুইজম]। একটা জায়গায় বসে,/দাঁড়িয়ে পাঁচ-সাতটি নরনারীর কণ্ঠস্বরে সংলাপ বলে যেতেন। এছাড়া নাটক পরিচালনা, অভিনয় নির্দেশনার ক্ষেত্রেও ছিল সহজাত দক্ষতা। বিরল শ্রেণীর শিল্পীরূপে শম্ভুনাথ চক্রবর্তী আজও স্মরণীয়।

সখীদলের সম্মিলিত নাচের মতই "সোলো ড্যান্সার" (একক নৃত্য)-এর চাহিদাও ছিল যথেষ্ট। নিজবালিয়ার নৃত্যশিল্পী আশুতোষ মল্লিক ছিলেন সুনিপুণ নৃত্যশিল্পী। সদা হাস্যমুখর, রসিক, সদালাপী আশুতোষবাবু নর্তকীর রূপ ধারণ করে যাত্রার আসরে নামলে চোখে থাকত বিলোল কটাক্ষবাণ, মুখে থাকত হাল্‌কা হাসির প্রলেপ। কোন এক অজ্ঞাতকারণ বশতঃ নৃত্যশিল্পী আশুতোষ মল্লিক আত্মহত্যা করেন।

বর্তমানে এঁরা ছাড়াও নামকরা যাত্রাশিল্পী রয়েছেন এলাকামধ্যে, যাঁদের নাম-পরিচয় দেয়া সম্ভব হল না।

থিয়েটার

তিনদিক ঘেরা, সামনে খোলা, উইংস সহ অস্থায়ী ভাবে বাঁধা কিংবা স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ হচ্ছে থিয়েটারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নিমাবালিয়া গ্রামের শিবতলায় রয়েছে একটি পাকা, স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ। ঐ নাটমঞ্চের শিরোভাগে লিখিত আছে ঃ "নিমাবালিয়া মহেশ্বর ক্লাব। স্থাপিত সন ১৩৩৩ সাল" অর্থাৎ ১৯২৬-২৭ খ্রিষ্টাব্দে গ্রামের বুকে স্থাপিত হয়েছিল পাকা নাটমঞ্চ!—এই নাটমঞ্চে যে সব অভিনয় বাল্যকালে দেখেছি, তার মধ্যে বঙ্গে বর্গী, কেদার রায় প্রভৃতির কথা কিছু কিছু স্মরণে আছে। বর্তমানে এই রঙ্গমঞ্চের দ্বার রুদ্ধ।

আধুনিক নাট্য আন্দোলন

১৯৭৩-৭৪ খ্রিঃ থেকে হাফেজপুর নিবাসী মহম্মদ সাদিক-এর নেতৃত্বে পরিচালিত

হচ্ছে "পিপলস অ্যালবাম থিয়েটার" [সংক্ষেপে পি. এ. টি] নামীয় নাট্যসংস্থা। শিবানন্দবাটীতে এই সংস্থার নিজস্ব মহলা কক্ষ রয়েছে। এদের প্রযোজিত ও অভিনীত নাটকগুলি হচ্ছে ঃ—

সন	নাট্যকার	নাটক	
১৯৭৪ খ্রিঃ	কিরণ মৈত্র	বারোঘণ্টা	একাঙ্ক
১৯৭৫ "	স্বপন সেনগুপ্ত	ভেলকির খেলা	"
১৯৭৫ "	সমর দত্ত	ডাইনোসেরাস	"
১৯৭৬ "	রবীন্দ্রনাথ	ডাকঘর	
১৯৭৬ "	ব্রেটোল্ট ব্রেশট (অনুবাদ ঃ রাজেন দাশ)	ভালো মানুষের গপ্পো	পূর্ণাঙ্গ
১৯৭৭ "	শ্যামলতনু দাসগুপ্ত	জাদুকর	একাঙ্ক
১৯৭৭ "	সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়	শেষ থেকে শুরু	পূর্ণাঙ্গ
১৯৭৮ "	মনোজ মিত্র	চোখে আঙ্গুল দাদা	একাঙ্ক
১৯৭৮ "	রাধারমণ ঘোষ	কৈলাস বদ্ধ উন্মাদ	"
১৯৮০ "	মনোজ মিত্র	বাঞ্ছারামের বাগান [সাজানো বাগান]	পূর্ণাঙ্গ
১৯৮২ "	অনল মজুমদার	ফুলগুলি সরিয়ে নাও	একাঙ্ক
১৯৮২ "	মনোজ মিত্র	সত্যি ভূতের গপ্পো	"
১৯৮৭ "	মনোজ মিত্র	মহাবিদ্যা	"
১৯৯৩ "	আবুল বাশার (নাট্যরূপ অমল রায়)	কোজাগরী	"
১৯৯৩ "	মনোজ মিত্র	রাজদর্শন	পূর্ণাঙ্গ

কেবলমাত্র অভিনীত নাটকের সংখ্যা দিয়ে কোন নাট্যসংস্থার মান বিচার করা অনুচিত। গ্রামের বুকে শত অসুবিধা সত্ত্বেও আধুনিক নাট্য আন্দোলনের শরিক হয়ে উঠেছে যে সংস্থাটি তার প্রাণশক্তি, তার সঙ্ঘশক্তিকে সাধুবাদ জানাতেই হয়। সম্প্রতি রজত জয়ন্তী উৎসব পালিত হয়েছে সংস্থাটির।

জনস্বাস্থ্য সহায়ক প্রতিষ্ঠান

জগৎবল্লভপুর জনপদের প্রায় দু'লক্ষ অধিবাসীর জন্য রাজ্য সরকারের অধীন হাঁসপাতাল বা চিকিৎসালয়গুলি হচ্ছে :

(১) জগৎবল্লভপুর হাসপাতাল = ৫০ শয্যা
(২) মাজু সাবাসিডিয়ারী স্বাস্থ্যকেন্দ্র = ১০ শয্যা
(৩) পাঁতিহাল সাবাসিডিয়ারী স্বাস্থ্যকেন্দ্র = ১০ শয্যা
(৪) বড়গাছিয়া সাবাসিডিয়ারী স্বাস্থ্যকেন্দ্র = ১০ শয্যা

(৫) শঙ্করহাটি সাবাসিডিয়ারী স্বাস্থ্যকেন্দ্র = ১০ শয্যা
(৬) পোলগুস্তিয়া সাবাসিডিয়ারী স্বাস্থ্যকেন্দ্র = ১০ শয্যা
(৭) গোবিন্দপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্র = ২ শয্যা।

[দ্র. হাওড়া জেলা গেজেটিয়াব, ১৯৭২ খ্রিঃ।]

উপরোক্ত হিসাবেও যথার্থভাবে পূর্ণাঙ্গ হাঁসপাতাল, আলোচ্য জনপদে নেই। আর পূর্বোক্ত সাবসিডিয়ারী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মধ্যে মাজু সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত!

বে-সরকারীভাবে মাজু মধুসূদন দাতব্য হোমিও চিকিৎসালয়টি ১৯২২ খ্রিঃ-তে, পিতার স্মৃতিতে নব কুমার বসু স্থাপন করেছিলেন। পরিচালনার জন্য একটি ট্রাস্ট তহবিল গঠন করলেও, কর্মধারা সম্পূর্ণরূপে স্তব্ধ, চিকিৎসালয়ের গৃহটি পরিত্যক্ত।

সাম্প্রতিককালে ভূরশুট ব্রাহ্মণপাড়া নিবাসী সমাজসেবী সুবলচন্দ্র সর্বাধিকারীর উদ্যোগে ও নেতৃত্বে পরিচালিত কোহিনূর সেবাকেন্দ্র ও কোহিনূর নেত্রালয় নামীয় প্রতিষ্ঠান দুটি বহু মানুষের উপকার সাধন করে চলেছে। এছাড়া, চাঁদূল সুচেতনা সঙ্ঘ একটি পে-ক্লিনিক পরিচালনা করে থাকে। এ ধরণের উদ্যোগ আরও কিছু আছে।

পূর্বতন হাওড়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড অধুনা হাওড়া জেলা পরিষদ পরিচালনা করে থাকে গড়বালিয়া চন্দ্রকান্ত মান্না চ্যারিটেবল ডিসপেনসারী। এই দাতব্য চিকিৎসালয়টির অতীত ইতিহাস যেমন গৌরবজনক, বর্তমান অবস্থা তেমনি হতাশাব্যঞ্জক। চিকিৎসাব ন্যূনতম সুযোগ সহজলভ্য নয়, কারণ স্থায়ীভাবে কোন চিকিৎসক নাই দীর্ঘকাল ধরেই।

১৯২৯ খ্রিঃ-তে গড়বালিয়া নিবাসী "পঞ্চপাণ্ডব" অনুকূলচন্দ্র মান্না ও খগেন্দ্রনাথ মান্না (উভয়ের পিতা--রাখালদাস মান্না) এবং কানাইলাল মান্না, বলরাম মান্না ও কৃষ্ণধন মান্না (সকলের পিতা--চন্দ্রকান্ত মান্না) উক্ত "চন্দ্রকান্ত মান্না চ্যারিটেবল ডিসপেনসারী" প্রতিষ্ঠা করেন। এই কাজে তাঁদের বিশেষ সহযোগী ছিলেন চন্দ্রকান্ত মান্না র জামাতা, জুজারসা নিবাসী ফণীন্দ্রনাথ মান্না এবং পারিবারিক 'বন্ধু' জ্যোতীশচন্দ্র শেঠ, তদানীন্তন হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সদস্য নিতাইচরণ ঢ্যাং, তৎকালীন হাওড়া সদর মহকুমার শাসক ফণিভূষণ মিত্র প্রমুখ।

৩ জানুয়ারি, ১৯৩২ খ্রিঃ, তৎকালীন হাওড়া জেলা শাসক মিঃ এইচ. কুইনটন, আই. সি. এস. মহোদয় উক্ত দাতব্য চিকিৎসালয়ের নব ভবনটি উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ পত্রের লিপিটি ছিল নিম্নরূপ :

The Secretary of the
Garbalia Chandra Kanta Manna Charitable Dispensary
presents his best compliments to

Mr...
and requests the pleasure of his company to witness the opening ceremony of the new Dispensary Building at Garbalia, on Sunday, the 3rd January, 1932, at 1.30 p.m.

Mr. H. Quinton, I.C.S. District Magistrate, Howrah, has kindly consented to preside.

GARBALIA (Dist. Howrah) 27th December, 1931.

Phanindra Nath Manna Secretary.

N.B. The Jujersha Boys Concert Party will be attendance.

উক্ত উদ্বোধন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বিশেষভাবে প্রকাশিত একটি পুস্তিকায় চন্দ্রকান্ত মান্না-র সংক্ষিপ্ত জীবনী ও পারিবারিক পরিচয়াদির সঙ্গে এলাকার জনস্বাস্থ্য বিষয়েও কবিতাকারে লিখিত নানাবিধ তথ্যাদির সন্ধান মেলে। চব্বিশ ছত্রের কবিতাটি প্রকৃতপক্ষে জেলা শাসক মিঃ এইচ, কুইনটন-এর প্রতি স্বাগত অভিনন্দন। এরই অংশ বিশেষে আছে তৎকালীন জনস্বাস্থ্যের পরিচয়। যথা—

"দীনতা জলদ রেখেছে আবরি দেশের সুষমা তপনে,
ম্যালেরিয়ারূপী ভীষণ ঝঞ্ঝা উঠিছে গভীর গর্জনে,
চপলার বেশে মহামারী সাজি খেলে মাঝে মাঝে তার,
তা দেখিয়া ভয়ে প্রজাগণ তব করিতেছে হাহাকার,
দুর্গতি ভরা বালিয়া গ্রামের নাশিতে আঁধার কালিমা,
এস দিনমণি! দীননাথ সাজি বিকাশি আপন মহিমা।

* * * *

দেশ-অনুকূলে অনুকূল বাবু যজ্ঞ সূচনা করি,
সদস্য আসন দিয়াছে সঁপিয়া ফণীন্দ্রের হাতে তুলি।
এ যজ্ঞের হোতা পুণ্ডরীক বাবু, বি. কে. দাস পুরোহিত,
বলি হবে যত বিসূচিকা আদি, মন্ত্র দেশের হিত।
তুমি যজ্ঞেশ্বর, তোমারই বিহনে যজ্ঞ নহে তো পূর্ণ,
এস হে বরদ! নাও পূর্ণাহুতি ঘুচাও দেশের বিঘ্ন।"

* * * *

পূর্বোক্ত অনুষ্ঠানে জেলা শাসক পত্নী মিসেস এইচ. কুইনটনের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

যাহোক, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে দাতব্য চিকিৎসালয়ের পাশেই একটি অক্সিলিয়ারি হাসপাতাল চালু হয়েছিল, যদিও আজ তার কোন চিহ্ন নাই। চিকিৎসালয়ে সুবন্দোবস্ত ছিল। একতলায় রোগীদের বহির্বিভাগ, ঔষধ বিলির স্থান, সাধারণ অস্ত্রোপচার কক্ষ (যন্ত্রপাতি, বেড সহ) দ্বিতলে চিকিৎসক আবাস। এ ছাড়াও স্বতন্ত্রভাবে নির্মিত একটি একতল গৃহে কম্পাউণ্ডারের আবাসগৃহ। উনিশ শতকের সত্তরের দশক পর্যন্ত চিকিৎসকরা বসবাস করতেন উক্ত ভবনে। তারপর থেকেই ধীরে ধীরে অবনতির সূত্রপাত। এখন চিকিৎসক তো দূরস্থান—সমগ্র চিকিৎসালয় ভবনটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করে, ভেঙ্গে ফেলার গোপন আঁতাত শুরু হয়ে গেছে। মাত্র কয়েক বছর পূর্বে মেরামতের অজুহাতে ভবনটির স্থাপত্যের পরিবর্তন তথা ধ্বংস সাধন করা হয়েছে। অথচ জগৎবল্লভপুর জনপদে কমবেশি চার হাজার বর্গফুট সমন্বিত দাতব্য চিকিৎসালয়

ভবনটি দ্বিতীয় রহিত। বর্তমানে এই দাতব্য চিকিৎসালয়ের পরিচালক হলেন--হাওড়া জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ! যতদূর শুনেছি, উদ্যোক্তা মান্না পরিবারের পক্ষ থেকে সুপরিচালনার জন্য অর্থ তহবিল প্রদান করা হয়েছিল তৎকালীন হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড পরিচালকদের। [হায় দেশোন্নতি!! উন্নতির পরিবর্তে অবনতি--এটাই কি কাম্য ছিল প্রতিষ্ঠাতাদের?] ঘটনার ভবিষ্যৎ তাৎপর্য অনুধাবন করে স্থানীয় বিশিষ্ট নাগরিক ও অভিজ্ঞ বাস্তুবিদ শ্রী সিদ্ধেশ্বর মণ্ডল [প্রাক্তন চীফ ইঞ্জিনীয়ার, কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট] অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, চিকিৎসালয় ভবনটিকে আধুনিককালের উন্নত বাস্তুবিদ্যার সাহায্যে রক্ষা করার সুযোগ এখনও আছে, কারণ উন্নতমানের গৃহনির্মাণ দ্রব্যাদি ব্যবহার করার ফলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তুলনামূলকভাবে যথেষ্ট কম।

বলা বাহুল্য, একদা দশ-পনোরোটি গ্রামের অধিবাসীদের নিকট একমাত্র ভরসাস্থল ছিল আলোচ্য দাতব্য চিকিৎসালয়টি। আজও তার তুল্য প্রতিষ্ঠান এলাকামধ্যে আর গড়ে ওঠেনি। চিকিৎসালয় ভবনটিকে ভূমিস্যাৎ করে দেয়ার প্রচেষ্টার মধ্যে সম্ভবতঃ সুগুপ্ত রয়ে গেছে, স্থানীয়ভাবে একটি বিশেষ পরিবারের দেশ হিতৈষণার পাথুরে প্রমাণটিকে লোপাট করার বাসনা।

সমাজসেবী ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান--

আলোচ্য জনপদে অনেকগুলি সমাজসেবী ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যথারীতি সচল রয়েছে। এগুলির মধ্যে ঐতিহ্যপূর্ণ দু'তিনটির পরিচয় দেয়া গেল।

(১) বিবেকানন্দ সেবা সঙ্ঘ, ভুরশিট ব্রাহ্মণপাড়া।

বাংলা ১৩৫০ সালে ভয়াবহ মন্বন্তরের দুর্দৈব থেকে অগণিত সাধারণ মানুষকে অন্নদানের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠানটির পথ চলার সূত্রপাত। প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাপারে প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন হাওড়া শহরের কাসুন্দিয়া পল্লীর বিবেকানন্দ আশ্রমের দুই'জন প্রাণপুরুষ নৃগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাদল দা) ও রাধাকান্ত মল্লিক। সেদিন এঁদের আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ, যথা--ডাঃ পাঁচুগোপাল চক্রবর্তী, ডাঃ সুধীরকুমার সরকার, অনিলপ্রসাদ সর্বাধিকারী, ডাঃ কানাই সর্বাধিকারী, সুবলচন্দ্র সর্বাধিকারী, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, আশুতোষ ঘোষ, ভবোপদ মিত্র, বুদ্ধদেব মিত্র সহ আরো অনেকে।

বাংলা ১৩৫২ সালে তৎকালীন জমিদার গড়বালিয়া নিবাসী দানশীল অনুকূলচন্দ্র মান্না উক্ত সঙ্ঘের অনুকূলে সম্পাদিত এক দানপত্র যোগে খতিয়ান নং ৭৩০, দাগ নং ১৩৪৮ অধীন ৩৪ শতক পরিমাণ বাস্তু জমি বার্ষিক একটাকা খাজনায় বিলি বন্দোবস্ত করে দেন। তখন ঐ বাস্তুজমিতে ছিল একটি পরিত্যক্ত ও ভগ্ন বাটীর অবশেষ।

পরবর্তীকালে বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সঙ্গে যুক্ত স্বামী চিৎসুখানন্দজী নিয়মিত যাতায়াত ও ধর্মালোচনা করেছেন আলোচ্য বিবেকানন্দ সেবা সঙ্ঘে। বলা বাহুল্য, স্বামীজীর সংসারাশ্রমের নাম ছিল পরিতোষ ঘোষ এবং তাঁর জন্মভূমি হচ্ছে

পার্শ্ববর্তী পাইকপাড়া মৌজা।

বিবেকানন্দ সঙ্ঘ-র সাথে যুক্ত ব্যক্তিগণের কয়েকজনের উদ্যোগে ১৯০২ খ্রিঃ-তে সৃষ্টি হয়েছিল "কোহিনূর ফুটবল ক্লাব" এবং পরবর্তীকালে "কোহিনূর নাট্য পীঠ।" সুখের বিষয়, এই প্রকারের সঙ্ঘ শক্তি আজও বর্তমান। ধর্মালোচনা, দুর্গা পূজাদি, নাটকাভিনয়, ফুটবল খেলা সবেরই মূলে রয়েছে বিবেকানন্দ সেবা সঙ্ঘের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ অবদান!

(২) প্রপন্নাশ্রম মঠ, ভূরশিট ব্রাহ্মণপাড়া।

প্রপন্নাশ্রম মঠের প্রতিষ্ঠাতা হলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহামণ্ডলের পরম শ্রদ্ধেয় ত্রিদণ্ডী স্বামী গভস্তীনেমী মহারাজ। সংসারাশ্রমের নাম ছিল গিরীন্দ্র নাথ সরকার ; পৈত্রিক নিবাস ভূঃ ব্রাহ্মণপাড়া।

সারা বছরই ধর্মালোচনা সহ বহুবিধ কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় এখানে।

(৩) শ্রীরামকৃষ্ণ তপোদ্যান, গড়বালিয়া।

গড়বালিয়া নিবাসী ধর্মপ্রাণ কার্তিক চন্দ্র দলুই-এর উদ্যোগে ও ভূমিদানের ফলে, স্বামী শিবনারায়ণানন্দজী কর্তৃক স্থাপিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানটি ধর্মালোচনা, ধর্মোৎসব ব্যতিরেকে বিদ্যালয়গামী দুঃস্থ শিক্ষার্থীদের পাঠেও সহায়তা দান করে থাকে।

(৪) "জারপা গাঁওতা", জগৎবল্লভপুর।

জগৎবল্লভপুর জনপদে সাঁওতাল অধিবাসীদের নিজস্ব সংস্থা "জারপা গাঁওতা"-র সদস্যারা সাঁওতালী ভাষায় কবিতা পাঠ, নাটক অভিনয়াদি করে থাকেন। এছাড়া, সময় বিশেষে পরিবার পরিকল্পনা, সাক্ষরতা অভিযান প্রভৃতি বিষয়ে নৃত্যগীতাভিনয় করেন। এদের উদ্যোগে সহরাই (বাঁধনা), দাসায়ে বোঙ্গা (দুর্গাপুজা), বাহা (বসন্ত) পরব প্রভৃতি পরিচালিত হয়। এদের সুনাম জনপদের বাইরেও ছড়িয়েছে। তিলু হাঁসদা হলেন অন্যতম পরিচালক।

(৫) শিখ সঙ্গত, জগৎবল্লভপুর।

জগৎবল্লভপুর মৌজায় নানকপন্থীদের একটি ভজনালয় ছিল। দুটি নিদর্শন আছে, (১) স্থানীয় বর্মণ পরিবারে রক্ষিত ও পূজিত "গ্রন্থ সাহিব" ; (২) শোভারানী কলেজ প্রাঙ্গণে ৫ মিটার উঁচু, ছয় কোণা মন্দির-সদৃশ স্থাপত্য, যা আসলে শিখ সঙ্গতের স্মৃতিবাহী। প্রত্যক্ষদর্শীর মতে, "গ্রন্থ সাহিব"টির আকার ছিল ১.৫ মিটার লম্বা, ৫০ সে.মি. চওড়া, ৬০ সে.মি. উচ্চতাযুক্ত। এটি বর্তমানে প্রায় বিনষ্ট।

একদা রেশম, কাঠ প্রভৃতির ব্যবসা সূত্রেই "বর্মণ" পরিবার এসেছিলেন পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ থেকে। আদিতে এঁরা তিন প্রবরযুক্ত সূর্যবংশীয় চৌহান। হুগলী, হাওড়া, কলকাতা, দঃ ২৪-পরগণায় রয়েছে এঁদের শাখা-প্রশাখা।

কর্মময় জীবন : বর্ণময় ভূমিপুত্র

পৃথিবীর কর্মক্ষেত্রে যুঝিব, যুঝিব দিনরাত,
কালের প্রস্তরপটে লিখিব অক্ষয় নিজ নাম,
অবশ নিদ্রায় পড়ি করিব না এ শরীর পাত,
মানুষ জন্মেছি যবে করিব কর্মেরই অনুষ্ঠান,
অগম্য উন্নতিপথে পৃথ্বিতরে গঠিব সোপান।

—রবীন্দ্রনাথ।

উদ্ধৃত কবিতাংশের আলোকে বর্ণোজ্জ্বল ভূমিপুত্রদের মধ্যে মাত্র কয়েকজনের উল্লেখ করছি। কারণ বিস্তৃত বিবরণের জন্য স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন। তাছাড়া ইতিপূর্বে বিভিন্ন সূত্রে বিশিষ্ট কয়েকজনের কর্মকৃতিত্ব আলোচিত হয়েছে।

অনুকূলচন্দ্র মান্না,

বিশিষ্ট সমাজসেবী, বিদ্যানুরাগী ও ব্যবসায়ী। পৈতৃক নিবাস—গড়বালিয়া, মৌজা নিজবালিয়া। পিতা—রাখালদাস মান্না। পিতামহ—শ্রীনিবাস মান্না।

অধুনালুপ্ত পাঁতিহাল ইউনিয়ন বোর্ড-এর প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন সময়ে ম্যালেরিয়া মহামারী নিবারণ, অসুস্থ ও দুঃস্থ নরনারীর সেবা-শুশ্রূষার জন্য পিতৃব্য চন্দ্রকান্ত মান্নার নামাঙ্কিত "গড়বালিয়া চন্দ্রকান্ত মান্না চ্যারিটেবল ডিসপেনসারী" স্থাপন, (১৯২৯ খ্রিঃ) ; গ্রামে শিক্ষাপ্রসার কল্পে পিতা ও পিতৃব্যের নামাঙ্কিত "গড়বালিয়া রাখাল চন্দ্র মান্না ইনস্টিটিউশন" প্রতিষ্ঠা (১৯৩৭ খ্রিঃ); এবং "রাখাল চন্দ্র মান্না ট্রাস্ট" গঠন ; গ্রাম্য সড়ক ব্যবস্থার উন্নতি সাধন এবং বাংলা ১৩৫০ সনের দুর্ভিক্ষের কালে পারিবারিক ব্যয়ে নিরন্ন ও বুভুক্ষু নরনারীকে অন্নদান প্রভৃতি সমাজসেবামূলক কর্মের অনুষ্ঠান তাঁর প্রধান কীর্তি।

১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে, ভারত সরকার প্রদত্ত 'রায় সাহেব' খেতাব অর্জন। ঐ সনদের পাঠ—

SYMBOL
The British Government in India
SANAD

To
Babu Anukul Chandra Manna,
Merchant and President of the
Pantihal Union Board,
Howrah, Bengal Presidency.

I hereby confer upon you the title of Rai Sahib as a personal distinction.

Sd/- Linlithgow
Viceroy and Governor General
of India.

New Delhi
The 1st January, 1937

SEAL
of the
Governor General of India in Council.

অভয়চরণ দাশ, দেশহিতৈষী প্রাবন্ধিক

পৈতৃক নিবাস : মাজু

অভয়চরণ দাশ ছিলেন নির্ভীক প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক। ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর রচিত 'ইণ্ডিয়ান রায়ত ল্যাণ্ড ট্যাক্স, পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট অ্যাণ্ড ফেমিন' শীর্ষক গ্রন্থ রচনার কারণে ব্রিটিশ শাসকদের বিরাগভাজন হন। উক্ত গ্রন্থটিতে বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের ফলে কিভাবে রায়ত (প্রজাসাধারণ) ও জমিদারবর্গের মধ্যে বিষাক্ত সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছিল, মনুষ্যকৃত দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির পটভূমিকা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা আছে।

এঁর পুত্র প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী সুরেন্দ্রনাথ দাশ।

আত্মারাম সরকার,

প্রখ্যাত "ভোজবাজী বিদ্যাবিশারদ"।

পৈতৃক নিবাস : কমলাপুর।

পিতা : মাধবরাম সরকার।

কথিত হয়, আত্মারাম ছিলেন কামরূপ কামাখ্যাসিদ্ধ তন্ত্রপুরুষ, ভোজবাজী বিদ্যাবিশারদ (ম্যাজিসিয়ান)। অজস্র ভূতপ্রেত তাঁর বশীভূত ছিল, ঐ সকল আজ্ঞাবহ ভূত প্রেতরাই নাকি তার পাল্‌কী বয়ে নিয়ে যেত। ইনি ধুচুনি, চালুনি জাতীয় সছিদ্র পাত্রে জল স্থির রাখতে পারতেন।

"যা ভূত যা / আত্মারাম সরকারের মাথা খা"—এটা মাদারি খেলার মন্ত্র। শ্রুত হয় যে, আধুনিক কালের জনৈক বিশিষ্ট ম্যাজিসিয়ান মহাশয়ের পূর্বপুরুষ হলেন আত্মারাম। [দ্র. আনন্দবাজার পত্রিকা, ১ বৈশাখ, ১৪০৬ ক্রোড়পত্র পৃঃ ২৯]

আশুতোষ দেব মজুমদার (১৮৬৭-১৯৪৩ খ্রিঃ)

পৈতৃক নিবাস -- পাঁতিহাল। জন্ম—১৮৬৭ খ্রিঃ। প্রয়াণ--১৯৪৩ খ্রিঃ

পিতা -- বরদাপ্রসাদ দেব মজুমদার।

বাংলার খ্যাতনামা অভিধানকার, বাংলা মুদ্রণ জগতের অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব, খ্যাতনামা পুস্তক প্রকাশক। দেব সাহিত্য কুটির, এ. টি. দেব লিঃ, বরদা টাইপ ফাউণ্ডারি

প্রভৃতি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রাণপুরুষ ছিলেন।

"বিগত শতকে যে সব প্রকাশন সংস্থা বইয়ের ব্যবসাকে ক্রমোন্নতির পথে নিয়ে গিয়েছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য এ. টি. দেব...প্রভৃতি। ...এ. টি. দেবের সূত্রপাত ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে ছাপার কাজ দিয়ে। অল্পদিনের মধ্যে প্রকাশন ব্যবসাও এঁবা আরম্ভ করেন। এ. টি. দেবের বিভিন্ন অভিধান সুপ্রচলিত। ...এঁদের সহায়ক প্রতিষ্ঠান দেব সাহিত্য কুটির (১৯২৪)। এ. টি. দেব ও দেবসাহিত্য কুটির অভিধান, পাঠ্যপুস্তক, অর্থপুস্তক, ছেলেদের বই প্রভৃতি প্রকাশের দিকে, বেশী মনোযোগী।" (বাংলা বইয়ের ব্যবসা ঃ গোপালচন্দ্র রায়। দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন, ১৯৮১। পৃঃ ৩৬১)। এ. টি. দেব-এর সূত্রপাত বরদাপ্রসাদ কর্তৃক। পরে আশুতোষ দেব ব্যবসার হাল ধরেন।

কমল কণ্ঠাভরণ, বিশিষ্ট আয়ুর্বেদ চিকিৎসক

পৈতৃক নিবাস—ধসা।

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ প্রয়োগে ধন্বন্তরি বিশেষ—স্ত্রীরোগ, নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা, টাইফয়েড প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগ নিরাময়ে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। উনিশ শতকের শেষভাগেও কর্মরত ছিলেন। এনার বিশিষ্ট ছাত্র ধসা নিবাসী বিহারীলাল রায়, তস্য পুত্র হরিসাধন ছিলেন ধন্বন্তরীতুল্য চিকিৎসক।

কালীপদ ঘোষাল (১৯০৬-১৯৯২ খ্রিঃ)

পৈতৃক নিবাস—যাদববাটী।

পিতা-জ্ঞানদাচরণ, মাতা-বসন্তকুমারী।

মাত্র ১৪ বছর বয়স জনৈক আত্মীয়ের উদ্যোগে, শিল্পী নন্দলাল বসু-র সুপারিশে ঠাকুরবাড়ীতে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ শিষ্যত্বলাভ।

অপরাপর শিক্ষাগুরু হলেন, ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটিতে ক্ষিতীন মজুমদার, শৈলেন দে প্রমুখ; ভারতে আগত প্রখ্যাত জাপানী চিত্রশিল্পীদ্বয় ওকাকুরা ও টাইকান।

উল্লেখযোগ্য চিত্রাবলী—সতীর দেহত্যাগ, শ্রীচৈতন্যের অভিসার, নটীর পূজা, হরপার্বতী, শকুন্তলা, সাঁওতালী নৃত্য ইত্যাদি।

ত্রিপুরা ও বর্ধমান রাজপরিবার, মহর্ষি ভবন, অবন মিউজিয়ম, লন্ডনের ইন্ডিয়া হাউসে এনার শিল্পনিদর্শন রক্ষিত আছে।

শেষজীবন অতিবাহিত করেছেন মাতুলালয় গোবিন্দপুর গ্রামে।

দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, (১৮৬২-১৯৩৫ খ্রিঃ)

এম. এ., বি. এল., এল. এল. ডি., সি. আই. ই.

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার।

পৈতৃক নিবাস : ভুরশুট-ব্রাহ্মণপাড়া।

পিতা — বিগ্রেড সার্জন সূর্যকুমার সর্বাধিকারী, জি. এম. সি. বি.,

জন্ম : ডিসেম্বর, ১৮৬২ খ্রিঃ, প্রয়াণ - ১১ আগষ্ট, ১৯৩৫ খ্রিঃ।

উচ্চশিক্ষা : প্রেসিডেন্সী কলেজ (১৮৮২ খ্রিঃ সমাপ্ত) ; এটর্নীশিপ পরীক্ষোত্তীর্ণ (১৮৮৮ খ্রিঃ)।

১৮৯০ খ্রিঃ কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি এবং ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর পরিচালক সমিতির সভ্য নির্বাচিত।

১৮৯৫ খ্রিঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট, সিণ্ডিকেট ও ল' ফ্যাকলাটির সভ্যপদ লাভ।

১৯১৩ খ্রিঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে ইউনির্ভাসিটি কংগ্রেসে যোগদান ; এবার্ডিন বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত এল. এল. ডি. উপাধি লাভ।

১৯১৪ খ্রিঃ ভারত সরকার কর্তৃক সি. আই. ই. উপাধি প্রদান [১৫ জানুয়ারি, ১৯১৪ খ্রিঃ]

— ঐ — মার্চ, ১৯৪৪ খ্রিঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার পদে নিযুক্ত হন।

১৯২৫ খ্রিঃ ভারত সরকারের প্রতিনিধিরূপে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য গমনাগমন।

১৯৩০ খ্রিঃ "লীগ অফ নেশনস"-এ ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব।

এছাড়া, প্রেসিডেন্সী ও রিপণ কলেজের পরিচালক সমিতির সভ্য ; কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিলেন।

এঁর রচিত গ্রন্থ সমূহ ঃ

প্রবাসীর পত্র, উচ্ছাস, স্মৃতিরেখা, Thoughts and Problems, দক্ষিণ আফ্রিকার দৌত্যকাহিনী।

ডাঃ বিভূতিভূষণ মান্না,

এম. বি., এম. আর. সি. পি.; এফ. আর. সি. পি. (এডিন)

পৈতৃক নিবাস : গড়বালিয়া। জন্ম : ১.১.১৯১৮ খ্রিঃ

পিতা : খগেন্দ্রনাথ ; মাতা : সুশীলা দেবী

বিশিষ্ট বক্ষ চিকিৎসক ; ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজ অ্যাণ্ড হসপিটাল-এর বক্ষ চিকিৎসা বিভাগের প্রাক্তন প্রধান। গড়বালিয়া রাখাল চন্দ্র মান্না ইনস্টিটিউশন-এর সচিব এবং সভাপতি পদে দীর্ঘকাল অধিষ্ঠিত থেকে দেশসেবা করেছেন। বর্তমানে স্বগ্রামে একটি অবৈতনিক চিকিৎসাকেন্দ্র পরিচালনা করে থাকেন। ১৯৪৮ থেকে ১৯৭৮ খ্রি পর্যন্ত কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে কর্মরত ছিলেন।

ভবেন্দ্রমোহন সাহা [ভীম ভবানী নামে খ্যাত ব্যায়ামবিদ]

পৈতৃক নিবাস : পাঁতিহাল

পিতা : উপেন্দ্র মোহন সাহা। জন্ম : ১৮৯০ খ্রিঃ

কলকাতার দর্জিপাড়ায় ক্ষেত্র গুহ-র আখড়ার ছাত্র ; ১৯১১ খ্রিঃ, টি. কে. রামমূর্তির দলের সঙ্গে মাত্র ১৯ বছর বয়সে রেঙ্গুন, জাভা, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশ পরিক্রমা। জাপানে সম্রাট মিকাডো কর্তৃক প্রদত্ত স্বর্ণপদক ও অন্যান্য পারিতোষিক লাভ। ভীম ভবানী জাপান গিয়েছিলেন প্রফেসর কে. বসাক পরিচালিত হিপোড্রাম সার্কাসের দলের সদস্যরূপে।

"ভীম ভবানী"-র আশ্চর্যজনক শক্তির খেলা—বুকের ওপর হাতি তোলা, বুকের ওপর চল্লিশ মণ পাথর সহ ২৫ জন মানুষ চাপানো, দুহাত দিয়ে দুটি চলন্ত মোটর গাড়ীকে নিশ্চল করে দেওয়া।

ভবেন্দ্রকে মহাভারতের মহাবলী দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম-এর সাথে তুলনা করে রসরাজ অমৃতলাল বসু উপাধি দেন—"ভীম ভবানী"।

ডাঃ মনীন্দ্রনাথ দে [মণি দে] [১৮৯২-১৯৭৪ খ্রিঃ] এম. আর. সি. পি. (লণ্ডন)

পৈতৃক নিবাস : শিবানন্দবাটী

কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রথম রেসিডেন্ট ফিজিসিয়ান (১৯২৭ খ্রিঃ)। ব্রিটিশ ভারতে বেঙ্গল গভর্নমেন্টের প্রথম ভারতীয় প্রফেসর-ডিরেকটর অফ মেডিসিন, প্রেসিডেন্সী ফিজিসিয়ান।

স্কট প্রণীত "হিস্ট্রি অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন" নামীয় গ্রন্থে তাঁর গবেষণার ফলাফলের উল্লেখ আছে। চিকিৎসা-ক্ষেত্রে মৌলিক গবেষণার জন্য "কোটস্ গোল্ড মেডাল" পাপ্ত হন।

ইনি আজীবন স্বগ্রামবাসীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে গেছেন। স্থানীয় ব্রাহ্মণপাড়া চিন্তামণি ইনস্টিটিউশনে মাধ্যমিক স্তরের পরীক্ষায় উক্ত বিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপকের জন্য "প্রতিমা রানী দে এনডাউমেন্ট ফাণ্ড" থেকে পুরস্কার প্রদান তৎসহ পিতৃস্মৃতি রক্ষার্থে মহাদেব চন্দ্র দে এনডাউমেন্ট ফাণ্ড, উক্ত বিদ্যালয়ের দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রের সাহায্যার্থে সৃষ্টি করে গেছেন।

শ্যামাচরণ দে বিশ্বাস (অক্টোবর, ১৮২০ খ্রিঃ – জুলাই, ১৮৮৪ খ্রিঃ)

পৈতৃক নিবাস : পাঁতিহাল

পিতা : গঙ্গাধর দে বিশ্বাস (ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বেনিয়ান)

মহামতি ডেভিড হেয়ারের বিদ্যালয়, হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ। কর্মজীবনের সূচনায় সরকারী ট্রেজারির অ্যাকাউন্টস বিভাগের কর্মী, তৎপরে সহকারী কম্পট্রোলার। তদানীন্তন কালে "কম্পট্রোলার অফ কারেন্সী অফিস"-এ তিনিই ছিলেন প্রথম ভারতীয়

গেজেটেড অ্যাসিস্ট্যান্ট কম্পট্রোলার। ভারতের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত হিসাবাদি বিলাতে পার্লামেন্টে পেশ করা হলে, ভারত গভর্নমেন্টের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ভারত সচিব কর্তৃক অনুরুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও শ্যামাচরণ "কালাপানি" পার হননি। অবসর গ্রহণের পর 'রায়বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত হন।

বিদ্যাসাগরের সাথে সবিশেষ বন্ধুত্ব ছিল।

ইনি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়্যারম্যান থাকাকালীন প্রয়াত হন। সংস্কৃত কলেজের উত্তরদিকের রাজপথটি এঁর নামে নামাঙ্কিত—শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট।

সত্যনারায়ণ খাঁ – [জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮—অগ্রহায়ণ, ১৩৮৩]

পৈতৃক নিবাস – গোলপোতা, জগৎবল্লভপুর।

জগৎবল্লভপুর জনপদের বিশিষ্ট সমাজসেবী রূপে পরিচিত সত্যনারায়ণ খাঁ সম্পর্কে হাওড়ার জনৈক বিশিষ্ট রাজনীতিবিদের মন্তব্য—"জগৎবল্লভপুরের ইউনিয়ন কাহিনী এই রকম ঃ এখানে জোতদার, জমিদার, মহাজন এবং ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ছিলেন সত্যনারায়ণ খাঁ। কথিত আছে—বিধানসভা নির্বাচনে তিনি তার রিভলবার দেখিয়ে ভোটারদের বাধ্য করেছিলেন অমৃতলাল হাজরাকে ভোট দিতে।" (দ্র. কেউ ভোলে কেউ ভোলে না—জয়কেশ মুখার্জী, কলিকাতা, ১৯৯৭। পৃষ্ঠা-৬৩)। ১৯৫২ খ্রিঃ-তে জগৎবল্লভপুর বিধানসভা কেন্দ্রে জয়ী হয়েছিলেন অমৃতলাল হাজরা এবং ১৯৬২ খ্রিঃ সত্যনারায়ণ খাঁ এই কেন্দ্রের বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। অবশ্য নির্বাচিত বিধায়ক না থাকাকালীন সময়েও তাঁর প্রভাব ছিল যথেষ্ট। গোলপোতা হাসপাতাল, জগৎবল্লভপুর প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্র, শোভারাণী মেমোরিয়াল কলেজ, কিরণময়ী পাঠাগার স্থাপন তাঁর কর্মকৃতিত্বের স্বাক্ষর। জগৎবল্লভপুর হাইস্কুলের উন্নতিতেও তাঁর অবদান অবশ্য স্বীকার্য।

সর্বোপরি, চণ্ডীমাতা ফিল্মস প্রাঃ লিমিটেড-এর মাধ্যমে বাংলার সিনেমা তথা বিনোদন জগতেও যথেষ্ট ছাপ রেখে গেছেন। ইনি ধনী হওয়া সত্ত্বেও এলাকার সুখ-দুঃখের প্রকৃত সাথী ছিলেন সারা জীবনই। যে কারণে তাঁর মৃত্যু সংবাদে এলাকার সমস্ত বাজার, হাট স্বতঃস্ফূর্তভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

সুরেন্দ্রনাথ দাশ, শিল্পরত্ন

পৈতৃক নিবাস : মাজু।

পিতা : অভয়চরণ দাশ। মাতা : কুসুমকুমারী দেবী।

জন্ম : ২৫ আগষ্ট, ১৮৮৩ প্রয়াণ : ১৪ জানুয়ারি, ১৯৮১

(৮ ভাদ্র, ১২৯০ সাল)

শিক্ষালাভ : ব্যাঁটরা মধুসূদন পালচৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয় ; গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুল, কলিকাতা।

ছাত্রাবস্থাতেই সুরেন্দ্রনাথ প্রতিভাবান অঙ্কনশিল্পীরূপে খ্যাতিলাভ করেন। ই. বি. হ্যাভেলের প্রিয় ছাত্র সুরেন্দ্রনাথ, গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে পাঠকালে ১৯০০ থেকে ১৯০৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সরকারী বৃত্তি লাভ করেছেন।

সুরেন্দ্রনাথ বহু খ্যাতনামা ব্যক্তির প্রতিকৃতি অঙ্কন করেছেন। তন্মধ্যে হাওড়া ও কলিকাতায় যেগুলি রয়েছে—

(১) রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড	:	হাওড়া টাউন হল ;
(২) পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী	:	সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হল, কলিকাতা ;
(৩) রাজা রামমোহন রায়	:	(ক) রামমোহন লাইব্রেরী, কলিকাতা ;
		(খ) রাজ্য বিধানসভা ভবন, কলিকাতা ;
(৪) রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ	:	রাজ্য বিধানসভা ভবন, কলিকাতা ;
(৫) ডঃ সূর্য সর্বাধিকারী	:	সেনেট হল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ;
(৬) রানী রাসমণি	:	হাওড়া মিলন মন্দির ;
(৭) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন	:	হাওড়া টাউন হল ;
(৮) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	:	রাজ্য বিধান সভা ভবন, কলিকাতা ;
(৯) জাস্টিস সামসুল হুদা	:	রাজ্য বিধানসভা ভবন, কলিকাতা ,

শিল্পী সুরেন্দ্রনাথের অমর সৃষ্টি ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে অঙ্কিত "রাজা দুষ্মন্তের রাজসভায় শকুন্তলা"—৮×৬ তৈলচিত্র ; ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে এই তৈলচিত্রটি লণ্ডনে ওয়েম্বলী আর্ট একজিবিশনে আধুনিক ভারতীয় চিত্রশিল্পের সর্বোত্তম নিদর্শন রূপে খ্যাতি অর্জন করে।

তেল রঙ, জল রঙ, প্যাস্টেল ও পেন্সিল স্কেচে তাঁর দক্ষতা প্রশ্নাতীত। শিল্পচর্চা ব্যতিরেকে যন্ত্রবিদ্যা, জরিপ কার্যেও অতীব দক্ষতা দেখিয়েছেন। তাঁর উদ্ভাবিত (ক) ট্রেন দুর্ঘটনা নিবারণ কল্পে স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিক যন্ত্র এবং (খ) বৈদ্যুতিক ঘড়ি—উজ্জ্বল আবিষ্কার।

১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে বেনারসস্থিত ভারত ধর্ম মহামণ্ডল সুরেন্দ্রনাথকে "শিল্পরত্ন" উপাধিতে ভূষিত করেন। ঐ সময়ে ভারত ধর্মমহামণ্ডলের সভাপতি ছিলেন দ্বারভাঙ্গার মহারাজা এবং মুখ্য সচিব ছিলেন স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, সি. আই. ই., এল. এল. ডি।

সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী, এম. ডি., (১৮৬৫-১৯২০ খ্রিঃ)

জন্মভূমি : ভূরশুট ব্রাহ্মণপাড়া

পিতা : রায়বাহাদুর ডাঃ সূর্যকুমার সর্বাধিকারী, জি. এম. সি. বি

জন্ম : ১৮৬৫ খ্রিঃ প্রয়াণ : ১৯২০ খ্রিঃ

বৌবাজার স্কুল, হেয়ার স্কুল, প্রেসিডেন্সী কলেজ, মেডিক্যাল কলেজে পাঠগ্রহণ ও প্রথম শ্রেণীর অস্ত্রচিকিৎসকরূপে দেশে-বিদেশে খ্যাতি লাভ করেন।

"কলেজ অফ সার্জেনস অ্যাণ্ড ফিজিসিয়ানস অফ বেঙ্গল" নামীয় চিকিৎসা-বিদ্যালয়

স্থাপন করেন আপার সার্কুলার রোডে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো', সিণ্ডিকেট সদস্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে মেডিক্যাল কলেজের অবৈতনিক ইনস্‌পেক্টর নিযুক্ত হন। ১৯১৬ খ্রিঃ-তে সি. আই. ই. উপাধি লাভ করেন।
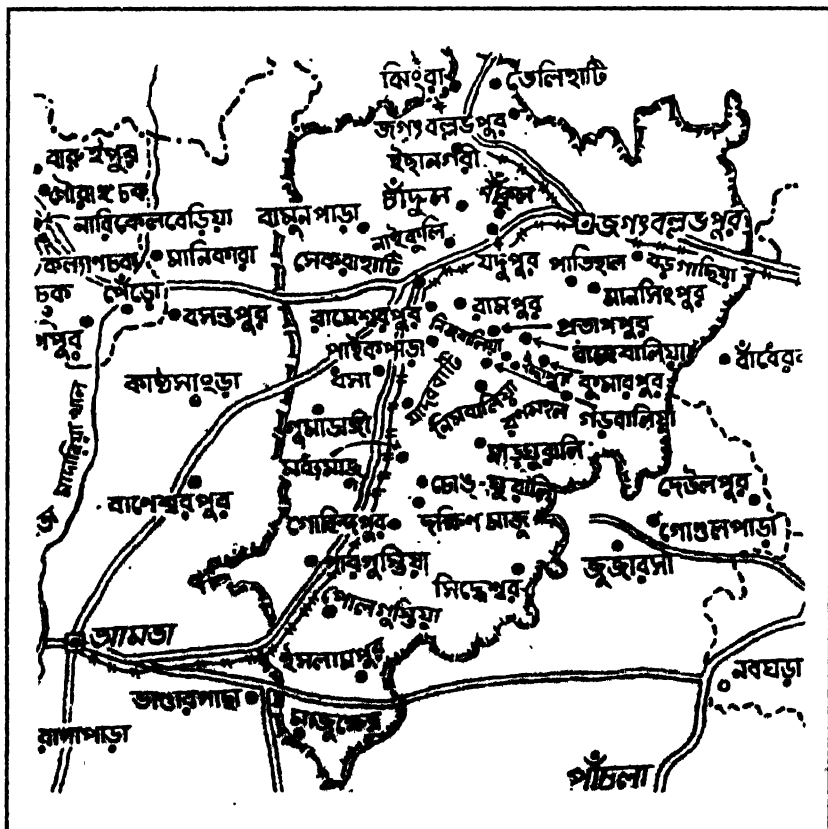
পুরাকীর্তি স্থল : জগৎবল্লভপুর জনপদ

(⊢⊣ ⊢⊣ ⊢⊣ ⊢⊣ জগৎবল্লভপুর থানা সীমানা)

উৎস : হাওড়া জেলার পুরাকীর্তি,

প: ব: সরকার প্রকাশিত

পরিশিষ্ট : এক

জগৎবল্লভপুর থানা–

হাওড়া জেলার সাথে সংযুক্তিকরণ।

যদিও ১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দে জগৎবল্লভপুর থানা হাওড়া জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, কিন্তু ১৮৮০ খ্রিঃ ৯ জুন তারিখে "দ্য ক্যালকাটা গেজেট"-এ সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল জনসাধারণের অবগতির জন্য।

উক্ত সরকারী বিজ্ঞপ্তিটির গুরুত্বপূর্ণ সংশ্লিষ্ট অংশটুকু পরিবেশিত হল–

The Calcutta Gazette, Wednesday, June 9, 1880.

The 5th June 1880. The following arrangement of Zillah and thana boundaries in district Howrah is hereby notified for general information.

Boundaries of District Howrah

Commencing from Village Bhatra on the Roopnarain river, the Northern Boundary runs conterminous with the southern boundary of district Hooghly.

The Eastern boundary follows the Western bank of the Hooghly river southwards to the village of Gadeeara at the junction of river Roopnarain with the Hooghly river.

The southern and western boundary follows the Roopnarain river northwards to the village of Bhatra.

Thana Boundaries

Thana Juggutbullubpore

On the North :- The Zillah boundary from the village of Shontoshpore westwards to the village of Echanugguree.

On the West :- The boundaries of the following villages, viz Echanugguree, Sadut chuk, Bhoputteepore, Norindropore, Shampore Part-I, again Norendropore, Dipa, Poolgooshtee, Jalashee, Ismailpore and Majookhetro.

On the South :- The boundaries of the following villages, viz Majookhetro, Sham chuk, Horishpore Bon, Julla-Bishonathpore, Dhunkee-pachla puschim, Pachla-dukhin, Bicharghat and Pachla.

On the East :- The Domjore Thana.

পরিশিষ্ট : দুই

নিজবালিয়ার দেবী সিংহবাহিনীর প্রাচীনত্ব প্রসঙ্গে—

পরগণা বালিয়া, থানা জগৎবল্লভপুর, মৌজা নিজবালিয়ার [জে. এল. নং ৪৬] কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত দেবী সিংহবাহিনীর দারুমূর্তি ও মন্দিরের প্রাচীনত্ব নির্ণয়ের ক্ষেত্রে উদ্ভুত সমস্যার মূলে আছে মন্দিরের নাটমণ্ডপের শিরোভাগে পোড়ামাটির ফলকে সন্নিবিষ্ট চার পঙক্তির লিপি—'শ্রী রামনারায়ণ মল্লিক / সাং কলিকাতা সকাবদা / ১৭১২। সন ১১৯৭ সাল / মাহ অগ্রহায়ণ।" অপরদিকে আছে উক্ত দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠা বিষয়ে বর্ধমান রাজানুকূল্য সম্পর্কিত একটি জনশ্রুতি।

দেবী সিংহবাহিনীর মূর্তি প্রাচীন দারুভাস্কর্যের অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন। উচ্চতা প্রায় দেড়মিটার, অষ্টভূজা দেবীর বামদিকের হস্তসমূহে ধৃত প্রহরণাদি অসি, বাণ, পাশ এবং ডানদিকের হস্তসমূহে ধৃত প্রহরণাদি ঢাল, ধনুর্বাণ, শঙ্খ। অপরাপর বাম ও ডান হস্তে বর ও অভয়মুদ্রা। পদতলে বাহন সিংহের পৃষ্ঠোপরি দণ্ডায়মানা সহাস্যা দেবী।

দেবীমূর্তি ও মন্দিরের প্রাচীনত্ব বিষয়ে এ যাবৎকালে প্রাপ্ত তথ্যাদির উল্লেখ ও ঘটনাদির বিশ্লেষণ করা যাক—

(১) অধুনা উত্তর ২৪ পরগণাধীন প্রাচীন জনপদ "নিমতা"-র অধিবাসী কবিশেখর বলরাম চক্রবর্তী প্রণীত 'কালিকা মঙ্গল' কাব্যের দিগ্‌বন্দনা অংশে আছে ঃ

"দাধার চণ্ডিকা বন্দোঁ যোড় করি পাণি।
বালিয়ায় বন্দিলাম জয় সিংহবাহিনী।।
ঘুরাল্যে মাখাল বন্দোঁ পুরাশের ঘাটু।
তালপুরে ষষ্ঠী বন্দোঁ হাসনানের বটু।।"

এখানে 'বালিয়া' অর্থে বালিয়া পরগণাস্থিত নিজবালিয়া, 'ঘুরাল্যে' অর্থে নিজবালিয়ার অদূরবর্তী মাড়ঘুরালি মৌজার মহাকাল শিব। 'পুরাশ' (অধুনা আমতা থানাধীন জে. এল. নং ১৮১)-এর জনপ্রিয় লোকদেবতা ঘেঁটু প্রভৃতির উল্লেখ সুস্পষ্ট। উক্ত কাব্যে অবিভক্ত বঙ্গের বহু লৌকিক দেবদেবীর উল্লেখ রয়েছে। কবিশেখর বলরাম সপ্তদশ শতকের শেষভাগে তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন বলে অনুমিত হয়। কারণ কবিশেখর হচ্ছেন রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র (খ্রিঃ ১৭১১-৬০) এবং সাধক কবি রামপ্রসাদের (খ্রিঃ ১৭২০/২১-৮১) পূর্ববর্তী কালের কবি।

সুতরাং এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত এই যে, অষ্টাদশ শতকের পূর্বেই নিজবালিয়ার দেবী সিংহবাহিনীর পরিচিতি এবং অস্তিত্ব বজায় ছিল। অতএব, রামনারায়ণ মল্লিক কর্তৃক ১৭১২ শকে (= ১৭৯০ খ্রিঃ), অষ্টাদশ শতকের শেষ দশকে সিংহবাহিনী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এ তথ্য স্বীকার করা অসম্ভব। ধারণা হয়, বাংলায় বর্গী হাঙ্গামা (১৭৪৩-৫০ খ্রিঃ) এবং পরবর্তীকালে এলাকাটি মহামারী জনিত কারণে জনশূন্য ও হীনবল হলে কলিকাতার ধনকুবের রামনারায়ণ মল্লিক মন্দির সংস্কার করেছিলেন। পূর্বোক্ত লিপিফলক তারই নিদর্শন।

(২) সুপ্রাচীন বালিয়া পরগণার অধীন রসপুর গ্রাম [অধুনা থানা আমতা, জে. এল. নং ১৫৩] হচ্ছে "শিবায়ন" কাব্য রচয়িতা কবিচন্দ্র রামকৃষ্ণ রায়-এর বাসভূমি। "রামকৃষ্ণ রায় কবিচন্দ্র ও রসপুর রায় বংশের ইতিকথা" শীর্ষক পুস্তিকায় লেখা আছে : "রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র ১৫৯০-৯৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৬২৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যেই 'শিবায়ন' কাব্য রচনা শেষ করেন। ...প্রায় ৯০ বৎসর কাল জীবিত থাকিয়া ১৬৮৪ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে (বাংলা ১০৯০ সালের চৈত্রমাসের শেষে) তাঁহার দেহাবসান হয়।" বলা বাহুল্য, সপ্তদশ শতকের সূচনায় বালিয়া পরগণা মধ্যে কবি রামকৃষ্ণ ছিলেন রাজতুল্য পুরুষ। কবির দেহাবসান হয়, তাঁর আরাধ্য ও পারিবারিক বিগ্রহ "রাধাকান্ত দেব", বর্ধমানাধিপতি কৃষ্ণরাম কর্তৃক লুণ্ঠনের প্রতিক্রিয়ায়। এ সম্পর্কে আলোকপাত করে পাঁচুগোপাল রায় পূর্ব-কথিত পুস্তিকায় লিখেছেন ঃ "সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মোগল যুগে দক্ষিণরাঢ়ের বর্ধমান অঞ্চলে এক নূতন রাজবংশের অভ্যুত্থান হয়। এই বংশের পরাক্রান্ত রাজা কৃষ্ণরাম পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি গ্রাস করিয়া নিজ রাজ্য পুষ্ট করিতেছিলেন। এই সময় বালিয়া পরগণায় চৈতন্যসিংহ নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। এই রাজ্যের নাম "আইন-ই-আকবরী"-তে পাওয়া যায়। বাংলা ১০৯০ সালের চৈত্র মাসে রাজা কৃষ্ণরাম চৈতন্যসিংহের রাজ্য ও রাজধানী নিজবালিয়া আক্রমণ ও অধিকার করিয়া লয়েন। নিজবালিয়া, রসপুর হইতে সরল রেখার পথে মাত্র আট মাইল দূরে অবস্থিত। ইহার পরই রসপুরে রামকৃষ্ণের বাটী আক্রান্ত হয় এবং কৃষ্ণরাম বলপূর্বক তাঁহার রাধাকান্ত বিগ্রহ ঠাকুর অধিকার করিয়া লইয়া যান।" [তদেব ১৯৬৪ খ্রিঃ, পৃঃ ১৩]। লোকগীতির আসরেও শোনা যেত এই মর্মন্তুদ কাহিনী—

"রসপুর ত্যাজিয়া যবে রাধাকান্ত গেল।
"হা রাধাকান্ত" বলি রামকৃষ্ণ মরিল।।"—(ভক্তিপদ খাঁ)।

(৩) সমধর্মী বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা কর্তৃক প্রকাশিত এবং অধ্যাপক দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত পূর্ব-কথিত "শিবায়ন" কাব্যের "ভূমিকা" অংশে। দীনেশ বাবু ও আশুতোষ বাবুর প্রণিধান যোগ্য বক্তব্য ঃ

"রসপুর গ্রাম 'বালিয়া' পরগণার অন্তর্গত। ...সরকার সাতগাঁর অন্তর্গত মণ্ডলঘাট, ভূরশুট প্রভৃতির নিকটবর্তী এই পরগণার নাম 'আইন-ই-আকবরী'-তে পাওয়া যায়—রাজস্ব ৯৪,৭২৫ দাম...। এই পরগণা বা রাজ্যে পৃথক রাজবংশ ছিল—বর্ধমান রাজ, বোধহয় সর্বপ্রথম দক্ষিণ-রাঢ়ের এই প্রাচীন রাজ্য আক্রমণ করিয়া বলপূর্বক দখল করেন—বিলুপ্ত রাজবংশের স্মৃতি পর্যন্ত এখন বিদ্যমান নাই। ঐ রাজবংশীয় "রাজা রণসিংহ রায়" হেরম্ব বাচস্পতির পিতামহ যাদবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে ভূমিদান করেন—বর্ধমানরাজ চিত্রসেন ঐ ভূমি যাদবেন্দ্রের বৃদ্ধ প্রপৌত্র রামকানাইকে পুনঃপ্রদান করেন। [হুগলীর ৯১৬১ নং তায়দাদ]। আমাদের অনুমান, সম্রাট শেরসাহের সমকালীন রাজা রণসিংহ রায়ের আমলেই কবির পিতামহ যশশ্চন্দ্র রায়ের অভ্যুদয় হইয়াছিল। পরবর্তী

"রাজা চৈতন্যসিংহ" ১০৮৯ সনের চৈত্রমাসে ভূমিদান করেন। [ঐ ১১১৩৩ নং তায়দাদ]। সুতরাং ঠিক ১০৯০ সনেই রাজা কৃষ্ণরাম বালিয়া পরগণা বলপূর্বক অধিকার করেন। বিলুপ্ত রাজবংশের কুলদেবতা ছিলেন বোধহয়, "সিংহবাহিনী"—কৃষ্ণরাম নিজবালিয়ায় [অর্থাৎ বালিয়া পরগণার রাজধানীতে—কোথায় অবস্থিত গবেষণীয়] ঐ দেবতার নামে বৃহৎ দেবোত্তর দান করেন। [ঐ ৯৩৩৪ নং তায়দাদ—তারিখ ১৭ চৈত্র, ১০৯০ সন] ইহার অব্যবহিত পরেই রসপুর আক্রান্ত হইয়াছিল....।

পূর্বোদ্ধৃত বক্তব্য সমূহের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা :

(ক) শেরশাহের রাজত্বকাল ১৫৪০-৪৫ খ্রিঃ ; বালিয়া-অধিপতি "রাজা রণসিংহ রায়" যদি শেরশাহের সমকালীন বলে গণ্য হন, এবং দেবী সিংহবাহিনী যদি রণসিংহের কুলদেবীরূপে গণ্য হন—তাহলে দেবী সিংহবাহিনীর দারুমূর্তি এবং মন্দিরের নির্মাণকাল অন্ততঃপক্ষে ষোড়শ শতক বলে গণ্য করা উচিত।

(খ) অপরপক্ষে, বর্ধমানাধিপতি কৃষ্ণরামের রাজত্বকাল ১৬৭৫-৯৬ খ্রিঃ। রাজা কৃষ্ণরাম, ওড়িশার পাঠান সর্দার রহিম খাঁ এবং মেদিনীপুরের চেতুয়া-বরদা অধিপতি শোভা সিংহ প্রমুখের সঙ্গে চন্দ্রকোণার যুদ্ধে নিহত হন ১৬৯৬ খ্রিঃ-র জানুয়ারী মাসে। তৎপূর্বে রাজা কৃষ্ণরাম কর্তৃক বালিয়া পরগণাধিপতি চৈতন্যসিংহ নিহত হন সন ১০৯০ সালে [১৬৮৩ খ্রিঃ] অর্থাৎ সপ্তদশ শতকের আশির দশকে। সুতরাং এক্ষেত্রেও কলিকাতার রামনারায়ণ মল্লিক কর্তৃক সিংহবাহিনীর মূর্তি, মন্দির নির্মিত হয়েছিল প্রমাণিত হয় কি? মন্দির লিপি অনুসারে ১৭৯০ খ্রিঃ (১৭১২ শক)।

পূর্বোক্ত হুগলীর ৯৩৩৪ নং তায়দাদ অনুসারে দেবী সিংহবাহিনীর পূজক "মুখোপাধ্যায়" বংশীয়রা যে দেবত্র হিসাবে জমিজমা প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তার হালহদিশ পাওয়া যাচ্ছে একটি রেজেস্ট্রীকৃত জমিজমা বিনিময়ের দলিলসূত্রে। ঐ বিনিময় দলিলটি সম্পাদনের তারিখ হচ্ছে ঃ ২৭ মার্চ, ১৯১৬ খ্রিঃ—বুক নং ১, ভল্যুম নং ৯, বিয়িং নং ৬০৬ ফর দ্য ইয়ার ১৯১৬—সাব রেজেস্ট্রী অফিস জগৎবল্লভপুর। দলিল সম্পাদন কর্তা শ্রী প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রী নিবারণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ; উভয়ের পিতা—উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সাং নিজবালিয়া, পরগণা বালিয়া।।

তবে 'নিজবালিয়া কোথায় অবস্থিত গবেষণীয়'—এ জাতীয় মন্তব্যের দ্বারা "শিবায়ন" কাব্যের ভূমিকায় অভিজ্ঞ সম্পাদকদ্বয় কি বোঝাতে চেয়েছিলেন, তা আমার মত অনেকেরই আজ পর্যন্ত বোধগম্য নয়। —কিন্তু ঐ উক্তির দ্বারা দেবী সিংহবাহিনীর ঐতিহাসিকত্ব বিচারে কোন সন্দেহ থাকার কথা নয়। নিজবালিয়া ও রসপুর অতি প্রাচীন জনপদ, সমগ্র বালিয়া পরগনা মধ্যেই বিশিষ্টতম।

এছাড়া, স্থানীয় জনমানসে প্রতীতি যে, দেবী সিংহবাহিনী বর্ধমান রাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত—এরূপ সিদ্ধান্তও একান্তভাবেই ভুল। বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরাম কেবল পরাস্বপহরণ কর্তা নন, তিনি বিজিত রাজ্যের সুনাম পর্যন্ত মসীলিপ্ত করেছেন। অবশ্য রাজধর্মে এরূপ ঘটনাই স্বাভাবিক। বিজিত, পরাজিত ব্যক্তি বা জাতির ঐতিহ্য সর্বদেশে সর্বকালে প্রথমে

ধূল্যবলুণ্ঠিত হয়, অবশেষে লোকমানসের স্মৃতি থেকে লুপ্ত হয়ে যায়।

বর্তমানে স্থানীয় এলাকায় দেবী সিংহবাহিনী সম্পর্কিত জনশ্রুতি এই প্রকার- "মধ্যযুগের শেষভাগে সম্ভবতঃ আনুমানিক খ্রিঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর কোন এক সময় বালিয়া পরগণার নিজবালিয়া গ্রামে আদ্যাশক্তি শ্রীশ্রী সিংহবাহিনী মাতা আবির্ভূতা হন। কথিত আছে, তদানীন্তন বর্ধমানের মহারাজা ঘোর নিশীথে এক অপূর্ব দেবীমূর্ত্তির স্বপ্ন দেখেন এবং পরদিন রাজসভায় বঙ্গের খ্যাতনামা পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকট স্বপ্নদৃষ্ট দেবীর রূপ বর্ণনা করেন। পণ্ডিতমণ্ডলীর সুচিন্তিত পরামর্শ গ্রহণ করিয়া তিনি শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত শক্তিসাধক নিষ্ঠাবান সদাচারী ব্রাহ্মণ প্রধান এই নিজবালিয়া গ্রামের চারিপার্শ্বের তিরিশ বিঘা জমির মধ্যস্থলে জোড় বাংলোসহ সুরম্য বিশাল মন্দির নির্মাণ করাইয়া সুনিপুণ শিল্পী কর্তৃক নির্মিত স্বপ্নদৃষ্ট সিংহবাহিনী দেবীর দারুমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি মহারাজার মানসী কন্যা নামে পরিচিতা।

মহারাজ নিত্যসেবা পূজা ও ভোগাদির জন্য, পূজারী সেবায়েত ব্রাহ্মণ, সূপকার, মালাকার, কুম্ভকার, কর্মকার, গহলা, ময়রা, জেলে, পরিচারিকা, ঢুলি, পুস্করিণী ও বাজারের ব্যবস্থা করেন।

বর্ধমানের মহারাজ তায়দাদভুক্ত তিনশত পঁয়ষট্টি বিঘা ভূসম্পত্তি দেবীর নামে দান করেন। পরবর্তীকালে গৌড়াধিপতি সেই সংবাদ শ্রবণ করিয়া দেবীর জন্য আরও ভূসম্পত্তি দান করেন। তদবধি প্রতিদিন মায়ের নিত্য পূজার্চনাদি নিয়মিতরূপে সুসম্পন্ন হইয়া আসিতেছে।"

জনশ্রুতিটিকে লিখিত রূপ দান করেছেন প্রবীণ শিক্ষক নিজবালিয়া নিবাসী বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য মহাশয়। (বিজয়কৃষ্ণ বাবু প্রয়াত হয়েছেন ১৩৯৫ সালে)। তৎকৃত বক্তব্য বিগত কয়েক বৎসর ধরে দেবী সিংহবাহিনীর বার্ষিক পূজার্চনাকালে অন্নকূট উৎসব উপলক্ষে [বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস, তিথি সীতানবমী] মুদ্রিত স্মারকগ্রন্থে প্রকাশিত হয়ে আসছে।

প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য হচ্ছে, বর্ধমান রাজবংশের সূচনা সপ্তদশ শতকের মধ্য ভাগে। ভারত সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে ১৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দে বর্ধমান রাজবংশের আদিপুরুষ জনৈক আবু রায় বাৎসরিক ৫৩২ সিককা টাকার বিনিময়ে সরকার সরিফাবাদের ফৌজদারের অধীনে রাজস্ব আদায়কারী চৌধুরী ও বর্ধমান নগরের কোতোয়াল পদ লাভ করেন। আবু রায় — বাবু রায় — ঘনশ্যাম রায় — কৃষ্ণরাম রায় (খ্রিঃ ১৬৭৫-৯৬) — জগৎরাম রায় — কীর্তিচাঁদ — রাজা চিত্রসেন রায় (খ্রিঃ ১৭৪০-৪৪) — মহারাজা ত্রিলোকচাঁদ রায় (খ্রিঃ ১৭৪০-৪৪) — মহারাজা তেজচন্দ্র — রাজা প্রতাপচাঁদ —......।

এই বংশে 'রাজা' উপাধি বর্ধমানাধিপতি চিত্রসেন রায় সর্বপ্রথম লাভ করেন ভারতসম্রাট আলমগীর আওরঙ্গজেবের কাছ থেকে ১৭৪০ খ্রিষ্টাব্দে (২০ রমজান, ২১ জুলুস হিজরী)। সুতরাং পঞ্চদশ শতকে বর্ধমানরাজ কর্তৃক দেবী সিংহবাহিনীর মূর্তি,

মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা ঐতিহাসিক তথ্যের বিরোধী কষ্টকল্পনা মাত্র।

অবশ্য ও'ম্যালী ও চক্রবর্তী সম্পাদিত হাওড়া জেলা গেজেটিয়ারে লিখিত আছে ঃ "Balia with an old temple liberally endowed by the Burdwan Raj with some two thousand bighas of land, a place which probably gave its name to the pargana."

পূর্বকথিত রাজা রণসিংহ রায়-এর স্মৃতি সম্ভবতঃ রয়ে গেছে নিজবালিয়ার প্রা সংলগ্ন 'রণমহল ভূরশুট' গ্রামনামের মধ্যে। ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজা রণসিংহের মহল "রণমহল ভূরশুট"।

দেবী সিংহবাহিনী এবং আলোচ্য এলাকার অন্ধকারাচ্ছন্ন ইতিহাসের ওপর যথাযথ আলোকপাত করা সম্ভব, যদি হুগলীর চুঁচুড়া সরকারী মহাফেজখানায় রক্ষিত তায়দাদ সহ অন্যান্য নথিপত্র পরীক্ষার সুযোগ মেলে। কিন্তু ঐ কর্মটির সুযোগ অন্ততঃ আমার কাছে সীমিত, কারণ গায়ে নেই কোন শামলা! আমি নই কোন আমলা! সুতরাং কে, আমাকে আমল দেবে?

পরিশিষ্ট : তিন

বালিয়া-প্রতাপপুরের আচার্য্য বংশীয়দের প্রব্রজন (migration)

সুপ্রাচীন বালিয়া পরগণার (বর্তমানে জগৎবল্লভপুর থানাধীন) প্রতাপপুর-কৃষ্ণবাটী মৌজা, (জে. এল. নং ২৩) স্বতন্ত্র উল্লেখের দাবী রাখে। এই গ্রামটিতে অতীতে যে ঐতিহ্যপূর্ণ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল তার কিছু বিবরণ রয়েছে উনিশ শতকের শেষার্দ্ধে, হাওড়ার তদানীন্তন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট চন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রচিত "অ্যান অ্যাকাউন্ট অফ হাওড়া ঃ পাস্ট অ্যাণ্ড প্রেজেন্ট" (খ্রিঃ ১৮৭২) নামীয় গ্রন্থে। চন্দ্রনাথ ব্যানার্জী প্রদত্ত বিবরণ ঃ

"There are two families of Jans or Astrologers, in Chuckberia near Sathragachi, who deserve to be mentioned. The present man named Chunder has set himself up to tell their fortunes to such people as consult him. He also pretends to divine secrets, name thieves and robbers, and all for a petty remuneration of one pice, one nut and one koonkee or five chittaks of rice. This man has followed in the footsteps of his father *Ramdhone. He is descended from Bali Acharjeas, a branch of whom came over about one hundred and.....years ago, from Balia-Pratappore, a village twelve miles to the West of Sathragachi,* whither it appears they had migrated from Bali, about one hundred years ago prior to their coming to Chuckerberia. About fifteen years later. or *about one hundred and five years ago, another family of these Acharjeas came over from that village to Chuckerberia* and intermarried with the family that had

preceded them. From the very time of their arrival they set themselves up as astrologers,..."

[*বাঁকা ছাঁদের হরফ* গ্রন্থকার কৃত]

চন্দ্রনাথ ব্যানার্জী প্রদত্ত বিবরণ সূত্রে, বোঝা যাচ্ছে, অষ্টাদশ শতকের সূচনাকালে বালিয়া-প্রতাপপুর নিবাসী 'আচার্য্যি' পরিবারের জনাকয় ভাগ্যান্বেষী প্রথমে গঙ্গাতীরবর্তী ব্রাহ্মণ প্রধান "বালি" এলাকায়, তৎপরে হাওড়ার শহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত চক্রবেড়িয়া [বর্তমানে "জান বাড়ী"] অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। এই ঘটনার কয়েক দশক পরে সরাসরি বালিয়া-প্রতাপপুর গ্রাম থেকে অপর একদল ভাগ্যান্বেষী হাওড়া শহরের চক্রবেড়িয়া অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করেন। বলা বাহুল্য, বর্তমান কালের চক্রবেড়িয়া-জানবাড়ী / সাঁতরাগাছি থেকে বালিয়া-প্রতাপপুরের দূরত্ব পাখি ওড়া পথে কুড়ি কিলোমিটার পশ্চিমে।

এই ঘটনা সম্পর্কে নগর হাওড়ার ইতিহাস বিশেষজ্ঞ ডঃ অলোক কুমার মুখোপাধ্যায় [কর্মজীবনে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট] লিখেছেন ঃ কাসুন্দিয়া গ্রামের পাশেই আর একটি পুরাতন গ্রাম চক্রবেড়িয়া যার পূর্বনাম বেলকুলি। এই বেলকুলি গ্রামের কতিপয় প্রাচীন পরিবারের মধ্যে একটি হলো দালাল পুকুরের কাছে জানবাড়ীর ভট্টাচার্যরা।

এনারা হাওড়ার পাঁতিহালের নিকটস্থ বালিয়া বা বেলে-প্রতাপপুর থেকে প্রায় ২০০ বছরেরও আগে বর্গি আক্রমণের সময় [১৭৪০-৫০ খ্রিঃ] চক্রবেড়িয়া গ্রামে আসেন। বেলে-প্রতাপপুর, সাঁতরাগাছি থেকে বারো মাইল পশ্চিমে। কথিত আছে, এই বংশের এক [পূর্ব] পুরুষ মুর্শিদাবাদে নবাবের এক কন্যার দুরারোগ্য ব্যাধির উপশম ঘটান। নবাব সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে এই বেলকুলিতে নিষ্কর জমি দান করেন। সেই সঙ্গে ঐ ব্যক্তিকে "জান" উপাধি দেন। [নগর হাওড়া, জুন ১৯৯০ খ্রিঃ, পৃঃ ১৩৪-১৩৫]।

অধ্যাপক ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে ঃ চক্রবেড়িয়ার জানবাড়ি দুই শাখায় বিভক্ত। একটি শাখার বর্তমান প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত ঈশ্বরীপ্রসাদ ভট্টাচার্য চক্রবেড়িয়ার জান হিসাবে সুপরিচিত, তাঁর গণনার খ্যাতিও আছে। ঈশ্বরীপ্রসাদের মতে, বালিগ্রাম এই জান-বংশের আদিকেন্দ্র। এঁদের বিখ্যাত পূর্বপুরুষ হলেন বালিগ্রামের অচ্যুত পঞ্চানন। অচ্যুত পঞ্চাননের পুত্র রামরুদ্রকে নাকি সম্রাট আলাউদ্দিন খিলজী (১২৯৬-১৩১৬ খ্রিঃ) 'জান' উপাধি দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় জানবাড়ীর উত্তরপুরুষ হলেন ব্যবহারজীবি ভূদেব ভট্টাচার্য। এঁদের পূর্বপুরুষ, আনুমানিক ১৭৪০-৫০ খ্রিষ্টাব্দে, হাওড়ার পাঁতিহালের কাছে বেলে প্রতাপপুর গ্রামের ভট্টাচার্য পরিবার, চক্রবেড়িয়ায় বসতবাড়ি নির্মাণ করেন। এঁদেরও বৃত্তি ও ব্যবসা ছিল জ্যোতিষচর্চা।

[দ্র. হাওড়া শহরের ইতিবৃত্ত (১ম খণ্ড) ; ১৯৯৪ খ্রিঃ ; পৃঃ ১৬৫-১৬৭]

বলা বাহুল্য, হাওড়া জেলা গেজেটিয়ার [খ্রিঃ ১৯৭২] গ্রন্থে কেবলমাত্র বলা হয়েছে,

আঠারো শতকের মধ্যভাগে বালিগ্রামের আচার্য্য বংশীয়দের একটি শাখা হাওড়া শহরের মধ্য-পশ্চিম অঞ্চলের চক্রবেড়িয়া পল্লীতে বসতি স্থাপন করেন। [সম্পাদনা—এ. কে. ব্যানার্জী, পৃঃ ৪৬৬]। যদিও এই সংবাদের উৎস পূর্বকথিত চন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর "অ্যান আকাউন্ট অফ হাওড়া ঃ পাস্ট অ্যাণ্ড প্রেজেন্ট" নামীয় গ্রন্থ, তথাপি বালিয়া প্রতাপপুর থেকে জ্যোতিষবিদ ভট্টাচার্য পরিবারের প্রব্রজন যাত্রা সম্পর্কে একটি বাক্যও ব্যয় করা হয়নি! স্থানীয় ইতিহাস কিভাবে হারিয়ে যায়, এটা বোধকরি তারই একটা নজীর। বলা বাহুল্য, প্রতাপপুরের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের পাণ্ডিত্যের প্রতিভূ হলেন রামব্রহ্ম শিরোমণি, তৎপুত্র মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ।

এছাড়া, জ্যোতিষবিদ ভট্টাচার্য পরিবারের (বালি ও চক্রবেড়িয়ার) 'জান' উপাধি প্রাপ্তি সম্পর্কে ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডঃ অলোক কুমার মুখোপাধ্যায় যে ব্যাখ্যা-বিবৃতি দিয়েছেন, তার সঙ্গে আমার সংগৃহীত তথ্যের কিছু পার্থক্য রয়েছে। এক্ষেত্রে তার উল্লেখ অবান্তর হবে না মনে করি।

বালি সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রাক্তন সচিব ও গ্রন্থকার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় বিগত ২ এপ্রিল, ১৯৯৬ খ্রিঃ লিখিত এক ব্যক্তিগত পত্রে জানিয়েছেন ঃ "অচ্যুত পঞ্চানন-এর অধস্তন ১২ তম (বারো তম) পুরুষ বালিতে রয়েছেন। তাঁদের কাছ থেকে জানা যায় যে, আচার্য মহাশয় বেলিয়া-প্রতাপপুর থেকে এখানে আসেননি। ওঁরা এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা। [সম্রাট] জাহাঙ্গীরের আমলে এঁরা কিছু নিস্কর ভূসম্পত্তি পান। অচ্যুত মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র পরে লক্ষ্ণৌর-নবাব ওয়াজেদ আলির নিকট থেকে হাওড়ায় জমি পেয়ে সেখানে বসবাস করছেন। সুপ্রসিদ্ধ জানবাড়ী এঁদের। "জান" এঁদের খেতাব, জানা যায় লর্ড মিন্টোর কাছ থেকে এঁরা পান।"

পত্রে উল্লিখিত অচ্যুত পঞ্চানন ছিলেন এক অলৌকিক শক্তিধর জ্যোতিষী। প্রবাদ আছে, গ্রহ-নক্ষত্রের অধিপতিদের সঙ্গেও তাঁর আলাপ-আলোচনা হত। যাহোক, প্রশ্ন হচ্ছে, 'জান' খেতাব কোন্ লর্ড মিন্টো দিয়েছিলেন? প্রথম লর্ড মিন্টোর ভারত শাসনকাল ১৮০৭-১৮১৩ খ্রিঃ (উনিশ শতকের প্রথমভাগ) আর দ্বিতীয় লর্ড মিন্টোর ভারত শাসনকাল ১৯০৫-১৯১০ খ্রিঃ (বিংশ শতকের প্রথম পাদ)। বর্তমানে আলোকপাত বাঞ্ছনীয়—'জান' খেতাবের প্রচলন কিভাবে হয়েছিল?

আমার কৈশোরে বালিয়া-প্রতাপপুরের পার্শ্ববর্তী গ্রাম নিজবালিয়ার হরিসত্য ভট্টাচার্য মহাশয়কে বহুবার দেখেছি। তিনি লুপ্ত বস্তু বা হারানো জিনিসের সন্ধান দিয়েছেন শ্লেটে অথবা মাটিতে ছক কেটে ; বিনিময়ে নিয়েছেন একটি গোটা পান, একটি সুপারী, পাঁচ ছটাক চাল, সোয়া পাঁচ আনা পয়সা। শেষোক্ত দ্রব্যগুলিকে ছকের মাথায় বসিয়ে গণনা করতেন। হরিসত্যবাবু দীর্ঘকাল পাঁতিহাল দামোদর ইনস্টিটিউশনে শিক্ষকতা করেছেন, অনেক সম্পন্ন বাড়ীতে গৃহশিক্ষকতাও করতেন, সরস্বতী পূজার দিনে "হাতে খড়ি" দিতেন। ঐ অঞ্চলে একদা জ্যোতিষ চর্চার যে প্রচলন ছিল তার শেষ প্রতিভূ সম্ভবতঃ হরিসত্য ভট্টাচার্য মশায়।

পরিশিষ্ট : চার

গ্রাম-নামের উৎস সন্ধান

বহু সময়েই গ্রাম-নামের মধ্যে অতীত ইতিহাস, ভৌগোলিক পরিবেশের বৈশিষ্ট্য, অর্থনৈতিক অবস্থার সূত্র-সন্ধান পাওয়া সম্ভব। আলোচ্য জনপদের কয়েকটি গ্রাম-নামের উৎস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল।

ইসলামপুর [জে. এল. নং ৭৬]

পুরাতন জরিপ মানচিত্র ও নথিপত্রে এই গ্রামের নাম হচ্ছে ইসমাইলপুর, যা লোকমুখে বর্তমানে হয়েছে ইসলামপুর।

ইসমাইলপুর গ্রাম-নাম প্রবর্তনের পিছনে সম্ভবতঃ রয়েছে দক্ষিণ রাঢ়ের প্রখ্যাত ইসলাম ধর্মপ্রচারক ইসমাইল গাজীর পূত স্মৃতি। দক্ষিণ রাঢ়ের মান্দারণ-ভূরশুট-বালিয়া পরগণা খুবই প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ জনপদ। এই এলাকায় ইসমাইল গাজী ওরফে সুফী খাঁ ওরফে বড় খাঁ গাজীকে কেন্দ্র করে সতেরো-আঠারো শতকে একটি ইসলামি-বাংলা সাহিত্য-ধারার সূচনা হয়েছিল। ঐকালে রচিত বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের দিগ্‌বন্দনায় গায়ক-কবির দল সূফী খাঁ ওরফে ইসমাইল গাঁজী বা বড় খাঁ গাজীকে প্রণতি জানিয়েছেন। কবি শাহ গরীবুল্লাহ তাঁর কাব্যেও বড় খাঁ-র স্বপ্নাদেশ বা বাতুনের উল্লেখ করেছেন।

গড়বালিয়া [মৌজা নিজবালিয়া, জে. এল. নং. ৪৬]

মৌজা নিজবালিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত গ্রাম গড়বালিয়া-র নামকরণের ক্ষেত্রে অবদান রয়েছে অতীত ইতিহাসের। গড়বালিয়ার পশ্চিম সীমানার এক অংশে ছিল 'গড়খাই' যা বছর ৫০ পূর্বেও দেখা যেত। এছাড়া আলোচ্য জনপদে 'বালিয়া' শব্দযুক্ত কয়েকটি গ্রাম-নাম রয়েছে, যার দ্বারা এলাকার মৃত্তিকার গঠন বৈশিষ্ট্য আভাসিত। 'বালিয়া' শব্দের ব্যাখ্যায় পাচ্ছি : Balia is a common name for all soils in which the proportion of sand exceeds that of clay. [cf. Dist. Census Hondbook : 24-Parganas. Ed.–A. Mitra, 1954. P-ix].

বলা বাহুল্য, এই এলাকার মৃত্তিকায় বালির আধিক্য ; এমনকি ভূ-স্তরের নীচে ১ মিটারের মধ্যেই পাওয়া যায় সোনারঙা অতি মিহি বালির একটি স্তর।

গোলপোতা [জে. এল. নং ১৩]

'গোল' শব্দটি নিয়ে কোন গোলমাল নেই। 'পোতা' অর্থে বোঝায় ঘরের ভিত, ভিটা।

প্রাচীন কৌশিকীর জলপ্রবাহ আলোচ্য মৌজাটিকে কতকটা অশ্বক্ষুরের ন্যায় বেড় দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে—এই সূত্রেই 'গোলপোতা' নামের প্রচলন স্বাভাবিক মনে হয়। আবার, অতীতে স্রোতবহা কৌশিকীর বুকে জলযানের স্বাভাবিক সুরক্ষিত আশ্রয় সূত্রেও গোল পোতা [শ্রয়] নামের চলন ঘটতে পারে।

জগৎবল্লভপুর [জে. এল. নং ৪]

আলোচ্য মৌজাটির নামেই উনিশ শতকে ব্রিটিশ আমলে একটি থানা-এলাকার নামকরণ হয়েছে।

জগৎবল্লভপুর নামকরণের ক্ষেত্রে দুটি ঐতিহাসিক ঘটনার ছায়াপাত ঘটেছে—(১) লোকশ্রুতি, সম্রাট আকবরের সেনাপতি রাজা মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ যুদ্ধার্থে আলোচ্য জনপদে কিছুকাল বসবাস করেছিলেন। জগৎসিংহের নামানুসারেই মৌজাটির নাম হয় জগৎবল্লভপুর।। (২) কথিত হয়, বর্ধমান রাজ আলোচ্য এলাকার কোন এক স্থানে জগৎবল্লভের মন্দির স্থাপন করেছিলেন—ঐ সূত্রে গ্রামের নাম হয় জগৎবল্লভপুর। বলা বাহুল্য মৌজাটির প্রাচীনতর নাম হচ্ছে মামদানীপুর।

নিজবালিয়া [জে. এল. নং ৪৬]

'নিজ' অর্থে বোঝায় নিজস্ব, খাস, স্বকীয়। অনুমান, এলাকাটি কোন প্রবল প্রতাপ ভূস্বামীর খাস এলাকা ছিল। এটা নিঃসন্দেহ যে, একদা এই এলাকার অধিপতি ছিলেন রাজা রণসিংহ, যিনি সম্রাট শেরশাহের সমকালীন বলে গণ্য হন। তাঁর কুলদেবী সিংহবাহিনী আজও এলাকা-মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ। 'নিজবালিয়া' থেকেই "বালিয়া পরগণা"র নামোৎপত্তি কিনা বলা শক্ত, তবে এ সম্পর্কে ও'ম্যালী-চক্রবর্তী সম্পাদিত হাওড়া জেলা গেজেটিয়ারে বলা হয়েছে, "a place which probably gave its name to the pargana."

পাঁতিহাল [জে. এল. নং ৪৯]

উনিশ শতকে গ্রামের নাম ছিল পৈতাল, লোকমুখে পাইতাল—পাইতেল ; ভিন্নভাবে পাতিহাল—পাঁতিহাল, ইংরাজীতে PANTIHAL (পান্‌তিহাল)। এই মৌজাটির নামকরণের ক্ষেত্রে দুটি ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে—

(১) পাতিহাল শব্দটির দুটি ভাগ, পাতি = ছোট, হাল = হাল-লাঙ্গল। অতীতে এলাকাটি ছিল নদী তীরবর্তী বাদা অঞ্চল, আষাঢ় মাস থেকে কার্তিক পর্যন্ত জলে ডুবে থাকত। সে সময় দূরবর্তী এলাকা থেকে, বর্ষার প্রারম্ভে "পাতি" চাষীর দল—ছোট ছোট জোতের চাষী, "হাল" ও বলদ নিয়ে চাষ করতে আসত, বাঁধের ওপর বসবাস করত, চাষের শেষে ঘরে ফিরত। এভাবে ধীরে ধীরে চাষবাসের সূত্রে গ্রামের পত্তন হয়—ক্রমে গ্রামের নাম হয় পাতিহাল। "প"-য়ে চন্দ্রবিন্দু যুক্ত হয় আরও পরবর্তীকালে।

(২) পাতিহাল গ্রামের কুম্ভকারদের খ্যাতি বহুকালের। কুম্ভকারদের বাড়ীর আশপাশ, উঠান, দালান, দাওয়া সর্বত্র হাঁড়ি, কলসী, সরা, ডাবা ইত্যাদি "পাই" (=পাত্র ; এ অঞ্চলে বিশেষ প্রকারের মাটির জলপাত্র বা জালাকে এখনও লোকে বলে "পাই") "তাল" (= স্তূপাকৃতি) আকারে সাজানো থাকে—ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের মেয়েরা, লোকজনেরা গ্রামটিকে বলত পাইতাল—পাইতেল—পৈতাল।

[পাঁতিহাল দামোদর ইনস্টিটিউশনের প্রাক্তন শিক্ষক শ্রীরতন চন্দ্র বাগ মহাশয়ের সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য।]

প্রতাপপুর-কৃষ্ণবাটী [জে. এল. নং ২৩]

আলোচ্য মৌজাটি : সম্ভবতঃ ভূরশুট রাজবংশের সবচেয়ে কীর্তিমান পুরুষ রাজা প্রতাপনারায়ণ এবং তাঁর প্রপিতামহ কৃষ্ণরায়ের নাম বিজড়িত। রাজা প্রতাপনারায়ণ কমপক্ষে ১৬৫২ থেকে ১৬৮৪ খ্রিঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। বিদ্যোৎসাহী ও দাতা বলে তাঁর খ্যাতিও ছিল। তাঁর সম্পাদিত বিভিন্ন ভূমিদান পত্রে ১০৫৯, ১০৭৫, ১০৭৭, ১০৯১ সাল তারিখ পাওয়া গেছে। একদা ব্রাহ্মণ প্রধান 'প্রতাপপুর-কৃষ্ণবাটী' শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রেও ছিল প্রাগ্রসর। মনে হয়, রাজা প্রতাপনারায়ণের আমলেই মৌজাটির এইরূপ নামকরণ হয় এবং যথাযথ বংশ গৌরব প্রকাশের জন্য তাঁর প্রপিতামহের নামও যুক্ত হয়ে যায়, যুগ্ম নামে মৌজাটি পরিচিত হয়।

ভূরশুট রণমহল [জে. এল. নং ৪৩]

আলোচ্য গ্রাম-নামটি সম্ভবতঃ স্মৃতি বহন করে চলেছে অঞ্চল বিশেষের ভূমি-অধিপতি রাজা রণসিংহ রায়-এর। অদূরবর্তী নিজবালিয়া গ্রামে নিত্য-পূজিতা সিংহবাহিনী ছিলেন রাজা রণসিংহের কুলদেবী। ইনি ছিলেন সম্রাট শের শাহ-র সমকালীন। রণমহল গ্রাম নামের সাথে ভূরিশ্রেষ্ঠ শব্দটি যুক্ত থাকায়, মনে হয়, ইনি ভূরশুট রাজবংশেরই কোন বংশধর : অথবা, ভূরশুট—"ভূরিশ্রেষ্ঠ" শব্দ প্রয়োগের দ্বারা নিকটবর্তী অপরাপর গ্রাম-এলাকা স্থান থেকে বহু পরিমাণে 'শ্রেষ্ঠ' এইরূপ ইঙ্গিত বহন করছে।

জগৎবল্লভপুর জনপদে অপর একটি গ্রামের নাম হল, কৌশিকী নদীতীরবর্তী ভূরশুট ব্রাহ্মণপাড়া। এছাড়া, ভূরশুট অভিধাযুক্ত গ্রাম-নাম হাওড়া জেলাতেই বিরল।

মাজু

জগৎবল্লভপুর জনপদে 'মাজু' নামযুক্ত চারটি মৌজা আছে। যথা—দক্ষিণ মাজু, মধ্য মাজু, উত্তর মাজু ও মাজুক্ষেত্র। জে. এল. নং যথাক্রমে ৩২, ৩৩, ৩৪ ; ৭৭।

দক্ষিণ মাজু নিবাসী শ্রী নারায়ণ ঘোষাল "মাজুশব্দের উৎস সন্ধানে" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন : মনে হয় এককালে এই এলাকায় প্রচুর পরিমাণে মাদুর কাঠির চাষ, মাদুর ব্যবসা প্রসার লাভ করেছিল। ঐ সূত্রে "মাদুর" শব্দ থেকে লোকমুখে মাদু—মাজু শব্দের উদ্ভব ও গ্রাম-নাম রূপে গৃহীত হয়ে থাকবে।

হাফেজপুর বাটী [জে. এল. নং ১০]

সরকারী খাতাপত্রে হাফেজপুরবাটী, লোকমুখে প্রচলিত 'হাফেজপুর' নামের পিছনে রয়েছে একটি কাহিনী।

আলোচ্য মৌজাটি তিনজন সুফী সাধকের বাসভূমি রূপে চিহ্নিত। যথা—সুফী সাধক মোল্লা মখদুম, সুফী সাধক শাহ্ সৈয়দ আজমোতুল্লাহ ওরফে ফুলওয়ারী শাহ্ ওরফে শাহ্ দুন্দি ; সুফী সাধক ও কবি শাহ্ সৈয়দ গরীবুল্লাহ।

সুফী মোল্লা মখদুমের জামাতা হলেন শাহ্ দুন্দি এবং শাহ্ দুন্দির জ্যেষ্ঠপুত্র হলেন সৈয়দ গরীবুল্লাহ। শাহ্ দুন্দির এক কন্যা মাত্র সাত বৎসর বয়সে সমগ্র কোরাণ শরীফ কণ্ঠস্থ করে "হাফেজ" হয়েছিলেন। ঐ সূত্রেই মৌজাটির নাম হয় হাফেজপুরবাটী। বলা বাহুল্য, মধুরস্বরে যাঁরা কোরাণ আবৃত্তি করেন, তাঁরা 'কারি' এবং সমগ্র কোরাণ যাঁরা কণ্ঠস্থ রাখতে পারেন, তাঁরা "হাফেজ,/হাফিজ,/হাফেজা" নামেই পরিচিতি লাভ করেন।

পরিশিষ্ট : পাঁচ

গড়বালিয়া রাখাল চন্দ্র মান্না ইনস্টিটিউশন : নামকরণ প্রসঙ্গ

আলোচ্য বিদ্যালয়টির নামকরণের ক্ষেত্রে যে দু'জন পুণ্যাত্মা ব্যক্তির স্মৃতি বিজড়িত, তাঁরা হলেন গড়বালিয়ার শ্রীনিবাস মান্না-র জ্যেষ্ঠ পুত্র রাখালদাস ও কনিষ্ঠ পুত্র চন্দ্রকান্ত। রাখালদাস ও চন্দ্রকান্ত উভয় সহোদর ভ্রাতার আমলে সম্পাদিত দলিলের প্রতিলিপি মুদ্রিত করা গেল, আমার বক্তব্যের স্বপক্ষে এবং পাঠকবর্গের সন্দেহ নিরসন কল্পে—অর্থাৎ "রাখাল চন্দ্র" দু'জন প্রয়াত ব্যক্তির নামের স্মৃতি বহনকারী প্রতিষ্ঠান হচ্ছে : গড়বালিয়া রাখাল চন্দ্র মান্না ইনস্টিটিউশন। বলা বাহুল্য, রাখালদাস ও চন্দ্রকান্ত উভয় ভ্রাতাই ১৩৩১ বঙ্গাব্দে—জ্যেষ্ঠ প্রথমজন শ্রাবণ মাসে, কনিষ্ঠজন ফাল্গুন মাসে প্রয়াত হন। রাখাল দাস ও চন্দ্রকান্ত উভয় ভ্রাতার প্রতিকৃতি মুদ্রিত করে দেয়া গেল—

রাখাল দাস মান্না

চন্দ্রকান্ত মান্না

রাখাল দাস মান্না ও চন্দ্রকান্ত মান্নার জীবিতকালে সম্পাদিত দলিল

রাখাল দাস মান্না ও চন্দ্রকান্ত মান্নার জীবিতকালে সম্পাদিত দলিল

পরিশিষ্ট : ছয়

পাঁতিহাল গ্রামে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শুভাগমন।

স্বনামধন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে ১৮৫৪ খ্রিঃ-র ২১মে থেকে ৯জুন পর্যন্ত তদানীন্তন হুগলী জেলার শিয়াখালা, রাধানগর, কৃষ্ণনগর, ক্ষীরপাই, চন্দ্রকোণা, রামজীবনপুর, মায়াপুর, মলয়পুর, কেশবপুর প্রভৃতি গ্রাম পরিদর্শন অন্তে ১০ ও ১১ জুন তারিখে পাঁতিহাল গ্রামে অবস্থান করে স্থানীয় বিদ্যোৎসাহীদের সঙ্গে একটি বিদ্যালয় স্থাপন বিষয়ে আলোচনাদি করেছিলেন।

বাঙলার গ্রাম-গঞ্জে শিক্ষাবিস্তারের জন্য ভারত সরকারের উপযুক্ত প্রতিনিধিদের সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যে সকল আলোচনা ইতিপূর্বে হয়েছিল, তারই ভিত্তিতে তিনি ১৮৫৪ খ্রিঃ ৩ জুলাই বাঙলার ছোটলাটের প্রাইভেট সেক্রেটারী ক্যাপটেন এইচ. সি. জেমসকে একখানি পত্র লিখেছিলেন। এই পত্রখানিতেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পাঁতিহাল পরিদর্শন সম্পর্কিত তথ্যাদি পাওয়া যায়। উক্ত পত্রের কিয়দংশ নিম্নে উল্লেখিত হল। পত্রের সূচনায় আছে—

"Agreeably to the instructions of the Honorable the Lieutenant Governor of Bengal verbally communicated to me by his Honor, I visited, from 21st of May to 11th June last, several places in the District of Hooghly for the purpose of selecting suitable villages and towns for establishing the contemplated vernacular schools, and beg to leave to request the favor of your submitting to His Honor the following report."

এই তথ্যপূর্ণ সুদীর্ঘ পত্রের ১১ নং পয়েণ্টে পাঁতিহাল সম্পর্কে লিখেছিলেন—

11. Last of all on the 10th and 11th of June last, I visited Pantihal, a place about 16 miles West of Howrah. Pantihal and several villages in close contact with it contain about three thousand families. The principal inhabitants, with whom I conversed on the subject of vernacular school, expressed their eager desire to have one at Pantihal. They are prepared to erect a school-house and make it over to government with the piece of land on which it would be erected. Pantihal fully deserves to have a vernacular school estalished there.

পাঁতিহাল গ্রামে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আগমন ও একটি বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়াসের নেপথ্যে তাঁর একান্ত বিশ্বাসভাজন ও অন্তরঙ্গ সুহৃদ শ্যামাচরণ দে বিশ্বাসের ভূমিকা থাকাই সঙ্গত। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ২৪ নভেম্বর, ১৮৫৭ খ্রিঃ—১৫ মে, ১৮৫৮ খ্রিঃ কালমধ্যে হুগলী জেলায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে যে ২০টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল, তার মধ্যে পাঁতিহাল ছিল না। আবার ইতিপূর্বে ২২ আগষ্ট, ১৮৫৫—১৪ জানুয়ারি ১৮৫৬ খ্রিঃ কালমধ্যে ঐরূপে স্থাপিত "মডেল" বিদ্যালয়গুলির

মধ্যেও পাঁতিহালের নাম নেই।

এই ঘটনার কারণ একাধিক হওয়াই সম্ভব। যেমন, সরকারী স্তরে সিপাহী বিদ্রোহ জনিত কারণে ব্যয়সঙ্কোচ এবং পরবর্তীকালে শিক্ষানীতি নিয়ে সরকারের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের মতদ্বৈধতা। এছাড়া, সামাজিক ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাই ছিল নারীশিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা। হিন্দু কলেজের প্রখ্যাত ছাত্র ইংরাজী শিক্ষিত কাশীপ্রসাদ ঘোষ [পৈতৃক নিবাস পাঁতিহাল] তাঁর "দ্য হিন্দু ইনটেলিজেন্সার' পত্রিকাতেও নারী শিক্ষা প্রসার বিরোধী প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন!! আর স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয় "নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভাণ্ডার" গঠন করে সম্ভ্রান্ত দেশী-বিদেশী দাতাদের আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করেও শেষপর্যন্ত তাঁর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত অধিকাংশ বিদ্যালয়কে রক্ষা করতে পারেননি। এরকম এক দূর্ভাগা পরিস্থিতিতে ১৮৮২-৮৩ খ্রিঃ-তে পাঁতিহাল গুমোতলায় মিডল ইংলিশ স্কুল, (পরবর্তীকালে পাঁতিহাল বোর্ডস মডেল মিডল ইংলিশ স্কুল নামে সুপরিচিত) স্থাপিত হয়েছিল—এই বিদ্যালয়টির সাথে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রত্যক্ষ সংযোগের কথা এ যাবৎ জানা যায় নি। আর ১৮৪৬ খ্রিঃ জগৎবল্লভপুরে "এডেড স্কুল" বা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়েছিল "উত্তরপাড়া"-র জমিদার মুখার্জী পরিবার দ্বারায়। যাহোক, এ সকল ঘটনাই আলোচ্য জনপদে আধুনিক কালোপযোগী ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের প্রথম পর্ব কিভাবে অতিবাহিত হয়েছিল, তার সাক্ষ্য দেয়।
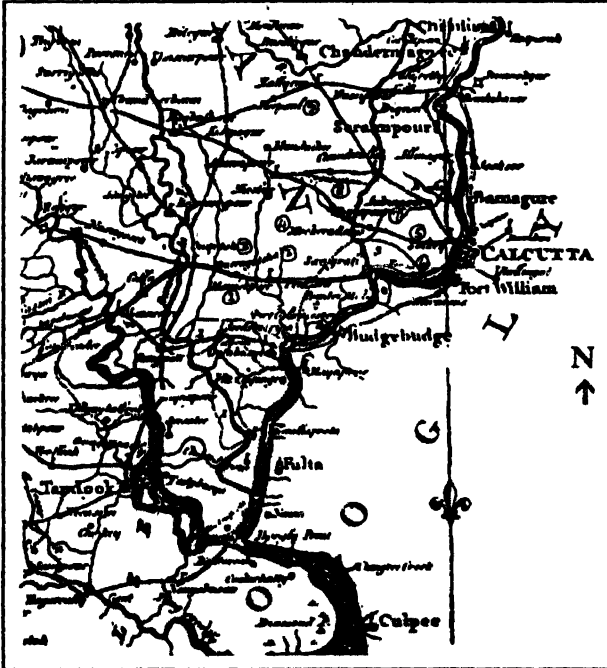
১৭৭৯খ্রি: অঙ্কিত রেণেলের মানচিত্রে প্রদর্শিত স্থান
(১) মাণিকপীর
(২) বড়গাছিয়া
(৩) আমতা
(৪) মাকড়দহ
(৫) সালকে
(৬) তানাদুর্গ
(৭) রাজপুর

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যাঁদের সহায়তায় গ্রাম পরিক্রমা আনন্দদায়ক হয়ে উঠেছে, সরেজমিন ক্ষেত্রে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ সহজসাধ্য হয়েছে :

নাম	ঠিকানা
১. সর্বশ্রী বাসুদেব মান্না, শিক্ষক	— বোহারিয়া, পোঃ - হাঁটাল ;
২. নিত্যানন্দ মাইতি, শিক্ষক	— যমুনাবালিয়া, পোঃ - নিজবালিয়া
৩. গোপীকান্ত মেথুর, শিক্ষক	— কৃষ্ণনন্দপুর, পোঃ - মুন্সিরহাট ;
৪. সাদিক মহম্মদ, শিক্ষক ও নাট্যবিশারদ	— হাফেজপুর, পোঃ - মুন্সিরহাট ;
৫. কাশীনাথ আদক, শিক্ষক }	— ঐ —
৬. পার্থনাথ আদক, শিক্ষক	
৭. রতন চন্দ্র বাগ, শিক্ষক }	— পাঁতিহাল (গ্রাম + পোঃ) ;
৮. পান্নালাল পাল, শিক্ষক	
৯. প্রাণকৃষ্ণ বাগ, শিক্ষক	
১০. মাধব ঘোষাল, প্রাক্তন ছাত্র	
১১. নিরঞ্জন রায়, প্রাক্তন শিক্ষাকর্মী	— রণমহল, পোঃ গড়বালিয়া ;
১২. অমরেন্দ্র নাথ মান্না, শিক্ষক	— ইসলামপুর ;
১৩. শিশির কুমার আদক, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক	— মাজু আর. এন. বসু হাইস্কুল ;
১৪. নারায়ণ ঘোষাল, চাকুরীজীবি }	— গ্রাম + পোঃ-মাজু ;
১৫. দিবাকর ঘোষাল, সমাজসেবী	
১৬. বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, গ্রন্থাগার কর্মী	— মাজু পাবলিক লাইব্রেরী ;
১৭. দিবাকর চক্রবর্তী, লোকগীত গায়ক	— মাজু ;
১৮. মদনমোহন বাগ, শিক্ষক	— মাজু ;
১৯. প্রদীপ ধাড়া, শিক্ষক	— মাজু ;
২০. সঞ্জীব কর্মকার, ছাত্র	— সন্তোষবাটী, পোঃ মাজু ;
২১. জগন্নাথ পাত্র	— শঙ্করহাটি, পোঃ মুন্সিরহাট ;
২২. গণেশ চন্দ্র চৌধুরী, শিল্পী	— মুদ্রণী, ধসা, পোঃ মুন্সিরহাট ;
২৩. ডাঃ অলক কুমার সর্বাধিকারী, হোমিও চিকিৎসক	— ভুরশুট ব্রাহ্মণপাড়া ;
২৪. ডাঃ পিনাকপাণি দাস, হোমিও চিকিৎসক ও শোলাশিল্পী	— রামেশ্বরপুর ;
২৫. বৃন্দাবন ঘোষ, প্রাক্তন শিক্ষক	— চোঙঘুরালি ;
২৬. প্রসূন ব্যানার্জী, শিক্ষার্থী	— পাইকপাড়া ;
২৭. ললিতমোহন পাল, শিক্ষক	— পোলগুস্তিয়া ;
২৮. নিধন পণ্ডিত, ধর্মঠাকুর পূজক	— নিজবালিয়া ;

২৯. জ্যোতিপ্রসাদ রায়, শিক্ষক — বাঁকুল ;
৩০. রঞ্জন ঘোষ, শিক্ষক — জগৎবল্লভপুর হাইস্কুল ;
৩১. নবকুমার বাদুড়ী, শিক্ষক — গোলপাতা, জগৎবল্লভপুর ;
৩২. হৃষীকেশ কল্যে, শিক্ষক — নিজবালিয়া ধর্মতলা প্রাঃ বিঃ ;
৩৩. দাশরথি জানা, শিক্ষাকর্মী — শিয়ালডাঙ্গা (গ্রাম + পোঃ) ;
৩৪. রাসবিহারী জানা, কীর্তন গায়ক — ঐ — ;
৩৫. দুর্গা ভট্টাচার্য, শিক্ষক ; প্রাক্তন সভাপতি, — জগৎবল্লভপুর পঞ্চায়েত সমিতি ;
৩৬. নির্মল কুমার মুখার্জী, যশস্বী যাত্রাভিনেতা — প্রতাপপুর-কৃষ্ণবাটী ;
৩৭. প্রসাদচন্দ্র পণ্ডিত, "ধর্ম" পূজক — ধসা ;
৩৮. স্বপন কুমার মল্লিক — জগৎবল্লভপুর ১ নং প্রাঃ পঃ ;
৩৯. সুনীল মাদারি — শঙ্করহাটি ১ নং প্রাঃ পঃ ;
৪০. ঝর্ণা ঘোষ — জগৎবল্লভপুর ২ নং প্রাঃ পঃ ;
৪১. শ্যামলী দাস — বড়গাছিয়া ১ নং প্রাঃ পঃ ;
৪২. রতন কুমার গোলুই, সভাপতি, — জগৎবল্লভপুর পঞ্চায়েত সমিতি ;
৪৩. প্রভাত কুমার মিশ্র — বিশালাক্ষ্মী পূজক, নাইকুলী ;
৪৪. প্রাণধন চক্রবর্তী — মাজু গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস ;
৪৫. বীরেশ্বর ব্যানার্জী — মুন্সিরহাট পাবলিক লাইব্রেরী ;
৪৬. তিলু হাঁসদা — জারপা গাঁওতা, জগৎবল্লভপুর ;
৪৭. মানবমোহন মিশ্র — শিয়ালডাঙ্গা অভিনব গ্রন্থাগার ;
৪৮. কামাখ্যাচরণ হাজরা, সংগঠক কর্মী, — অভিনব গ্রন্থাগার, শিয়ালডাঙ্গা ;
৪৯. ভীম একাদশ ক্লাব সদস্যবৃন্দ — গুমাডাঙ্গী ;
৫০. শুকদেব গোলুই, (সত্তরোর্ধ বৃদ্ধ) — মাজু ;
৫১. নিজবালিয়া সবুজ গ্রন্থাগার কর্মীবৃন্দ ; — — —
৫২. শিয়ালডাঙ্গা অভিনব গ্রন্থাগার কর্মীবৃন্দ ; — — —
৫৩. সৌমেন্দু গোস্বামী, সিদ্ধেশ্বর গীতাঞ্জলি সঙ্গীত শিক্ষায়তন ;
৫৪. প্রসাদ চক্রবর্তী, অক্ষয় হালদার, কাশীনাথ হালদার,—যদুপুর
৫৫. অনিমা হালদার, গঙ্গা মালিক—ধর্মরাজ পূজারিণী—যদুপুর।

গ্রন্থ, প্রবন্ধ, পুরাতন নথি ইত্যাদি যাঁদের দৌলতে পেয়েছি—

১. শ্রী তারাপদ সাঁতরা, নবাসন, পোষ্ট - বাগনান, হাওড়া - ৭১১৩০৩
২. শ্রী সিদ্ধেশ্বর মণ্ডল, [প্রাক্তন চীফ ইঞ্জিনীয়ার, কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট] ; বর্তমানে "অমরাবতী", ১১২/১৯/এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা - ৮২।
৩. ডাঃ দেবাশিস বসু, নির্বাহী সম্পাদক, 'কৌশিকী' পত্রিকা ;
৪. ডঃ অলোককুমার মুখোপাধ্যায় - গ্রন্থকার, প্রাবন্ধিক ; ১২৪ বৃন্দাবন মল্লিক লেন,

হাওড়া - ৭১১১০১ ;

৫. শ্রী ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী — প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক, আনন্দবাজার পত্রিকা, কলিকাতা ;

৬. শ্রী যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী — গ্রন্থকার, গবেষক ও প্রাবন্ধিক ; ইউকো ব্যাঙ্ক ; উত্তরপাড়া, হুগলী।

৭. শ্রী তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষক ; বৃন্দাবন মল্লিক লেন, হাওড়া - ১ ;

৮. ডাঃ সুশান্তকুমার রায় — চিকিৎসক ; প্রাবন্ধিক ও গ্রন্থকার , বৃন্দাবন মল্লিক লেন, হাওড়া - ১ ;

৯. শ্রী শৈবাল রক্ষিত, গ্রন্থকার ও প্রাবন্ধিক, — শিবপুর, হাওড়া ;

১০. শ্রী শুভেন্দু মান্না, হাওড়া জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ;

১১. শ্রী দুঃখহরণঠাকুর চক্রবর্তী — প্রাবন্ধিক, গ্রন্থকার ; প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, ঝাপড়দহ ডিউক ইনস্টিটিউশন, [ডোমজুড় হাওড়া] ;

১২. শ্রী তপন নন্দী — গ্রন্থাগারিক, গড়বালিয়া রাখাল চন্দ্র মান্না ইনস্টিটিউশন, পোঃ গড়বালিয়া, হাওড়া - ৭১১৪১০।

১৩. শ্রী অমিত রায়, প্রাবন্ধিক ;—অ্যাডভোকেট, কলিকাতা হাইকোর্ট।

১৪. শ্রী ফণী রায়, প্রাবন্ধিক ও সমাজসেবী ; অ্যাডভোকেট, হাওড়া কোর্ট;
— নন্দ মুখার্জী লেন, হাওড়া।

১৫. শ্রী সনৎ ঘোষ, ওয়েলফেয়ার অফিসার, জগৎবল্লভপুর ব্লক ডেভেলাপমেন্ট অফিস, পোঃ মুন্সিরহাট, হাওড়া-৭১১৪১০।

১৬. শ্রী অম্বুজাক্ষ বর্মণ, জগৎবল্লভপুর।

১৭. ডাঃ গোপীনাথ বর্মণ, — ঐ —।

১৮. উমাপ্রসন্ন বর্মণ (অধুনা প্রয়াত), ত্রিপুরাপুর।

১৯. শ্রী প্রদীপ ঘোষ, সচিব, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, মধুসূদন মঞ্চ, কলিকাতা - ৬৮।

২০. শ্রী দীপঙ্কর ঘোষ, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, মধুসূদন মঞ্চ, কলিকাতা।

২১. সৈয়দ আব্দুস সুলতান, হাফেজপুর।

২২. সৈয়দ গোলাম সরওয়ার, হাফেজপুর।

নির্বাচিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ পঞ্জী

১. বিদ্রোহী ডিরোজিও — বিনয় ঘোষ। অয়ন, ১৯৮০ খ্রিঃ।
২. হাওড়া জেলা সেন্সাস হ্যাণ্ডবুক — ১৯৫১ থেকে ১৯৯১ খ্রিঃ পর্যন্ত।
৩. ডিস্ট্রিক্ট স্ট্যাটিসটিক্যাল হ্যাণ্ডবুক : হাওড়া, ১৯৯৬-১৯৯৭ খ্রিঃ।
৪. হাওড়া জেলা গেজেটিয়ার, — ১৯০৯ ; ১৯৭২ খ্রিঃ।
৫. বাঙ্গালীর ইতিহাস — নীহাররঞ্জন রায়। দে'জ সংস্করণ, ১৪০২ সাল।
৬. অ্যান অ্যাকাউন্ট অফ হাওড়া : পাস্ট অ্যাণ্ড প্রেজেন্ট — সি. এন. ব্যানার্জ কলিকাতা, ১৮৭২।
৭. হাওড়া সিভিক কমপ্যানিয়ন — জে. বোনার্জী, হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি, ১৯৫৫।
৮. বাশুলী মঙ্গল — কবি মুকুন্দ মিশ্র। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত।
৯. সিল্ক ফ্যাব্রিকস্ অফ বেঙ্গল — এন. জি. মুখার্জী, কলিকাতা, ১৯০৩।
১০. এ স্কেচ অফ দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ দ্য ডিস্ট্রিক্ট হুগলী (১৭৯৫-১৮৪৫) — জি. টয়েনবী, কলিকাতা, ১৮৮৮।
১১. শাহ গরীবুল্লাহ ও জঙ্গনামা — মুহম্মদ আবদুল জলিল, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৩৯৭।
১২. সোনা ভান (শাহ গরীবুল্লাহ) — সম্পাদনা, মুঃ আঃ জলিল, কলিকাতা, ১৯৮৯।
১৩. ইউসুফ জোলায়খা (শাহ গরীবুল্লাহ) — সম্পাদনা, ডঃ অশোক কুণ্ডু, কলিকাতা, ১৯৮৯।
১৪. সত্যপীরের কথা (শাহ গরীবুল্লাহ) — সম্পাদনা - আবদুল জলিল, হাফেজপুর, হাওড়া।
১৫. ফার্স্ট ফ্রুটস অফ ইংলিশ এডুকেশন [১৮১৭-১৮৫৭] -- বি. পি মজুমদার, কলিকাতা, ১৯৭৩।
১৬. উওমেন্স এডুকেশন ইন ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া — যোগেশচন্দ্র বাগল, কলিকাতা, ১৯৫৬।
১৭. ইসলামি বাংলা সাহিত্য — সুকুমার সেন। কলিকাতা, ১৪০০।
১৮. গৌড়বঙ্গ সংস্কৃতি — হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। পুস্তক বিপণি সংস্করণ, ১৪০৬।
১৯. হাওড়া জেলার পুরাকীর্তি — তারাপদ সাঁতরা, পঃ বঃ সরকার, কলিকাতা, ১৩৮৩।
২০. পশ্চিম বাংলার ধর্মীয় স্থাপত্য : মন্দির ও মসজিদ — তারাপদ সাঁতরা, পঃ বঃ বাংলা একাডেমী, কলিকাতা ১৯৯৮
২১. পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা — সম্পাদনা : অশোক মিত্র,
২২. দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন — সম্পাদনা : চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৯৮১।

২৩. বাংলার লৌকিক দেবতা — গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, কলিকাতা।
২৪. মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় কৃষক — সুপ্রকাশ রায়, কলিকাতা, ১৯৮০।
২৫. হাওড়া জেলার কৃষক সমিতির পঞ্চাশ বছর — জয়কেশ মুখার্জী, হাওড়া, ১৯৮৮।
২৬. কেউ ভোলে কেউ ভোলে না — জয়কেশ মুখার্জী, কলিকাতা, ১৯৯৭।
২৭. বাংলায় বিপ্লববাদ — নলিনীকিশোর গুহ, কলিকাতা, ১৩৬১।
২৮. স্বাধীনতা সংগ্রামে হাওড়া জেলার সেনানীবৃন্দ - প্রফুল্ল দাশগুপ্ত, হাওড়া, ১৯৭২।
২৯. স্বাধীনতা আন্দোলনে হাওড়া জেলা — দুঃখহরণ ঠাকুর চক্রবর্তী, কলিকাতা, ১৯৯৯।
৩০. হাওড়া জেলার ইতিহাস — হেমেন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৯৯৯।
৩১. নগর হাওড়া — অলোককুমার মুখোপাধ্যায়, হাওড়া, ১৯৯০।
৩২. হাওড়া জেলা গঠনের ইতিহাস — শৈবালকান্তি রক্ষিত, হাওড়া ১৯৯৯।
৩৩ হাওড়া শহরের ইতিবৃত্ত (২য় খণ্ড) — অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, হাওড়া, ১৯৯৫।
৩৪. গঙ্গাপথের ইতিবৃত্ত — অশোককুমার বসু, কলিকাতা, ১৯৮৯।
৩৫. বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি (১ম) — যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, কলিকাতা, ১৯৯০।
৩৬. -- ঐ — (২য় খণ্ড) -- " " " ১৯৯১।
৩৭. হুগলী জেলার ইতিহাস — সুধীরকুমার মিত্র, কলিকাতা, ১৩৫৫।
৩৮. পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (২য় খণ্ড) — বিনয় ঘোষ, কলিকাতা, ১৯৭৮।
৩৯. মাদার গডেস চণ্ডী — শিবেন্দু মান্না, কলিকাতা, ১৯৯৩।
৪০. দ্য লাইফ অ্যাণ্ড রাইটিংস অফ কাশীপ্রসাদ ঘোষ — আর. অ্যালিআন এভার্টস্ ; প্রফেসর ইউ. নীলসন।
৪১. ভারতকোষ -- বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত।
৪২. বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অভিধান — বীতশোক ভট্টাচার্য, কলিকাতা, ১৯৮৪।
৪৩. সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান -- কলিকাতা,
৪৪. সরল বাঙ্গালা অভিধান (২য়, ৭ম, ৮ম সংস্করণ) — সুবলচন্দ্র মিত্র সংকলিত।
৪৫. হাওড়া জেলার ইতিহাস (২য় খণ্ড) — অচল ভট্টাচার্য, হাওড়া।
৪৬. বিষ্ণু দে : জীবন ও সাহিত্য -- সম্পাদনা ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা।
৪৭. গড়বালিয়া রাখাল চন্দ্র মান্না ইনস্টিটিউশন : সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারক পত্রিকা, (১৯৩৭-'৮৭) — সম্পাদনা : সমীরকান্তি রায়, শিবেন্দু মান্না।
৪৮. জগৎবল্লভপুর উচ্চ বিদ্যালয় স্মরণিকা [১৫০ তম বর্ষ উদযাপন], ১৯৯৫-৯৬।

এতৎসহ জগৎবল্লভপুর জনপদে অবস্থিত মাজু আর. এন. বসু হাইস্কুল, ব্রাহ্মণপাড়া চিন্তামণি ইনস্টিটিউশন, ব্রাহ্মণপাড়া জুনিয়ার হাইস্কুল, পাঁতিহাল দামোদর ইনস্টিটিউশন

প্রভৃতি বিদ্যালয়ের স্মরণিকা গ্রন্থাদি। ব্রাহ্মণপাড়া বিবেকানন্দ সেবা সঙ্ঘ পত্রিকা।

৪৯. হাওড়া -- তারাপদ সাঁতরা, সুবর্ণরেখা, কলিকাতা, ২০০০খ্রি:।

৫০ Howrah In Perspective – Dr. K. K. Ganguli. Ananda Niketan Kirtishala, Nabasan, Howrah, 1982.

৫১. শিবায়ন — কবিচন্দ্র রামকৃষ্ণ রায়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত।

প্রবন্ধ

৫২. গড়বালিয়া : হাওড়া জেলার একটি গ্রাম — শিবেন্দু মান্না। কৌশিকী. ১৯৯৬

৫৩. বালিয়া পরগণার বাদাই গান -- শিবেন্দু মান্না। চতুষ্কোণ, মাঘ ১৩৭৯

৫৪. বাদাই গান -- শিবেন্দু মান্না। লোকশ্রুতি, ভাদ্র, ১৪০৬

৫৫. নিজবালিয়া ও দেবী সিংহবাহিনী – শিবেন্দু মান্না। ভূমিলক্ষ্মী, ২১মার্চ, ১৯৭৭ খ্রি:

৫৬. জগৎবল্লভপুর : সারস্বত সাধনা — সাদিক মহম্মদ। অনেক আকাশ, আগষ্ট, ১৯৯০।

৫৭. গ্রন্থাগারে সাময়িক প্রদর্শনী--শিবেন্দু মান্না। গ্রন্থাগার, আশ্বিন, ১৩৮৭ সাল।

৫৮. হাওড়া জেলার মন্দিরের গঠন ও অলঙ্করণ--শিবেন্দু মান্না। লোকসংস্কৃতি, ১৩৭৯ সাল (২য় সংখ্যা)।

৫৯. হাত নাচনা পুতুলের ইতিকথা—শিবেন্দু মান্না। বিশ্ববাণী ৫১ বর্ষ. ১ম সংখ্যা, ১৩৯৫ সাল

৬০. হাওড়া জেলার দারু তক্ষণ শিল্প—শিবেন্দু মান্না। সমকালীন, চৈত্র ১৩৮৩ সাল।

৬১. বৃষকাঠ : স্মৃতিতর্পণের দেশজ পদ্ধতি—অশোককুমার কুণ্ডু। কৌশিকী. ১৯৯৮।

৬২. উলুবেড়ের আদিপর্ব তারাপদ সাঁতরা। সমবেত মন, ফেব্রু, ১৯৯৬।

৬৩. গণমুখ (সংবাদ বুলেটিন) ; জগৎবল্লভপুর; মার্চ, ১৯৮৪।

৬৪. শিল্পরত্ন সুরেন্দ্রনাথ দাশ—ফণী রায়। কৌশিকী, শারদীয় : ১৩৮৩ সাল।